ভূমিকা

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ পার্ষদদের আগমনের জন্য বাইশ তেইশ বৎসর দক্ষিণেশ্বরের লীলাভূমিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। জগদম্বা বলিয়াছিলেন — অপেক্ষা কর, তোমার লীলাসহায়করূপে শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তগণ আসিবে। এই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অনেককেই ২২।২৩ বৎসর পূর্বে মা দেখাইয়াছেন। জগদম্বার ইচ্ছায় ভক্তদের অন্যতম অন্তরঙ্গ শ্রীমও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর শ্রীমকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত। বলিয়াছিলেন, তোমার চোখ মুখ ও কপাল দেখিয়া বুঝিয়াছি, তুমি পূর্ব জন্মে যোগীশ্রেষ্ঠ ছিলে। তুমি আমার আপনার জন — এক সত্ত্বা, যেমন পিতা ও পুত্র। প্রথম দর্শনের সাতদিনের ভিতরেই শ্রীমকে সস্নেহে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন, বালাই! কেন তুমি যাবে শরীর ত্যাগ করতে? তোমার যে গুরু লাভ হয়েছে। এই শরীর মন গুরুর। সংসারের অভাবনীয়, অচিন্তনীয় ও স্বপ্নের অগোচর যে সমস্যা তাও ঐ যাদুকরের দ্বারা নিমেষে সমাধান হইয়া থাকে।

তাহার পর শ্রীম-র স্বরূপ তাঁহাকে বলিলেন। বলিলেন, বকুলতলার কাছে এই সাদা চোখে সপার্ষদ চৈতন্যসংকীর্তন জীবন্ত দেখিয়াছিলাম। তাহাতে তোমাকেও দেখিয়াছিলাম। আরও বলিলেন — এতদিন নিজেকে ভুলিয়া ছিলে। আর না। এখন নিজের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হও। ঠাকুর নররূপী ভগবান। তাঁহার পক্ষে আপন জন বলিয়া চেনা কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু পার্ষদের পক্ষে ছদ্মবেশী ঠাকুরের স্বরূপ এবং নিজের স্বরূপ জানা কঠিন বটে।

শ্রীম ঠাকুরের মুখে আপন স্বরূপের কথা শুনিয়া বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা মনের উপর ঐ ভাব — 'চৈতন্যদেবের পার্ষদ' অঙ্কিত করিতে চেষ্টা

করিতেছিলেন। কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হন নাই। ঠাকুরও তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। সেই জন্য শ্রীমকে স্বরূপ জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য, ঠাকুর নানা উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন।

একদিন বলিলেন, তোমার অবস্থা কেমন জান? যেন ছাগলের দলে বাঘ। একটা বাঘের শিশু ছাগলের দলে প্রতিপালিত হইয়া ছাগলের মত আচরণ করিত। ঘাস খাওয়া, ছাগলের মত ম্যা ম্যা করা, ভয়ে বিচলিত হওয়া, এই সব আচরণ করিতেছিল। একদিন একটি বনের বাঘ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল জলের কাছে। জলে উভয় বাঘেরই প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। জংলী বাঘ বাচ্চাটিকে সেই প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বলিল — এই দেখ তোর আর আমার চেহারা এক। তুইও বাঘ আমার মত, ছাগল নোস্। বাঘের আহার ঘাস নয় — মাংস। এই বলিয়া মাংসের টুক্‌রা তাহার মুখে গুঁজিয়া দিল। তাহার সংস্কারগত লুক্কায়িত আস্বাদ ফিরিয়া পাইল এবং ছাগলের দল ছাড়িয়া স্বজাতি জংগলের বাঘের সঙ্গে চলিয়া গেল। ছাগলের দলের বাঘ মানে, সাধারণ মানুষ যাহার আচরণ পশুবৎ — আহার শয়ন মৈথুন ও ভয়ে পর্যবসিত। সে মোহাবৃত মানুষের স্বরূপ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', এই জ্ঞান বিস্মৃত। আর জঙ্গলের বাঘ মানে শ্রীগুরু ঈশ্বর।

ঐদিনই শ্রীমকে আর একটি গল্প বলিলেন, মৎস্যচোর মহাপুরুষের। একদিন একজন মৎস্যচোর রজনীর অন্ধকারে এক বাগানে প্রবেশ করিয়া পুকুরে জাল ফেলিল। ঐ শব্দে বাগান রক্ষকগণ জাগ্রত হইয়া মশাল লইয়া চোরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু চোরকে দেখিতে পাইল না। দেখিতে পাইল — এক সাধু, ভস্মাবৃত, যোগাসনে ধ্যানমগ্ন। রক্ষীগণ চোরের অন্বেষণ ছাড়িয়া ঐ সাধুর পূজা ও সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। ঐ সাধুটিই মৎস্যচোর। লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে নিকটবর্তী ভস্মস্তূপে আপন সিক্ত সর্বাঙ্গ প্রবেশ করাইয়া দিল। তারপর সাধুসুলভ যোগাসনে ধ্যানের অভিনয় করিল। রক্ষীদের এই পূজাতে তাহার আত্মজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে ভাবিল — হায়! আমি চোর, কিন্তু এই সাধুবেশ ধারণ করায় আমার এই সম্মান ও পূজা। সত্যকার সাধু হইলে না জানি কত সম্মান পূজা ও শান্তি-সুখ! সে এই বলিয়া সংকল্প করিল, আমি সত্যকার সাধু হইব।

আর গৃহে ফিরিয়া গেল না। সাধু হইয়া আত্মস্বরূপ দর্শনের জন্য নিজেকে নিযুক্ত করিল, সাধুমহাত্মাদের সঙ্গে সাধনায় থাকিয়া।

শ্রীম এই উপাখ্যানটিও শুনিলেন আর ভাবিতে লাগিলেন, দেখিতেছি নিজের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্বস্ব ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে। অন্তর্যামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম-র এই সংকল্পে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। নররূপী ভগবান আপন অন্তরঙ্গ পার্ষদের মনের এইরূপ চিন্তায় ও সংকল্পে আনন্দিতই হইয়া থাকেন। কারণ সর্বস্ব ছাড়িয়া, আত্মচিন্তায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়া, এই জীবনেই ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। কিন্তু শ্রীম-র সন্ন্যাস লইয়া ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টার সংকল্পে তিনি চিন্তিত হইলেন।

কেন তাঁহার এই চিন্তা? কারণ জগদম্বা শ্রীমকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আনয়নের সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ করিয়াছিলেন — আমি তোমার এই পার্ষদের দ্বারা (বৃদ্ধা ও তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়া অতি সামান্যসূচক মুদ্রা দেখাইয়া বলিলেন) এইটুকু কাজ করাইয়া লইব। তুমি তাহাকে গৃহস্থ আশ্রমে থাকার জন্যই উপদেশ এবং শিক্ষা প্রদান করিবে। জ্বলন্ত সংসার-অনলে দগ্ধ জনগণের নিকট ভাগবত কথা শুনাইয়া এই ভক্তটি তাহাদের আত্মজ্ঞান লাভের সহায় হইবে। তাহা হইলে, ইহারা চির শান্তি ও চির সুখ লাভে সমর্থ হইবে। ভাগবত শিক্ষারূপ মহৎ কর্মে তাহাকে নিযুক্ত করিবে। একদিকে শ্রীম-র ভিতর সংসার ত্যাগের সংকল্প দেখিয়া, আর অন্যদিকে জগদম্বার আদেশ স্মরণ করিয়াই, শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়াছিলেন। তাই শ্রীমকে নিম্নরূপ উপদেশ দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, গুরুকৃপায় গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়াও ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে। এবং জীবন্মুক্ত হইয়া সংসাররূপ এই ধোঁকার টাটীকে রাজর্ষি জনকের ন্যায় মজার কুঠীতে পরিণত করিয়া নিজে ব্রহ্মানন্দ সদা উপভোগ করিতে পারে, আর অপরেরও এই ব্রহ্মানন্দ লাভের সহায় হইতে পারে। শ্রীম এই কার্যের জন্য জাগতিক দৃষ্টিতেও সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

শ্রীম অর্ধভারত, ব্রহ্ম, সিংহল ও মালয় রাজ্যের উপর অধিকারবিস্তারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি বিশিষ্ট স্নাতক এবং শিক্ষাব্রতী সুযোগ্য অধ্যাপক। তিনি আচার্যের উপযোগী প্রশান্ত, নিরভিমান, কর্মক্ষেত্রে

সিংহতুল্য, রসরাজ রসিক ও সাধু ভক্তদের নিকট দাসানুদাস প্রভৃতি জ্ঞানীর গুণসমূহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর এক কথা, পূর্ব সংস্কার অনুযায়ী ইনি পূর্বেই গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। এবং সন্তানের জনকও হইয়াছেন। তাঁহাকে গৃহস্থ আশ্রমে রাখিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানে মণ্ডিত করিয়া লোকশিক্ষার কার্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই ভাবিয়া শ্রীম-র সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প ত্যাগের কথা প্রকাশ করিয়া ঠাকুর বলিলেন — দেখ, একজন কেরাণী জেলে গিয়াছিল। জেল হইতে মুক্ত হইয়া, সে অকর্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। পুনরায় কেরাণীর কর্মই গ্রহণ করিল। বলিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া গৃহেও থাকা যায়, সন্ন্যাসীও হইতে পারে। এইরূপে শ্রীম-র শিক্ষা চলিল।

শ্রীম-র মন বুঝিল, কিন্তু প্রাণ এই প্রবোধ কোনরূপেই গ্রহণ করে নাই। তাই মাঝে মাঝে কোন সুযোগ উপস্থিত হইলেই, ইঙ্গিতে সর্বত্যাগের কথা বলিতেন। ঠাকুর শ্রীমকে বুঝাইয়া গৃহস্থ আশ্রমেই থাকিবার কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীম-র এইরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ তিনি সংসারের বিকট রূপ ইতিপূর্বেই ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবার সময়ে দেখিয়াছিলেন। সংসার যে জ্বলন্ত অনল তাহাও প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্য শরীর ত্যাগ করিবার সংকল্পও করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি ঠাকুরের সহিত মিলিত হন। তাই পরবর্তীকালে ভক্তদের বলিতেন, কোথায় শরীর ত্যাগ, আর কোথায় ভগবান লাভ! এ যেন কাঁচ কুড়োতে এসে কৌস্তুভ লাভ! ঠাকুরের সহিত মিলন হওয়ায়, তাঁহার প্রভাবে, প্রবোধে, আশ্বাসে শরীর ত্যাগের সংকল্প ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু সংসার ত্যাগের সংকল্প রহিয়া গেল। ঠাকুর তাঁহার এই অস্থিরতা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইলেন না দেখিয়া কঠোর ভাব ধারণ করিলেন, যেমন অর্জুনের উপর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, আমার কথা না শুনিলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ঠাকুর শ্রীম-র প্রতি অত কঠোর হইলেন না বটে, কিন্তু যাহা বলিলেন তাহাতেই শ্রীমকে নিশ্চয় করিতে হইয়াছিল, আর কখনও সন্ন্যাসের জন্য প্রার্থনা করিবেন না। ঘটনা হইয়াছিল এইরূপ ঃ

সন্ধ্যার পর একদিন ঠাকুর ভাবসমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অর্ধবাহ্য-দশায় শ্রীমকে তীব্র স্বরে বলিলেন, কেহ মনে না করে আমি কাজ না করলে মায়ের কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। মা একখণ্ড তৃণ থেকে বড় বড় আচার্য সৃষ্টি করতে পারেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীম সংকল্প করিলেন, আর কখনও স্পষ্টভাবে অথবা ইঙ্গিতে সন্ন্যাসের কথা বলিব না। আমাকে গৃহস্থ আশ্রমেই থাকিতে হইবে। ঠাকুরের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

এখন হইতে শ্রীম-র জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। ঠাকুর তাঁহাকে নানাভাবে এই অতি কঠিন কার্য, গৃহস্থ আশ্রমবাসীর শিক্ষা দিতে লাগিলেন। একদিন মা কালীর মন্দিরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে মায়ের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া দিলেন। প্রার্থনা করিলেন, মা ইহাকে যখন তোমার কাজের জন্য গৃহস্থ আশ্রমেই রাখিলে তখন মাঝে মাঝে দর্শন দিও। নহিলে কেমন করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে থাকিবে? আর একদিন বলিলেন — মা, তোমার কাজের জন্য একে শক্তি দাও। তাহা না হইলে কি করিয়া তাহার দ্বারা লোকশিক্ষা হইবে!

মা শ্রীমকে ষোল কলার এক কলা শক্তি দিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল আরও বেশী দেন। তাই ঠাকুর বলিলেন, এক কলা দিলি? মায়ের জবাব শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, ওঃ এতেই তোর লোকশিক্ষার কাজ হয়ে যাবে। শ্রীম-র শিক্ষা চলিতে লাগিল। গৃহস্থ আশ্রমের অনুকূল, স্ত্রীপুত্র পরিবার আত্মীয়-স্বজনের সহিত ব্যবহার, অর্থ উপার্জন ও বিদ্যার সংসারের জন্য কি ভাবে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে শিক্ষা চলিতে লাগিল।

কখন কখন জগদম্বা শ্রীমকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতেন। আবার কখনও ঠাকুর আপনার স্বরূপ দর্শন করাইতেন। শ্রীম বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া বলিতেন, এই মন্দিরের পূজারী দেখিতেছি জগদম্বা, যিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও পালন করেন। শ্রীম গৃহে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলেন কারণ আজীবন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ভাবটি তাঁহার ভিতর জাগ্রত ছিল। পরবর্তী কালে দেখা যায় তিনি অবিবাহিত যুবক ভক্তদের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সর্বদা উপদেশ দিতেন। কখনও জোর করিয়া, ঠাকুরের সময় হইতে শ্রীম-র মহাসমাধি লাভের পূর্ব পর্যন্ত, বহুজনকে সন্ন্যাস গ্রহণ

করাইয়াছেন। এইরূপ সন্ন্যাসী ভক্তগণ কেহ কেহ মনে করিতেন, জগদম্বার আদেশে নিজে গৃহে থাকিলেও, আমাদিগকে জোর করিয়া সন্ন্যাস লইতে বাধ্য করিতেছেন পরম সুহৃদের মত, যাহাতে সংসারের জ্বলন্ত অনল হইতে আমরা বাঁচিয়া যাই এবং নির্মুক্ত আনন্দ উপভোগ করিতে পারি।

এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ মনীষী স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিনে বেলুড় মঠে শ্রীমকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, "মাস্টার মশাই, ঠাকুরও এক এবং কথামৃত লিখবার লোকও এক। আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি, স্বামীজীর কথার চেয়ে আপনার কথায় ছেলেদের কাজ হচ্ছে বেশী, আর ভালও লাগে। তাই বলি, কথামৃত একটি, আর লেখকও একটি। যতবার পড়ি, ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা! কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম, মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।" — এই উক্তিটি বলিয়া দেয় তিনি কিরূপ গৃহস্থ আশ্রমে ছিলেন।

তাঁহার সহায়তায় সহস্র সহস্র ভক্ত শান্তি ও আনন্দের সহিত গৃহে বাস করিতেছেন। শ্রীম-র জীবনটি জগদম্বার পরিকল্পিত আর শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা নির্মিত ও সংগঠিত। এই মডেলটি (আদর্শ জীবন) নররূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তৈয়ারী করিয়াছেন বর্তমান সময়ের দারুণ অশান্তিতে অস্থিরমনা সমগ্র জগতের জনগণের জন্য।

সমগ্র শ্রীম-দর্শন শ্রীম-র এই আদর্শ জীবন ও বাণীর কথা বহন করে। এই দ্বাদশ ভাগ শ্রীম-দর্শনেও এই সব কথাই আছে। অশান্ত জনগণ শ্রীম-র জীবন ও কথা পড়িয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ করুক, অকিঞ্চন লেখকের ভগবৎ চরণে এই প্রার্থনা। এই দ্বাদশ ভাগ চণ্ডীগড়ে ৫৭৯, সেক্টার ১৮-বি শ্রীম-ট্রাস্টে লিখিত।

.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (তুলসী মঠ)। ঋষিকেশ, হিমালয়। — বিনীত
শারদীয় দুর্গোৎসব, ১৩৭৬ সাল, ১৯৬৯ খ্রীঃ। — গ্রন্থকার

প্রথম অধ্যায়

আমায় ধর — রামকৃষ্ণ

১

আজ বড়দিন। ডিসেম্বরের ২৫ তারিখ। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। গত রাত্রিতে সারা জগৎ জুড়িয়া ভগবান যীশুর জন্মতিথি, Christmas Eve পালন করিয়াছে খ্রীস্ট-ভক্তগণ!

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও ক্রাইস্ট এক। এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে সর্বত্র ইহা প্রতিপালিত হয়। বেলুড় মঠেও প্রতি বৎসর জন্মতিথি পালন করা হয়। গতকাল মঠে সন্ধ্যারতির পর সাধু ও ভক্তগণ ভিজিটারস্ রুমে সম্মিলিত হইয়া ভারতীয় প্রথায় যীশুর পূজা ও ফলমিষ্টি ভোগ দিয়া আরতি করিয়াছেন। তারপর বাইবেল হইতে জন্মবৃত্তান্ত, Nativity of Christ — পাঠ করিয়াছেন।

শ্রীম গতকাল বলিয়াছিলেন, এই সময় খ্রীস্ট-ভক্তগণের কাছে চার্চে যেতে হয়। তাঁর ভাবে পরিপূর্ণ এই সব স্থান। গেলেই তার touch (স্পর্শ) লাগবে মনে। তাতে ভগবানের উদ্দীপন হবে। তাই অন্তেবাসী ও ছোট জিতেন শ্রীম-র অনুমতি লইয়া ধর্মতলায় থোবার্ণ মেথডিস্ট চার্চে গিয়াছিলেন। ভক্তগণ তাঁহারই মহিমা কীর্তন করিতেছিলেন। তাঁহারা শ্রীম-র আদেশে আদি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছিলেন। চার্চ হইতে ভক্তরা গঙ্গা দর্শন করিতে যান, ইডেন গার্ডেনের নিকট পনটুনে চড়িয়া গঙ্গা-মাকে দর্শন, প্রণাম, প্রার্থনা করেন — তারপর ধ্যান। ফিরিবার পথে তাঁহারা সাধুদর্শন করিতে যান শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শাখা কেন্দ্র, ৬-এ বাঁকা রায় লেনস্থিত স্টুডেন্টস্ হোমে।

মর্টন স্কুলে ফিরিয়া আসেন রাত্রি আটটায়। শ্রীম দ্বিতলের পূর্বধারে বারান্দায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া যীশুর গুণকীর্তন করিতেছেন। "আনন্দ কর আনন্দ কর! আজের দিনে ভগবান মানুষ-শরীর নিয়ে এসেছিলেন ভক্তগণের

কল্যাণের জন্য বেথেলহামে। দু'হাজার বছর প্রায় হল, তবুও তাঁর নাম শান্তিপ্রদ জীবন্ত ও জাগ্রত।" শ্রীম ভক্তদের নিকট হইতে আজের দর্শনাদির বৃত্তান্ত শুনিলেন।

আজ ক্রীসম্যাস্। সর্বত্র উৎসব, আনন্দোল্লাস। সকাল হইতেই শ্রীম উৎসব দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আটটায় তিনি অন্তেবাসীকে নারিকেলডাঙ্গায় প্রেসে পাঠাইলেন। 'কথামৃত', ছাপা হইতেছে! দশটায় বাহির হইয়া গেলেন। ট্রামে চড়িয়া প্রথমে গেলেন গড়ের মাঠে। ফিরিবার পথে ধর্মতলায় থোবার্ণ মেথডিস্ট চার্চে প্রবেশ করিলেন। 'ম্যাস্' বা সম্মিলিত প্রার্থনা চলিতেছে। শ্রীম সকলের পিছনে বসিয়া উহা দর্শন করিলেন। ফিরিয়া আসিলেন সাড়ে এগারটায়। পথে বেচু চ্যাটার্জির স্ট্রীটে লাহাদের বাড়িতে উৎসব দেখিয়া আসিলেন। হরিদ্বারের বৃদ্ধ মহাত্মা ভোলাগিরি আসিয়াছেন।

বেলা বারটায় শ্রীম, জগবন্ধু ও ছোট জিতেনকে উৎসব দর্শন করিতে পাঠাইলেন লাহাদের বাড়িতে। শচীনন্দন কিছুদিন শ্রীম-র আশ্রয়ে থাকিয়া আজ দেশে রওনা হইলেন, রামপুরহাটে।

আজ সকাল হইতেই শ্রীম-র অন্তর্মুখীন ভাব। ভগবান যীশুর কথা স্মরণ মনন করিতেছেন। মাঝে মাঝে দুই চারিটি বাইবেলের বাণী শুনাইতেছেন। বলিতেছেন, ঠাকুরই ক্রাইস্ট।

শ্রীম (অতি প্রত্যুষে ভক্তদের প্রতি) — Rejoice, rejoice — 'The Kingdom of heaven is at hand once again.' আনন্দ কর। ভগবান আবার অবতীর্ণ হয়েছেন। হাত বাড়ালে ধরা যায়, এত কাছে। এই সে দিন চলে গেলেন।

এও ক্রুসিফিকেসান্। ভক্তদের জন্য সর্বস্ব দিয়ে গেলেন — শরীরটা পর্যন্ত। ভক্তদের পাপ নিয়েই তো গলার অসুখ।

নিজমুখে বলেছিলেন, 'আমিই ক্রাইস্ট। মানুষের বানানো নয়। বলেছিলেন, আনন্দ কর, আনন্দ কর, আনন্দময়ীর সন্তান সব, আনন্দ কর।'

ক্রাইস্টও আনন্দ করতে বলেছিলেন ভক্তদের। বলেছিলেন, সংসার দুঃখময়। এই দুঃখময় সংসার জয় করেছি আমি। সকল সুখের আশ্রয়

শ্রীভগবান আমার পিতা। আমি তাঁর পুত্র। তাঁর এই অনন্ত সুখ শান্তি ও আনন্দের উত্তরাধিকারী আমি। তোমরা আমাকে আশ্রয় করেছ! তাই তোমরাও উত্তরাধিকারসূত্রে এই অনন্ত সুখ শান্তির অধিকারী। অতএব আনন্দ কর, আনন্দ কর। "In the world," Christ said, "ye shall have tribulation; but be of good cheer for I have overcome the world" (St. John 16:33).

শ্রীম — কি আশ্চর্য! ভগবান মানুষ হয়ে এসে বলছেন — 'আমার ধ্যান করলেই হবে।' প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা (ধ্যান) করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য — জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য শান্তি সুখ প্রেম সমাধি।'

ক্রাইস্টও তারস্বরে ঘোষণা করেছিলেন — এসো সব পথভ্রান্ত, সংসারভারে অতি ক্লান্ত, আমার কাছে এসো। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তোমাদের শান্তি-সুখ নিশ্চয় দিব। আর আমার ব্যবস্থা অতি সরল, প্রায় বন্ধনহীন ও অতি সহজসাধ্য।

'Come unto me' Christ declared, 'all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. ...For my yoke is easy, and my burden is light.' (St. Matt. 11:28-30)

বর্তমান ধর্মে অরুচি এবং নিদারুণ সংশয় ও অবিশ্বাসের যুগে ঠাকুরের ব্যবস্থা আরও সরল আরও সহজসাধ্য। বলেছেন, 'আমায় ধর। আমি বাকী সব করে দিব।'

অত সোজা পথ! কিন্তু বিশ্বাস হয় কই লোকের?

লোকই বা করে কি! তাঁর মহামায়া অত সব খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। বড় সঙ্কটময় সময়।

অপরাহ্ন তিনটা-ত্রিশ। শ্রীম চারতলার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া আছেন। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী আসিয়াছেন। ইনি দ্বিতলে বসা। শরীর অসুস্থ। উপরে উঠিতে কষ্ট হয়। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্য। বিখ্যাত গ্রন্থ "স্বামীশিষ্য সংবাদ"-এর লেখক। ইনি শ্রীম-র অতীব প্রিয়। শ্রীম-র উপদেশে তিনি স্বামীজীর সহিত তাঁহার কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিতেন।

শরৎবাবু শ্রীমকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের বেদব্যাস শ্রীম। একদিন 'ঠাকুরবাড়ি'তে শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে আরও দুইজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন। দ্বিতলের ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠ শ্রীম-র বাসগৃহ। যাইবার সময় নিম্নতলে নামিয়া আসিয়া বন্ধুদের বলিয়াছিলেন, যাঁকে দর্শন করে এলেন ইনি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও মহাপুরুষ। কি অনাড়ম্বর জীবন, ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না। পেছনে টানছে মন। আমরা খুব ধন্য। এসব মহাপুরুষ জগতে কদাচিৎ কখনও আসেন অবতারের সঙ্গে। এঁরা জীবকোটি নন। অবতারের সঙ্গে আসেন জগতের কল্যাণের জন্য — নিত্য সিদ্ধ। ঠাকুর বলেছিলেন, তিনিই চৈতন্যদেব। আর শ্রীম চৈতন্য-অবতারেও তাঁর পার্ষদ ছিলেন। 'অবতারাদি' বলে ঠাকুর নিজেকে ও এঁদের নির্দেশ করতেন।

২

পাঁচটার সময় শ্রীম দরজা খুলিলেন। অন্তেবাসীকে বলিলেন, বেয়ারা জীবকে নারিকেলডাঙ্গা প্রেসে পাঠাইতে হইবে। অন্তেবাসীর মুখে শরৎবাবুর আগমন বার্তা শুনিয়া শ্রীম তখনই দ্বিতলে নামিয়া আসিলেন।

শরচ্চন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীমকে অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। শ্রীম তাঁহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া পরম স্নেহাষ্পদের মত অতি আনন্দে তাঁহার গায়ে পিঠে মায়ের মত হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন, বড় ধাক্কা গেছে শরীরের উপর। এখন কেমন আছ? — কুশলপ্রশ্নাদি শেষ হইল পরমাহ্লাদে।

এখন সাড়ে পাঁচটা। এটর্নি বীরেন বোসের প্রবেশ। ইনি বলিলেন, বাবা এসেছেন দর্শনের জন্যে, নিচে মোটরে বসা। শ্রীম-র অনুমতি লইয়া বীরেন, পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসুকে লইয়া উপরে আসিলেন। শ্রীম আদর করিয়া তাঁহাকে চেয়ারে বসাইলেন। নিজে উঠিয়া গিয়া বসিলেন হাইবেঞ্চযুক্ত বেঞ্চে, সিঁড়ির সম্মুখে দক্ষিণাস্য। বসু মহাশয় শ্রীম-র ডান হাতে পূর্বাস্য। শরৎবাবু শ্রীম-র বেঞ্চে বসা বাঁ হাতে। জগবন্ধু, গদাধর, শান্তি, বীরেন প্রভৃতি কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া কথোপকথন শুনিতেছেন।

শ্রীম (ত্রৈলোক্যের প্রতি) — ইনি বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য লিখেছেন।

খুব পণ্ডিত লোক। স্বামী বিবেকানন্দের কৃপা লাভ করেছেন। (শরচ্চন্দ্রের প্রতি) বল না একটু কি সব লিখেছো।

শরচ্চন্দ্র — আমরা চেষ্টা করেছি, যা সূত্রের মুখ্য অর্থ তা দেখাতে, কোনও মতবাদের উপর নির্ভর না করে।

শ্রীম — একটু শুনিয়ে দাও না এঁদের।

ত্রৈলোক্য — একটু বলুন না আমাদের।

শরচ্চন্দ্র (বিনীতভাবে) — শংকর মেনেছেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আর জীব ব্রহ্ম। অবশ্য জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেছেন — পরমার্থ সত্তা নেই।

রামানুজও তিনটি মেনেছেন — চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ মানে জীব, অচিৎ - জগৎ, আর ঈশ্বর। ব্রহ্ম বলতে জীব-জগৎবিশিষ্ট ঈশ্বর বোঝায় তাঁর মতে। ইনি স্বগত ভেদ স্বীকার করেন।

কিন্তু শংকর স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় সকল ভেদ-রহিত ব্রহ্ম মানেন। আমি ব্রহ্ম — 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এই অহংব্রহ্ম উপাসনায় জীব অজ্ঞান, সংশয় ও বিপর্যয় বিরহিত হয়ে স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইহাই মুক্তি — সাযুজ্য মুক্তি।

রামানুজ-বৈষ্ণবগণের মতে জীব অণু, ঈশ্বরের দাস। বৈষ্ণব মায়াতে পড়ে তার স্বরূপ জ্ঞান, অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের দাস, এটা ভুলে গেছে। উপাসনা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা সে যখন বুঝতে পারে সে ঈশ্বরের দাস তখনই তার মুক্তি।

এঁরা মানেন চার রকমের মুক্তি — সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও স্বাষ্টি।

(১) সালোক্য — ভগবানের সঙ্গে এক লোকে বাস করার কারো ইচ্ছা — যেমন বৈকুণ্ঠ।

(২) সামীপ্য — কেহ চায় সালোক্য আবার সামীপ্য। এক লোকে বাস করবে কিন্তু ভগবানের সান্নিধ্যে থাকবে।

(৩) সারূপ্য — কেহ চায় এরও উপর একটি — ভগবানের সঙ্গে একরূপতা। এরা চায় সালোক্য সামীপ্য ও সারূপ্য। এরা ভগবানের সঙ্গে এক লোকে থাকবে, সান্নিধ্যে থাকবে আবার ভগবানের সঙ্গে একরূপ হয়ে

থাকবে। অর্থাৎ ভগবানের ন্যায় শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ হয়ে থাকবে।

(৪) স্বাষ্টি — কেহ চায় স্বাষ্টি। অর্থাৎ কেহ ভগবানের মত ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হয়ে, একলোকে তাঁর নিকটে, তার মত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভূজ হয়ে থাকতে চায়। এঁরা সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও স্বাষ্টি এই চার রকম মুক্তি চায়।

শংকর - মতাবলম্বীগণ ভগবানের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতে চায়। রামানুজীগণ এক হতে চায় না সম্পূর্ণভাবে। একটু পৃথক থেকে ভগবানের ঐশ্বর্য ভোগ করতে চায়। ওরা চিনি হতে চায়। আর এরা চিনি খেতে চায়।

শ্রীম — Authority (নজির) দিবে, পরমহংসদেব বলেছেন, কি স্বামীজী বলছেন, বলে। তবেই লোক নেবে। Authority (প্রমাণ) না দিলে লোক নেয় না।

ত্রৈলোক্য — কেন, যদি নিজে লেখা যায় সেই কথাই?

শ্রীম — তা হলেও authority (নজির) চাই। নইলে নেবে না। বলবে, বানিয়ে লিখেছে।

তা ছাড়া যাঁদের এ (ব্রহ্ম) তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়েছে, তাঁরাই বলার অধিকারী। অপরের কি right (অধিকার) আছে?

বলতে পারে বেদে আছে, অমুক মহাপুরুষ বলেছেন। তবুও নিতে চায় না। লোকে দেখতে চায়, যে বলেছে তার সেই জ্ঞান হয়েছে কিনা।

'শিশুপাল বধে' আছে, রাজসভাতে অন্য লোক বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে মহা গণ্ডগোল শুরু হলো। যেই শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়ালেন অমনি সব নীরব। কেন? তিনি যে কৃতি।

কোর্ট নজির চায় কেন? এই জন্য। নজির বড্ড valuable (মূল্যবান)।

মিটিং-এ একজন হয়তো বেশ ভাল ভাল কথা বলছে। কিন্তু লোক শুনতে চায় না। হয়তো কাছা ধরে টানছে। বলছে, বসো বসো। কেন এরূপ করে? সে তো বেশ ভাল কথাই বলছে। কারণ তার নাম নেই। কৃতী নয়। তাই authority-র দরকার।

ঠাকুর হলেন highest man (পুরুষোত্তম)। অবতার। তাঁর নাম করলে মাথা নোয়াতে হবে। অবতার এসে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। তাঁর কথা বেদ।

শরচ্চন্দ্র — সাধুসঙ্গ ছাড়া পথ নেই।

ত্রৈলোক্য (শ্রীম-র প্রতি) — আচ্ছা, বই তো সাধুসঙ্গ।

শ্রীম — কিন্তু বই interprete (ব্যাখ্যা) করবে কে? একজন higher man (উত্তম অধিকারী) চাই।

ত্রৈলোক্য — এমন লোক পাওয়া যায় কি? এমন লোক থাকলেও জানবে কি করে?

শ্রীম — আমরা মহৎ লোকের মুখে শুনেছি, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে পাওয়া যায়। নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে ডাকা। আমরা দেখেছি, পেয়েছি।

ত্রৈলোক্য — ডাকা মানে কি?

শ্রীম — কি না, এই সব অবস্তু জেনে তাঁর কাছে যাবার ইচ্ছা। তিনি সব করেছেন। ঘঁটিতে ঘাঁটিতে সাধু করে রেখেছেন। যারা এদের সঙ্গ করবে, বুঝতে পারা যাবে তারা ভিন্ন থাকের লোক। সংসারভোগ আলুনী লাগলে তখন আসে সাধুসঙ্গে। সাধুরা স্বেচ্ছায় ভোগ ছেড়েছে এরও উপরের বস্তু ভোগ করতে পাবে বলে। সেটি ব্রহ্মানন্দ। বিষয়ানন্দে যতদিন রুচি ব্রহ্মানন্দে ততদিন অরুচি।

৩

তাই ডাকা সকাম ও নিষ্কাম। পশুভাব যতদিন প্রবল ততদিন মানুষ ঈশ্বরকে ডাকে না। মনে করে, আমি রোজগার করছি, আমি খাচ্ছি, খাওয়াচ্ছি। মন একেবারে মলিন থাকে তখন।

একটু হুঁশ হলে তখন ঈশ্বরকে মানে। তখন বোঝে, ঈশ্বর সকল জাগতিক ভোগের মালিক। তাঁকে খুশি করতে পারলে সাংসারিক অভ্যুদয় লাভ হবে। রাজাটাজা, বড়লোক হওয়া যাবে।

তখনই সকাম সাধনা করে। ধ্রুব সকাম সাধনা করেছিলেন প্রথমে। রাবণও তাই করেছিলেন।

যারা সকাম সাধনা করে তাদেরও মহৎ বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ গীতায়।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — কি আছে গীতায়?

ভক্ত — চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ (গীতা ৭:১৬)

শ্রীম (ত্রৈলোক্যের প্রতি) — ঐ শুনুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, চার রকম লোক আমায় ডাকে। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী — এরা সকলেই সুকৃতিবান। অর্থাৎ পূর্ব জন্মের শুভ কর্ম করা আছে।

বিপদে পড়ে যারা তাঁকে ডাকে বিপদ দূর করতে, তারা 'আর্ত' — যেমন দ্রৌপদী। কৌরব সভায় বিপদে পড়ে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন — হে লজ্জানিবারণ, আমার লজ্জা রক্ষা কর। ঠাকুর বলেছিলেন — ভগবান দ্রৌপদীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনো কোন সাধুকে বস্ত্র দান করেছো? দ্রৌপদী বললেন, আজ্ঞে হাঁ। একবার একজন সাধু স্নান করছিলেন। তখন তাঁর বস্ত্র স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমি তখন আমার বস্ত্রের আধখানা ছিঁড়ে তাঁকে দিয়েছিলাম। ভগবান বললেন, তবে তোমার আর ভয় নাই। যত টানে বস্ত্র ততই বেড়ে যাচ্ছে। ক্রোধান্ধ হয়ে তাঁকে বিবস্ত্রা করতে চাইছিলো দুঃশাসন।

আর একবার বনবাসের সময় দুর্বাসা অনেক শিষ্য নিয়ে গিয়ে অতিথি হলেন। ঘরে কিছুই নেই। দ্রৌপদী কাঁদছেন। ভগবান এসে বললেন — কই, তোমার রান্নার পাত্রটা নিয়ে এসো দিকিন। আহারের পর সব মাজা ঘষা হয়েছে। এক কোণে একটু শাক লেগে আছে। চোখে প্রায় দেখা যায় না, এত ক্ষুদ্র এক কণা শাক। ভগবান ঐটুকুই তুলে মুখে দিলেন। ও দিকে সশিষ্য দুর্বাসার উদর ভরপুর। ওঁরা স্নান করতে গিছলেন নদীতে। ফিরে আর এলেন না। উদর পূর্ণ।

জগবন্ধু — অভেদানন্দ মহারাজ একদিন বলেছিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে নৌকোতে দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছিলেন। খুব খিদে পেয়েছিল ওঁদের। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, পয়সা আছে কারো কাছে? গোলাপ-মা দু' আনা পয়সা দিলেন। একজন বরানগর থেকে দু' আনার মুড়ি নিয়ে এলো। ঠাকুর সবগুলি খেয়ে ফেললেন। ভক্তরা সব হেউ ঢেউ করতে লাগলো। সকলের পেট ভরে গেল।

শ্রীম — এতে আর কি আশ্চর্য। 'তস্মিন তুষ্টে জগত্তুষ্টম্' (ভাগবত ৪:১২:৩৫) তিনি তুষ্ট হলে সমস্ত জগতের লোক তুষ্ট হয়। এ তো আর্তের কথা!

শ্রীম (ত্রৈলোক্যের প্রতি) — আবার 'জিজ্ঞাসু' ও 'অর্থার্থী' আছে। কারো ভিতর প্রশ্ন হচ্ছে, কেন লোক মরে? মরে যায় কোথায়? চন্দ্র সূর্য

হাওয়া অগ্নি এ সব কে করলে? এ সব জিজ্ঞাসা আসায় ঈশ্বরকে ডাকছে — আমার সংশয় দূর করে দাও। আন্তরিক হলে তিনি দূর করেন।

'অর্থার্থী — যেমন ধ্রুব। রাজ্য, স্বর্গ এ সব চাওয়া।

একজন ভক্ত — ঠাকুরের কাছে এরূপ ভক্ত কেউ গিছলো?

শ্রীম — হাঁ। খুব কম। একজন বই বেচতো। ঠাকুরের কাছে যেতো। একদিন জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি চাস্? ভক্তটি বললো, আমার ঘরের চার দরজা খোলা থাকবে। এই চাই। তাই হলো। কিন্তু শেষে আর ওতে রুচি ছিল না।

ভক্ত — মথুরবাবু মায়ের পায়ে অর্ঘ্য দিতে বললেন ঠাকুরকে, মকদ্দমা জিতবার জন্য।

শ্রীম — হাঁ। মথুরবাবুর শরীর গেল জানবাজারের বাড়িতে। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে। শুনে বলেছিলেন, ও একটা রাজা টাজা হবে (পরজন্মে)।

অসুখের সময় বলেছিলেন, কেন হলো এ অসুখ? নিজেই উত্তর দিলেন, ভক্ত বাছাইয়ের জন্য। যারা সকাম তারা এই অসুখ দেখে ভাগবে।

হয়েছিলও তাই। কেউ কেউ সরে পড়লো। তাঁরই এত বড় অসুখ! তাহলে আমাদের অসুখ কি করে সারাবেন, ভেবে।

বলেছিলেন, দেখলে ভবনাথ এলো। দেখে চলে গেল। বলেছিলেন, যে আপনার লোক সে কি ছেড়ে দিতে পারে অসুখে, বিপদে?

হৃদয় মুখুয্যে বিশ বছর সেবা করলেন। তাঁর কেন শেষটায় ওরূপ হলো? সকাম সেবা করেছিলেন।

ঠাকুরের কাছে খুব কম সকাম ভক্ত ছিল। তাঁর কাজ শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত নিয়ে — যারা সর্বত্যাগী আর যারা ঘরে থাকলেও তাঁর ইচ্ছায়, নিষ্কাম, দাসীবৎ সংসারে থাকবে।

বলেছিলেন — মা, যাদের দুই এক কথায় চৈতন্য হবে তাদের এখানে পাঠিও। অন্যদের কেশব সেনের কাছে পাঠিও।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এই চার শ্রেণীর ভক্তই 'উদারাঃ' ও 'সুকৃতিনঃ'। কিন্তু 'জ্ঞানী' আমার আত্মা, মানে আপনার স্বরূপ। (একজন ভক্তের প্রতি) কি আছে গীতায়?

ভক্ত — তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥

(গীতা ৭:১৭/১৮)

শ্রীম — এর অর্থ এই, সকাম ও নিষ্কাম চার প্রকার ভক্তের মধ্যে 'জ্ঞানী' — অর্থাৎ ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য — এই জ্ঞানে যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর এই জন্য যে 'নিত্যযুক্তঃ' ও 'একভক্তিঃ' — যে সুখদুঃখাদি সকল অবস্থার ভিতর আমাকে ধরে থাকে বুলডগের মত, যে বুঝেছে আগে আমি — ঈশ্বর, পরে জগৎ — যেমন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ধরে ছিলেন। যে কেবলমাত্র আমাকে সম্পূর্ণ মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে অর্থাৎ পত্নী পতি পুত্র কন্যা ধন ঐশ্বর্য পিতামাতাদি সংসারের প্রিয় বস্তু থেকে আমাকে অধিক ভালবাসে — যেমন ব্রজের গোপগোপিনীগণ, যেমন অর্জুন, যেমন উদ্ধব — সেই জ্ঞানী ভক্ত 'বিশিষ্যতে' অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তি, অতি উত্তম লোক।

কেন? না আমি তার অতি, অত্যন্ত প্রিয়। সেও তাই আমার প্রিয়। এক কথায়, ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য, এইটি যার দাঁতের ব্যথার মত সর্বক্ষণ মন প্রাণ হৃদয় অধিকার করে বসেছে — সেই ভক্তের একমাত্র প্রিয় আমি। সেও তাই আমার প্রিয়।

একজন ভক্ত — এই অবস্থা হলে তো প্রায় সমাধি হয়ে গেল।

শ্রীম — হাঁ। কিন্তু তখন দেহজ্ঞান অল্প আছে। ঠাকুর বলেছিলেন, বার আনা মন ঈশ্বরে রেখে চার আনা মন দিয়ে কাজ কর। এখান থেকেই ভক্তদের জ্ঞানী বলা যায়। এ অবস্থায়ও কেউ সংসার ছেড়ে চলে যায়। কেউ সংসারে থাকে। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তরা সকলেই জ্ঞানী। তারা কেউ ঘরে আছে, কেউ ঘর ছেড়ে দিয়েছে।

ঠাকুর বলেছিলেন, এখানে যারা আসে, অর্থাৎ সর্বদা সর্বাবস্থায় যাদের ঠাকুর একমাত্র আশ্রয়, তারা কেউ সংসারী নয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — জ্ঞানী কেন প্রিয় আরও কারণ দেখাচ্ছেন। বলছেন, জ্ঞানী আমার আত্মা — মানে, আমার নিজের স্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানী ভগবানের জীবন্ত নররূপী বিগ্রহ।

অবতারের শ্রীকৃষ্ণের দুটি দিক আছে — একটি শরীরধারী, অপরটি সচ্চিদানন্দ। যে ভক্ত তাঁর সচ্চিদানন্দ রূপটি ধরে ফেলেছে তাকেই জ্ঞানী বলে। সেই অবস্থায় ভক্ত সদা আমাতে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে। তার মন আর আমার মন যেন এক হয়ে গেছে, যেমন খালের জল আর গঙ্গার জল এক হয়ে যায় জোয়ারে, ঠাকুর বলতেন। তাই সে আমার স্বরূপ।

৪

মোহন — সকাম থেকে নিষ্কাম হতে পারে কি?

শ্রীম — পারে। ধন জন মান আয়ু এসব পেয়েও যখন দেখে এ সব lasting (শাশ্বত) শান্তি-সুখ দিতে পারে না, তখন চায় কেবল তাঁকে। তিনি শান্তি-সুখস্বরূপ। তখনই হয় নিষ্কাম ভক্ত। তখন, আগে ঈশ্বর পরে জগৎ, এই জ্ঞান পাকা হয়। অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে চাইল। দুর্যোধন চাইল কৃষ্ণের নারায়ণী সেনা। ঠাকুর পাণ্ডবদের বলতেন যোগী ভোগী। কৃষ্ণকে চাইছে আগে, পরে রাজ্যটাজ্য। পাণ্ডবরা ঘরে থেকে শেষে যোগী হয়েছিলেন। মানে জ্ঞানী। তখন রাজ্যে থাকলেও মন থাকে ঈশ্বরে — শ্রীকৃষ্ণে। শ্রীকৃষ্ণের শরীর ত্যাগের সংবাদ শুনে রাজ্যটাজ্য সব ছেড়ে পূর্ণ সন্ন্যাসী হয়ে, মহাপ্রস্থান করলো।

পশুবৎ ভোগী এ অবস্থায় ঈশ্বরকে প্রায় নেয় না। সকাম ভোগী এ অবস্থায় ঈশ্বরকে নেয় অভ্যুদয়ের জন্য। নিষ্কাম ভোগী বা যোগী ভোগী। তারপর সম্পূর্ণ যোগী। সবই অবস্থার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ধ্রুব সকাম সাধনা করে তাঁকে পেলেন। তাঁর কাছ থেকে প্রথমে রাজ্য কামনা করলেন। এমন রাজ্য, যা তাঁর বংশে কেউ কখন পায় নাই। ভগবান তাই দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই জ্ঞান হলো। তখন পশ্চাৎ-তাপ করতে লাগলেন। বললেন, হায় করলাম কি! যোগীশ্বরগণ যাঁকে পাবার জন্য লক্ষ্য জন্ম তপস্যা করেন, তাঁকে চোখের সামনে পেয়েও চাইলাম রাজ্য। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার কি দুরন্ত প্রভাব!

কিন্তু তিনি সাধুসঙ্গও চেয়েছিলেন ভগবানের কাছে। তাই এই জ্ঞান হয়েছিল। তখন বলেছিলেন, কাচ কুড়াতে এসে যদি কেউ কৌস্তুভ পায়,

তবে সে কি কাচ ফেলে কৌস্তুভ নেবে না? তখন ভগবান বললেন, আচ্ছা এখন রাজ্য কর। পরে তোমার জন্য অক্ষয় ধ্রুবলোক তৈরী থাকবে।

এমনি সব কাণ্ড। তাঁর কৃপায় সব হয়। তিনিই মায়াতে বদ্ধ করেন। আবার তিনি মুক্ত করেন। সাধুসঙ্গ করলে এ সব কথা মনে আসে।

শরচ্চন্দ্র — এই কথা চণ্ডীতেও আছে। সমাধি বৈশ্য, দেবীর কাছে চাইলেন তাঁর শ্রীচরণ। কিন্তু সুরথ চাইলেন রাজ্য।

শ্রীম — হাঁ। প্রথমে তারা মনের শান্তির জন্য দেবীর সকাম আরাধনা করে। দেবী দর্শন দিলে বৈশ্য কাচ ছেড়ে কৌস্তুভ চাইল — মুক্তি চাইল। কিন্তু সুরথের তীব্র বিষয় বাসনার জন্য রাজ্য চাইল। বৈশ্য সমাধি, সকাম থেকে নিষ্কাম হলো। মর্কট বৈরাগ্য থেকে সত্যিকার বৈরাগ্য লাভ করলো। সংসারে বিরাগ মানে ঈশ্বরে অনুরাগ। একেই বলে মুক্তি।

সংসারে বদ্ধ করেন মহামায়া। তবে সংসার চলছে। আবার মুক্তিও তিনি দেন আন্তরিক চাইলে। দুই-ই তাঁর হাতে — বন্ধন ও মুক্তি। ঠাকুর তাই আমাদের শিক্ষার জন্য সর্বদা প্রার্থনা করতেন — 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না'। তিনি সর্বদা চোখে দেখতেন কিনা কিরূপ অঘটন ঘটান মহামায়া। জ্ঞানীদেরও ভুলিয়ে দেন।

ঠাকুর বলেছিলেন, মা আমাকে তাঁর অবিদ্যা রূপ একদিন দেখালেন। নিজের পেট থেকে একটা ছেলে হলো। আর তক্ষুনি ওটা খেয়ে ফেললেন।

বলেছিলেন, মা নিজে যাকে ধরে রাখেন সে-ই কেবল রক্ষা পায়। বলতেন, আমার যে এই অবস্থা এ কি আর আমার শক্তিতে হয়েছে, মা ধরে রেখেছেন।

বলেছিলেন, বাপ যে ছেলের হাত ধরে তার পড়বার ভয় কম। যে নিজে বাপের হাত ধরে তার পড়বার ভয় বেশী।

জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই ভয় মোহে পড়ার। তাই সর্বদা ঐ প্রার্থনা করতেন জীবের শিক্ষার জন্য — 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না'।

এই চণ্ডীতেই আছে মেধস্ ঋষি বলছেন, মহামায়া জ্ঞানীদের চিত্তও মোহে ফেলে দেন। জ্ঞানী মানে পরোক্ষ অপরোক্ষ দুই-ই। যাবৎ শরীর

তাবৎ ভয়। তাই সদা প্রার্থনা চাই। কি আছে চণ্ডীতে?

শরচ্চন্দ্র — জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

ত্রৈলোক্য — ঈশ্বর কেন করেছেন এসব?

শ্রীম — মানুষ কি করে বলবে কেন করেছেন। বেদে ঋষিরা বলেছেন — ঈশ্বর এ সব করেছেন।

বলেছেন — আনন্দে সৃষ্টি, আনন্দে পালন, আবার আনন্দে বিনাশ করছেন এই জগৎ।

বেদে বলেছেন ঋষিরা — আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে॥ আনন্দেন জাতানি জীবন্তি॥ আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তীতি॥

মানুষ এর কি বুঝবে মলিন বুদ্ধি দিয়ে? তিনি এই অহংকার রেখে দিয়েছেন মানুষের ভিতর। তাই সে 'আমি আমি' করে। ঠাকুর বলতেন, নিচে আগুন রয়েছে। তাই আলু পটল লাফাচ্ছে। জ্বাল টেনে নাও, সব বন্ধ।

ঋষিরা বলেছেন, এ তাঁর খেলা — 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'। মানুষের মতই তাঁর খেলা — 'লীলা' মানে খেলা। যদি বল, মানুষের আনন্দের অভাব আছে, তাই সে আনন্দ লাভের জন্য খেলা করে। কিন্তু ঈশ্বর তো আনন্দস্বরূপ। তবুও কেন এই খেলা — জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করেছেন? এর উত্তর ঋষিরা বলছেন, আমরা এর বেশী জানি না।

তা জানবেন কি করে? ঈশ্বর কি কারো সঙ্গে পারমর্শ করে করেন এই সব? তিনিই একমাত্র সত্য। সত্য মানে যার কখনও জন্ম নেই, বিনাশ নেই। সর্বদাই আছেন। ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান নেই যাতে। বলছেন, 'সদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ।' আর কেউ নেই কেবল তিনি আছেন।

ঠাকুর তাই বলতেন, আমি দেখছি মা-ই সব করছেন সব হয়ে রয়েছেন। ঋষিরাও তাই-ই বলেছেন।

ঋষিরা আরও বলছেন, — ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

শ্রীম (ত্রৈলোক্যের প্রতি) — অত পরাক্রান্ত এই সবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, তারাও তাঁর ভয়ে নিজ নিজ কাজ করেছে। তারাও জানে না,

কেন তিনি এই জগৎলীলা করছেন। এমনি কাণ্ড! মানুষ কি বুঝবে তার। অগ্নি সূর্য বরুণ পবন যম, এরা কাঁপছে, তাঁর ভয়ে কাজ করছে।

একি, দুই আর দুই, চার — এই বিচার? অনন্তের কথা হচ্ছে। তাঁর এক কণা বুঝতে হলেও তাঁর সহায়তা চাই। ঋষিরা তাই অবাক হয়ে বলছেন, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। (কঠো ১:২:২৩)

যাদের বোঝাবেন তাদের দিয়ে তপস্যা করান। জন্ম জন্ম তপস্যা করে তবে তাঁর কৃপায় তারা তাঁকে বোঝে। 'অনেকজন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং।' (গীতা ৬:৪৫)

আবার তিনি মানুষ হয়ে এসে এসব কথা গুটিকয়েক লোককে বলে যান। তারা অপরকে বলে। যাদের বিশ্বাস হয় তাঁর কথায়, তাদেরই বলেন।

পরমহংসদেব এই সেদিন এসে এইসব কথা বলে গেছেন আমাদের।

দুটো side-ই (দিকই) দেখিয়ে গেছেন — কেন জীব বদ্ধ আর কি করে মুক্ত হয়।

আর বলেছিলেন, শুধু তিনি এই সব করছেন, তা' নয়। আবার তিনিই এইসব হয়ে রয়েছেন, ভাল মন্দ সব।

মানুষ কি বুঝবে এর? তাই higher man (পুরুষোত্তম) ছাড়া গতি নেই। তাঁর, আর অবতারের, শরণাগত হয়ে থাকলে একটু বোঝা যায়। অর্জুন একটু দেখেই একেবারে 'বেপথুঃ' (কম্পিত) হয়ে পড়েছিলেন। কতবড় অধিকারী তিনি। অন্য লোকের 'কা কথা'?

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ১০ই পৌষ, ১৩৩১ সাল।
বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা চতুর্দশী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্রাইস্টের জন্ম আস্তাবলে — শ্রীরামকৃষ্ণের ঢেঁকিশালে

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বারান্দা। শীতকাল। সন্ধ্যা। আজ ক্রীসম্যাস (X'mas)। শ্রীমকে দর্শন করিতে 'স্বামীশিষ্য সংবাদ'-এর লেখক শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী আসিয়াছেন। আরও বিশিষ্ট ভক্ত কেহ কেহ আসিয়াছেন নিত্যকার ভক্ত ছাড়া। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত বাণী শ্রীম অকাতরে ভক্তগণকে বিতরণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — লোক যে 'আমি আমি' করে, কোথায় সে 'আমি'? সবই তো তিনি। করেছেনও তিনি, করাচ্ছেনও তিনি, আবার হয়েছেনও তিনি। পালন করছেন তিনি, বিনাশও করছেন তিনি। অগ্নি জল বায়ু আলো, এ সবই তিনি করছেন। আবার মন বুদ্ধিও তাঁরই কাজ। অন্তর্যামীরূপে সকলের পরিচালকও তিনি। সকলই তাঁর কাজ। সকলই তিনি। এখন আমি বলছি — 'আমি আমি'। কি inconsistent position (বেমানান অবস্থা)!

দেখুন না, এখন শীতকাল। জীবরক্ষার জন্য তুলো, পশম করে রেখেছেন। কত রকমের খাদ্যদ্রব্য। সব তাঁর ব্যবস্থা। বন্ধ হয়ে যাক্ দেখি একঘন্টা হাওয়া! তখন কোথায় থাকবে 'আমি'?

আবার তিনি নিদ্রারূপী। এদিকে তো অত লম্বা লম্বা কথা। নিদ্রার সময় যদি মুখে পেচ্ছাপ করে দেয়, তাই খেতে থাকে। এমনি helpless state (অসহায় অবস্থা)! কি করে বলে 'আমি'!

মানুষ যে যত বড়ই হোক, সব তাঁর 'অণ্ডারে' ঠাকুর বলতেন।

এইসব বাইরের ও ভিতরের জিনিসগুলোর consciousness (বোধ) যখন এক সঙ্গে হলো, তখন বলছি 'আমি'। এইটুকু কম পড়লেই

আর সেই consciousness (বোধ) থাকবে না। তখন আমিও নেই। তখন death (মৃত্যু)।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — আমরা পড়েছিলাম কিনা, Madam How and Lady Why-র (মেডাম 'কিরূপে' আর লেডি 'কেন'র) কথা। মানুষের কাছে এ দুটোই আছে। কিন্তু এখানে তা' নাই — ঈশ্বরের কাছে। 'How'-টা অর্থাৎ কি নিয়মে এসব হচ্ছে তাই scientist-রা (বিজ্ঞান বিশারদগণ) একটু একটু চেষ্টা করছে বের করতে। কিন্তু 'Lady Why'-কে (শ্রীমতী 'কেন'কে) বোঝবার যো নাই।

কেন তিনি এই খেলা খেলছেন, কেন তিনি নিজেই সব হয়েছেন, আবার নিজেই চালাচ্ছেন, আবার একেবারে unattached (নিঃসঙ্গ) — এ তত্ত্ব বের করা কারো সাধ্য নাই।

তবে তুমি যদি এই কাণ্ডে পড়ে বিব্রত হয়ে যাও, আর এ থেকে বাঁচতে চাও, এই undulation থেকে (দোল খাওয়া থেকে), এই আষ্টেপিষ্টে বন্ধন থেকে, তারও পথ বলে দিয়ে গেছেন মানুষ হয়ে এসে। বলেছেন, 'মামেকং শরণম্ ব্রজ' (গীতা ১৮:৬৬)। আবার বলেছেন, 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম্ তরন্তি তে' (গীতা ৭:১৪)। স্পষ্ট করে এ সব কথা গীতায় বলেছেন। বলেছেন, আমার শরণ নিলেই এই দুস্তর মায়ার হাত থেকে রেহাই পাবে। আর পথ নাই।

এই সেদিন ঠাকুর অন্তরঙ্গদের বলেছিলেন 'আমায় ধর', 'আমার ধ্যান কর'। আবার প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য শান্তি সুখ প্রেম সমাধি, আমার ঐশ্বর্য।'

মহামায়ার চক্করে পড়ে লোক দিশেহারা। দোটানায় পড়ে লোক হাবুডুবু খাচ্ছে। এই তো beautiful (সুন্দর) position (অবস্থা)! এ নিয়ে কি করে বুঝবে লোকে? তাই তাঁকে ধরা। তখন কিছু কিছু বুঝতে পারবে।

তাই ঠাকুর বলতেন, মহাদেব 'আমি'-টা খুঁজতে গিয়ে শেষে ধেই ধেই করে নাচতেন। দেখতেন কিনা, সবই তিনি হয়ে রয়েছেন। নিত্য ও লীলা দুই-ই তিনি। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড দুই-ই তিনি।

যুবক (স্বগত) — আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে, শ্রীম এই 'আমি'-টা আঙ্গুল দিয়ে তুলে ধরে সেটা যেন কচলিয়ে ভেঙ্গে দিচ্ছেন। কি আশ্চর্য শক্তি!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গীতায় আছে, এই কাণ্ডের আগাও জানা নাই, গোড়াও জানা নাই। মাঝখানটা একটু দেখা যাচ্ছে — 'ব্যক্তমধ্যানি ভারত'। তাতেও আবার অত সব কাণ্ড। এর একটা কণার সন্ধানও মানুষ করতে পারছে না অত চেষ্টাতেও। এমনি helpless (অসহায়) অবস্থা লোকের। কি করে বুঝে বল। কি শ্লোকটা।

শরচ্চন্দ্র — অব্যক্তাদীনি ভূতানি বক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ (গীতা ২:২৮)

শ্রীম — আদিতেও তিনি অন্তেও তিনি। মাঝখানটা তবে কেন মিছিমিছি — 'আমি'? এটাকেও 'তিনি' করে ফেলবার চেষ্টা করা চাই। এরই নাম সাধনা, তপস্যা। হয় সবটা 'আমি', নইলে সবটা 'তিনি'। এর মাঝামাঝি পথ নেই শান্তির।

শ্রীম (ত্রৈলোক্যের প্রতি শরচ্চন্দ্রকে দেখাইয়া) — এই দেখুন না, ইনি মরতে বসেছিলেন। তা কত কি করে, কত ভাল climate-এ (জলবায়ুতে) থেকে তবে ভাল হয়েছেন। তাইতো মানুষ completely dependent (সম্পূর্ণরূপে পরতন্ত্র)।

শ্রীম নীরব কিছুকাল। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ত্রৈলোক্যের প্রতি) — আর এক থাকের লোক করেছেন তিনি। তারা বহুকাল বিদেশে রয়েছে। এখন ঘরে ফিরতে চাইছে। খুব কম এ থাকের লোক। এখানকার কামাই-রোজগার করে সুখ নাই বুঝতে পেরেছে। তাই 'নিজ নিকেতনে' যেতে চাইছে। খুব ব্যাকুল তারা। সর্বদা অন্তরে কাঁদছে — যেমন শিশু কাঁদে মায়ের জন্য। তাদের তিনি কোলে তুলে নেন। তখন এখানে (গৃহে) থাকলেও শান্তিতে থাকে। তখন দেখে সবই তিনি করছেন। দু'টি মানুষ হয় তখন। একটি সংসারের, অপরটি ঈশ্বরের। এই সব লোকদের মহাত্মা বলে। তাঁরাই আদর্শ জগতের।

ত্রৈলোক্য — এইবার আসি তা হলে।

শ্রীম (যুক্ত করে) — আপনাকে দর্শন করে বড়ই আনন্দ হলো।

আপনি কম! আপনার ছেলেকে দেখেই বোঝা যায় বাপকে।

ত্রৈলোক্য — আপনি কি বলেন! আমার সৌভাগ্য যে দর্শন পেলাম। আমরা অধম লোক।

শ্রীম (আসন হইতে উঠিয়া) — না! মুখী ভাল হলে ওলও ভাল (হাস্য)। (ভক্তদের প্রতি) — আলোটা ধর সিঁড়িতে।

বীরেন ও তাঁহার পিতা নিচে নামিতেছেন।

২

হেমচন্দ্র সরকারের প্রবেশ। ইনি শ্রীম-র প্রাক্তন ছাত্র। ভক্ত লোক। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এখন ডিভিশন্যাল ইনস্‌পেক্টার অব স্কুলস্‌। সজ্জন ব্যক্তি। সঙ্গে তের বৎসর বয়স্ক পুত্র। পুত্রসহ হেমবাবু শ্রীমকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। শ্রীম অতি আহ্লাদে বসিতে বলিলেন চেয়ারে। এই চেয়ারেই ত্রৈলোক্য বসিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র কিছুতেই চেয়ারে বসিলেন না। বসিলেন শ্রীম-র পিছনে বেঞ্চে। শ্রীম পূর্ব কথিত 'আমি'-র সন্ধান বলিতে লাগিলেন।

শ্রীম (হেমচন্দ্রের প্রতি) — আমরা এই কথাই বলছিলাম, মানুষ এই যে দিন রাত 'আমি আমি' করে কোথায় সে 'আমি'? সবই তো তিনি। জন্মের আগের খবর নেই, আবার মৃত্যুর পরের খবর নেই, তবুও বলে 'আমি'। কি অবাক কাণ্ড!

তিনি সব করে দিয়েছেন তবে এই কলটা চলছে। এ দেখেও দেখছে না। বলছে, আমি হেন করুঙ্গা, তেন করুঙ্গা। আষ্টেপিষ্টে বাঁধা, তবুও বলে 'আমি'। কি অবাক কাণ্ড!

ডাক্তার বক্সীর প্রবেশ। হাতে দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর প্রসাদ। ইতিমধ্যে অনেক ভক্ত আসিয়া জুটিলেন। শ্রীম-র আদেশে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী উঠিয়া গিয়া সামনে চেয়ারে বসিলেন। চার পাঁচ হাত দূরে সিঁড়ির উপর দেয়ালের গায়ে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে। এখন রাত্রি সাতটা। শীতকাল।

আজ বড়দিন বলিয়া ভক্ত মজলিস আকারে বেশ বৃহৎ। বিনয় ও ডাক্তার, ছোট নলিনী ও 'ব্রুকবণ্ড' যতীন, শান্তি ও সুরপতি, সত্যবান ও বড় নলিনীর ভাই, শুকলাল ও উকীল ললিত ব্যানার্জী, একজন সুন্দর

যুবক, রমণী ও সঙ্গী তিনজন শিক্ষিত যুবক, গদাধর ও জগবন্ধু প্রভৃতি অনেক ভক্ত যে যেখানে পারেন বসিয়া 'কথামৃত' শুনিতেছেন। ডাক্তারের আনীত প্রসাদী সন্দেশ বিতরণ হইলে পুনরায় কথোপকথন হইতেছে।

হেমচন্দ্র (পুত্রকে দেখাইয়া) — এই ছেলেটি বাল্যকাল থেকেই কীর্তন জানে। ঈশ্বরের কথায় আনন্দ হয়। আমার বড় ছেলে মারা গেছে। এটি সেকেণ্ড।

শ্রীম — তা বেশ তো। কিন্তু ঠাকুর বলতেন, 'আমার ছেলে' বলতে নেই। বলতে হয় তাঁর জিনিস আমার কাছে রাখতে দিয়েছেন। এই বলে সেবা করা। তিনি জানতেন কিনা, হয়তো মরে গেল, তখন লোকে পাগল হয়ে যাবে। তা হলে মহা সর্বনাশ উপস্থিত। 'মহতী বিনষ্টি' (কেনো ২:৫) — বেদ বলছেন। যে শরীরটা ভগবান লাভের জন্য সে শরীরটা এমনি গেল। বাজে কাজে খরচ হয়ে গেল। এর থেকে আর কি বড় সর্বনাশ হতে পারে? জন্ম-মরণচক্রে আবার পড়তে হবে। তাই বলতেন আমার ছেলে বলতে নেই। তাঁর জিনিস আমার কাছে রেখেছেন গচ্ছিত।

ছেলে গান গাহিতেছে। গানের মর্ম — বিনা অনুভূতি বেদাদি শাস্ত্র শুধু পড়ে কোন লাভ হয় না। সাধুসঙ্গ সার।

শ্রীম (আহ্লাদে) — বা, কি সুন্দর ধরেছে আমাদের conversation (কথোপকথন)। (একজন ভক্তের প্রতি) একে মিষ্টিমুখ করাও।

শ্রীম বালকের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন আনন্দে, বালকের ন্যায়। বালকও সাহস পাইয়া শ্রীম-র সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেছে।

বালক (শ্রীম-র প্রতি) — আমি একটা কথা শুনেছি। কাশীতে একজন লোক তার মায়ের শ্মশানের উপর একটা মন্দির করেছিল। সে ভাবলে এতে তার মাতৃঋণ শোধ হয়ে গেল। যেই এই ভাবনা, অমনি মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল।

শ্রীম (সুমুখ-ঠেলা চক্ষু দুইটি আরও উঁচুতে তুলিয়া কল্পিত বিস্ময়ে) — দেখলে, মা-বাপের ঋণ শোধ হয় না। ঈশ্বরের এ দুটি রূপ। তিনি এদের কাছে রেখে দিয়েছেন ছেলেকে পালনের জন্য।

শ্রীম (হেমবাবুর প্রতি) — একে সাধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে শীগ্‌গীর ধরতে পারবে যেমন দেখছি। মঠে নিয়ে যাবেন মাঝে মাঝে।

যৌবনকাল ভীষণ সময় কিনা। তখন একটা আশ্রয় না পেলে বড়ই মুস্কিল।

উপাধ্যায় — এর আর ভয় নাই।

শ্রীম — না! পরমহংস অবস্থা যাদের তাদেরই ঠাকুর বলছেন 'সাধু সাবধান'। আর এ কি বলে তার নেই ঠিক। মহামায়ার সঙ্গে চালাকি! এমনি ভেল্কী লাগিয়ে দেন যে কোথায় গিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। গায়ে কাদা মেখে হাবুডুবু খাচ্ছে হয়তো। তাইতো ঠাকুর ঐ প্রার্থনাটি শিখিয়ে দিছলেন — 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।'

তাই এই দেশে মহামায়ার পূজা খুব বেশী — কালী, দুর্গা, কখনও সরস্বতীরূপে।

একটি ভক্ত (স্বগত) — কি আশ্চর্য! বাল্যকালে জন্মস্থানে তাই বড়রা নিত্য মহামায়াতলায় প্রণাম করতে শিখিয়েছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যিনি সব ভুলিয়ে দেন আবার তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান দেন। এমনি খেলা মহামায়ার। ঠাকুর বলতেন, পুকুরে পানা একটু সরালে হয়তো; কিন্তু আবার নাচতে নাচতে এসে ভরে গেল।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আশুবাবু (চিফ্ জাস্টিস স্যার আশুতোষ মুখার্জী) যখন মারা গেলেন তখন কয়দিন আমার খুব বৈরাগ্য হয়েছিল। ওমা, তারপর সব কোথায় গেল। তাঁর মহামায়ার সঙ্গে চালাকী করবার যো আছে? তুমি হাজার সাধুই হও, আর একটু গেরুয়া পর — সর্বদা 'ত্রাহি ত্রাহি'।

হেমচন্দ্র ও পুত্র প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। আবার কথা।

শ্রীম (শরচ্চন্দ্রের প্রতি) — কয়দিন থাকবে?

শরচ্চন্দ্র — ছুটিটা যে কয়দিন থাকে। এখন ইচ্ছা হচ্ছে, ঠাকুরের ভক্তদের কাছে বেড়িয়ে বেড়াই। আর তাঁদের কথামৃত পান করি। তাই আজ এলাম আপনাকে দর্শন করতে।

এক বৈষ্ণবসভায় আমি বলেছিলাম ভক্তদের, মহাপুরুষদের বাণীই বেদ। ঠাকুরের কথা সব বেদবাণী। ঠাকুরের কথার মূর্তি সব আপনারা — স্বামীজী, আপনি ও অন্য ভক্তরা। কিন্তু কি আশ্চর্য! ঠাকুর ছিলেন নিরক্ষর।

শ্রীম — তিনি বলেছিলেন কিনা — সচ্চিদানন্দ এ শরীরে এসেছেন। মানুষের চোখে নিরক্ষর।

তিনি নিজে জানতেন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্য মনের অতীত 'তিনিই আমি'। ইদানীং নরকলেবরে। তবে বাইরের আবরণটা রেখেছিলেন — মায়ের কোলের ছেলে।

শ্রীম — আমারও ইচ্ছা হয় এই কলকাতা শহরে ভগবানের জন্য কে কি করছে তা দেখে বেড়াই। বুড়ো শরীর, হয়ে উঠে না। সব ভক্তদের দেখতে ইচ্ছা হয়।

(অন্তেবাসীকে দেখাইয়া) কাল এঁদের পাঠিয়েছিলাম চার্চ, ব্রাহ্মসমাজ গঙ্গাতীর ও আশ্রম দেখতে। বাঁকা রায়ের গলিতে ঠাকুরের একটি আশ্রম আছে। সাধুরা সব থাকেন ওখানে। নাম শ্রীরামকৃষ্ণ স্টুডেন্টস্ হোম।

নিজে পারি না। তাই ভক্তদের দিয়ে সব খবর নিই। শুনলেও বার আনা হয়, ঠাকুর বলতেন।

কত মত হিন্দুদের! তাঁরা কি ভাবে ডাকে তা দেখা। আবার তাঁর মুসলমান ভক্তরা মসজিদে তাঁকে ডাকছে। খ্রীস্টান ভক্তরা ডাকছে চার্চে। আজ তাঁর (ক্রাইস্টের) জন্মোৎসব ক্রীস্ম্যাস্। আবার বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী ভক্ত আছে। সব দেখতে ইচ্ছা হয়।

শরচ্চন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। আবার কথা।

উপাধ্যায় (শ্রীম-র প্রতি) — দেশে (ঢাকায়) আপনাকে স্বপ্ন দেখেছিলাম, কৌপীন পরা। আবার ইসারা করে ডাকছেন।

শ্রীম — বটে? যে যা চিন্তা করে সে তাই দেখে। হয়তো সাধু হওয়ার ইচ্ছা আছে। তাই কৌপীন পরা দেখা।

(সহাস্যে) — আবার যদি কেউ দেখে, পাদ্রি পেন্টুলন পরে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে লেকচার দিচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে তার ধর্ম-বক্তৃতা দেবার ইচ্ছা।

স্বপ্ন স্বপ্নই। তবে মন্দ দেখার চাইতে ভাল দেখা ভাল।

সুরপতি ও সত্যবান বিদায় লইতেছেন। সুরপতি বি.এ. পাশ। সংস্কৃত বেশ জানেন। সত্যবান স্টুডেন্টস্ হোমে থেকে পড়ে। শ্রীম যখন মিহিজামে ছিলেন তখন মুকুন্দর সেবার জন্য সত্যবান সেখানে ছিল।

শ্রীম (সত্যবানের প্রতি) — তোমরা লিখছ তো, অনাদি মহারাজ গীতা ক্লাসে যা বলেন? নোট করলে শীঘ্র বোঝা যায়। কি হলো কাল?

সত্যবান — একজনের প্রশ্নের উত্তর বললেন, ওঁকার ভগবানের একটি নাম। সব শব্দের মূল এটি। সব ভাষা এ থেকে এসেছে। আর একজনকে বললেন, চিত্ত শুদ্ধ করতে হলে সাধুসঙ্গ ও নিষ্কাম সেবা করার দরকার। সাধুসঙ্গ করলে সৎচিন্তা হয়। আর নিষ্কাম সেবার উদ্দীপন হয়।

৩

শ্রীম-র কথায় অন্তেবাসী বাইবেলখানা আনিয়াছেন। এইবার বাইবেল পাঠ হইবে।

শ্রীম চেয়ারে উপবিষ্ট দ্বিতলের সিঁড়ির সামনে পূর্বাস্য। এই চেয়ারেই প্রথমে ত্রৈলোক্য ও পরে শরচ্চন্দ্র বসিয়াছিলেন। হ্যারিকেনটা আনিয়া হাই বেঞ্চের উপর রাখা হইল শ্রীম-র বাঁ হাতে। শ্রীম-র মাথায় মটকার চাদর। গায়ে ওয়ারফ্লানেলের পাঞ্জাবী। শীতকাল। রাত্রি নয়টা।

শ্রীম 'সেন্ট লুক' বাহির করিয়া ইংরেজীতে পড়িতেছেন। আর মাঝে মাঝে বাংলায় ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রথম অধ্যায় ছাব্বিশ বাণী হইতে আশী বাণী অর্থাৎ অধ্যায় শেষ পর্যন্ত পড়িলেন। আবার দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম থেকে একচল্লিশ বাণী পর্যন্ত পাঠ করিলেন। এবার ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেবদূত গেব্রাইল এসে মেরীকে বলে গেল, তোমার গর্ভে ভগবান আবির্ভূত হবেন। ভয় করো না। তিনি ডেভিডের আসনে বসবেন।

ছেলেমানুষ মেরী। মাত্র তের বছর বয়েস। ভয় পেয়ে গেল। দেবদূত তাই আবার বললো, 'and of his kingdom there shall be no end.' তাঁর ধর্মরাজ্য অনন্তকাল স্থায়ী হবে।

যেখানে সত্য পবিত্রতা, সংযম সরলতা, সেখানেই ভগবান অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুর এলেন দরিদ্রের কুটীরে। কিন্তু কি সত্য ও সরলতা!

মিথ্যা সাক্ষী দেবার ভয়ে ঠাকুরের পিতামাতা গৃহ ও সর্বস্ব পরিত্যাগ

করে চললেন কামারপুকুর, রজনীর অন্ধকারে। আর ফিরলেন না। গ্রামের দুর্দান্ত জমিদার মিথ্যা সাক্ষী দিতে বলেছিল, তাই এক বস্ত্রে সব চলে গেলেন। আহা কি ত্যাগ!

ঠাকুর নিজের মুখে বলেছিলেন, আমি অবতার। আবার, আমিই ক্রাইস্ট।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — জেরুজালেমে দুজন ভক্ত ছিলেন। একজন স্ত্রী, একজন পুরুষ — সিমিয়ান ও আন্না। এঁরা দেবাদিষ্ট হয়েছিলেন। ঈশ্বর বলেছিলেন, আমি আসছি। আমাকে দর্শন করে শরীর ত্যাগ করো। তাঁরা খুব বৃদ্ধ ছিলেন।

ক্রাইস্টের জন্মের অষ্টম দিনে প্রথা অনুসারে তাঁকে মন্দিরে নিয়ে গেল। কোথা থেকে এরা এসে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে স্তব করতে লাগলো, তোমার দর্শনের অপেক্ষায় ছিলাম। দর্শন হলো। প্রভো, এখন দেহত্যাগের অনুমতি দাও। কি আশ্চর্য!

ঠাকুর বলেছিলেন, গভীর বনে ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি আসে।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — 'এ্যাবট্‌স্ লাইফ অফ নেপলিয়ান'-এ আছে — সেণ্ট হেলেনায় বন্দী অবস্থায় তিনি বলেছিলেন, আমার জীবদ্দশায় আমার রাজ্য গেল। কিন্তু ক্রাইস্টের ধর্মরাজ্য তাঁর মৃত্যুতে আরম্ভ হয়ে এখনও চলছে। আরও চলবে। কি আশ্চর্য শক্তি!

যুবক — বলরাম ও কৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে জন দি ব্যাপটিস্ট ও ক্রাইস্টের জন্মের মিল হয়।

শ্রীম — হাঁ। একই শক্তি দুই ভাগ হয়ে রোহিণী ও দৈবকীর গর্ভে প্রবেশ করলো, তাই বলরাম ও কৃষ্ণের জন্ম। ঐ শক্তিই এলিজাবেথ ও মেরীর গর্ভে প্রবেশ করলো। তা থেকে জন ও ক্রাইস্টের জন্ম।

বলেছেন কি না গীতামুখে, আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই — 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। (গীতা ৪:৮)

জন মাসতুতো ভাই, ছয় মাসের বড়। তিনি সন্ন্যাসী। তিনি প্রচার করেছিলেন, এরপর একজন আসছেন। তাঁর পায়ের জুতো খুলবার অধিকার আমার নেই। ক্রাইস্ট তখন বাপের সঙ্গে ছুতোরের কাজ করছিলেন।

সত্য কথা বলায় জনের শিরচ্ছেদ হলো। ক্রাইস্টের শরীরও সত্য

কথা বলার জন্যই ক্রুশে বিদ্ধ হল।

যদুবংশ ধ্বংস হলো প্রভাসে। ছেলেপুলেদের দৌরাত্ম্যে দুঃখী হয়ে বলরাম সমাধিস্থ হয়ে শরীর ছাড়লেন। ঐখানেই কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দেখলেন এই ধ্বংসলীলা। শেষে তাঁর শরীরও ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হল।

ঠাকুরও ভক্তদের সকল পাপ নিয়ে কঠোর রোগে আক্রান্ত হয়ে শরীর ত্যাগ করলেন।

কি বিচিত্র লীলা! মানুষ এর কি বুঝবে?

একটা কথা স্পষ্ট। শরীর ধারণ করলে দুঃখকষ্ট থাকবেই। সংসার দুঃখময়। এটা আনন্দময় হয় যদি ঈশ্বরকে ধরা যায়। তাঁরা দুঃখে গেলেন। কিন্তু ভক্তদের জন্য রেখে গেলেন আনন্দ।

কৃষ্ণ বললেন, 'মামেকম্ শরণং ব্রজ'। ক্রাইস্ট বললেন, 'আমায় ধরে থাক'। ঠাকুরও তাই বললেন — 'আমায় ধর, বাকী সব করে দিব'।

কৃষ্ণ জন্মালেন কারাগারে। ক্রাইস্ট জন্মালেন আস্তাবলে। আর ঠাকুর জন্মালেন ঢেঁকিশালায়। কি প্রহেলিকা!

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ। ১০ই পৌষ, ১৩৩১ সাল।
বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা চতুর্দশী। ক্রীসম্যাস।

তৃতীয় অধ্যায়

কালীমূর্তি — সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের প্রতীক

১

মর্টন স্কুল। চারতলায় শ্রীম-র কক্ষ। সকাল সাড়ে আটটা। শীতকাল। শ্রীম আপন বিছানায় বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। সম্মুখে বেঞ্চে বসা চিত্রশিল্পী একটি যুবক। তাহাকে লইয়া কথামৃতের প্রুফ দেখিতেছেন। কপি যুবকের হাতে, প্রুফ সংশোধন করিতেছেন শ্রীম। দরজা অর্গলবদ্ধ।

শ্রীম-র কক্ষটি বেশ বৃহৎ — ত্রিশ ফুট হইবে। উত্তর দক্ষিণে লম্বমান। নিচে আমহার্স্ট স্ট্রীটের পূর্ব ফুটপাত। একটি কাঠের পার্টিশান দিয়া গৃহটি দুইভাগে বিভক্ত। দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশে থাকেন শ্রীম। আর বৃহৎ অংশে আজকাল পঞ্চম শ্রেণী বসে।

রেক্টার মুকুন্দ আসিয়া বৃহৎ গৃহে বসিয়া আছেন। উদ্দেশ্য, শ্রীম-র কাজে বিঘ্ন উৎপাদন না করা। অন্তেবাসী অন্য একটি প্রুফ তাঁহার ছাদের টিনের ঘরে বসিয়া দেখিতেছেন। এক একবার আসিয়া শ্রীম ও ভক্তদের দেখিয়া যান।

শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পৌত্র অরুণ স্কুলে পড়ে। সে বন্ধু অশোককে লইয়া উপরে আসিয়াছে। সিঁড়ির ঘরে তাহারা বসা। অশোক ম্যাট্রিক দিবে। টেস্টে ফল একটু খারাপ হইয়াছে। তাই রেক্টার শ্রীম-র নিকট আবেদন করিতে আসা। এখন বড়দিনের ছুটি।

বড় জিতেনের প্রবেশ। ইনি মুকুন্দর পাশে গিয়া বসিয়াছেন। স্থূলকায়। তাই অত উঁচুতে উঠিয়া হাঁফাইতেছেন।

প্রুফ পড়িতে পড়িতে 'কালী'র কথা আসিল। শ্রীম এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীম (চিত্রশিল্পীর প্রতি) — আপনাদের আর্টে মা-কালীকে কি বলে?

চিত্রশিল্পী — ভারতীয় শিল্পনীতিতে কালীমূর্তিতে উচ্চাঙ্গের ভাবের অভিব্যক্তি হয়েছে। ধ্বংসের, প্রলয়ের প্রকাশ।

শ্রীম — ওয়েস্টের ঢংএ কেউ কেউ বলে 'কালী সাঁওতালী মাগী' (উচ্চহাস্য)।

চিত্রশিল্পী — ওরা বুঝতে পারে না ব্যাপার কি। তাই বলে।

শ্রীম — ঠিক কথা। কালীমূর্তিতে সমস্ত জগৎটা, সম্পূর্ণ সৃষ্টিটা represented (প্রদর্শিত) হয়েছে। ব্রহ্মশক্তির পূর্ণ manifestation (প্রকাশ)।

যে শক্তি জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ করেন তাঁকে বলে ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, ঠাকুর বলতেন। যখন স্বরূপে থাকেন তখন বলে ব্রহ্ম। যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন তখন তাঁকে বলে শক্তি।

বলতেন, যেমন সাপ। কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা, আর হেলেদুলে চলা। স্বরূপ অবস্থা, আর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ কার্যের অবস্থা।

শ্রীম — কালীমূর্তিতে এই তিনটা অবস্থাই প্রকাশিত। কালীর ধ্যানে আছে, তিনি পূর্ণ যুবতী। প্রথম সন্তান প্রসবের পূর্বে যেমন হয় স্ত্রীলোকের অবস্থা, সেই অবস্থা — 'পীনোন্নত পয়োধরা'। এটি সৃষ্টির প্রতীক। তারপর 'বরাভয়প্রদায়িনী'। এটি হলো পালনের চিহ্ন। মায়ের বর ও অভয় ছাড়া সন্তান বাঁচতে পারে না। নৃমুণ্ড-মালা, লোলজিহ্বা শাণিত কৃপাণ, আরক্ত নয়ন, আর গভীর কালো বর্ণ — এসব ধ্বংসের চিহ্ন। তমোগুণে ধ্বংস হয়। তাই কালো রং। কিন্তু ঠাকুর বলতেন, দূর থেকে দেখলে কালো। ভিতরে গেলে তখন 'হৃদিপদ্ম করে আলো রে'।

শ্রীম (চিত্রশিল্পীর প্রতি) — অত বড় উচ্চ idealism (আদর্শ) এর পেছনে। কিন্তু বুঝতে পারে না কিনা, তাই বলে 'কালী সাঁওতালী মাগী' (অবারিত বালকবৎ খিল খিল হাস্য)।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (চিত্রশিল্পীর প্রতি সহাস্যে) — সত্ত্ব রজঃ তম — এই তিন ভাবের প্রকাশ রয়েছে। বাইরে এই অতি ভীষণা অবস্থা। এর ভিতরে ত্রিগুণাতীত অবস্থা — সচ্চিদানন্দময়ী মা, ব্রহ্মশক্তি। এরও পরের অবস্থা

বাক্যমনাতীত, বর্ণনাতীত। মুখে বলা যায় না, ঠাকুর বলতেন। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত অবস্থা — স্বরূপাবস্থা, ব্রহ্মাবস্থা।

বড় জিতেন (কাষ্ঠ মৌন ভঙ্গ করিয়া) — কই, আমাদের একটু দেবেন কি ভাগ — খুব যে হাসি, ধরছে না যে আর।

শ্রীম — আসুন আসুন, ভিতরে আসুন।

বড় জিতেন, মুকুন্দ ও জগবন্ধুর প্রবেশ। দেখিতে দেখিতে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ও ধ্রুবেশ্বরানন্দ আসিয়া উপস্থিত। সাধুরা শ্রীম-র বিছানায় আসন গ্রহণ করিলেন পশ্চিম দিকে। আর শ্রীম বসিয়াছেন পূর্ব দিকে। আর্টিস্ট শ্রীম-র আদেশে উঠিয়া গিয়া চেয়ারে বসিলেন। বেঞ্চে বসা ডাক্তার, গোপেন, জগবন্ধু ও বড় জিতেন।

ইতিমধ্যে ভক্তদের কয়েকটি ছেলেও প্রবেশ করিল। নারাণ ও অমূল্য ঢুকিল প্রথমে। ইহারা ভক্ত অমৃত গুপ্তের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র — ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে মর্টন স্কুলে। তারপর আসিল শরৎ ও অন্য একটি ছেলে। সে বেশ বক্তৃতা করিতে পারে। ইহারা পড়ে পঞ্চম শ্রেণীতে। সকলের শেষে আসিল দুর্গা ও সাজাহান। এরা পড়ে অষ্টম শ্রেণীতে।

শ্রীম সাধুদের সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন। দুই মাস পূর্বে অক্টোবরে জলপ্লাবনে ঋষিকেশে বহু সাধুর প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। কেহ বলে আড়াই শত, কাহারও মতে দেড় শত। এইসব কথাও উঠিয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে হিমালয়, গঙ্গা, উত্তরাখণ্ড, হরিদ্বার, ঋষিকেশ, তপস্যা ইত্যাদি নানা কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু শ্রীম-র মন মৃত সাধুদের উপর।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — তপস্যা করছিলেন সাধুরা ঋষিকেশে। হঠাৎ মা নিয়ে গেলেন তাঁদের। হয়তো আর দরকার নাই তপস্যার। নিজের কাছে তাই নিয়ে গেলেন। এই জন্যই তো যখন সুযোগ হয় তখন উঠে পড়ে লেগে সব করতে হয়। কিছু তপস্যা করলে মনের খেদ মিটে, শরীর কখন যায় তার ঠিক নাই যখন। এই শরীর ভগবানদর্শনের জন্য। এই কাজে না লাগলে সব বৃথা — ধনজন বিদ্যা, সব বৃথা।

কিন্তু তাঁর মহামায়া জানতে দেয় না, বুঝতে দেয় না এই কথা — শরীরধারণ ঈশ্বরদর্শনের জন্য। তাই লোক চোখের সামনে অত সব ধ্বংস দেখেও সাবধান হয় না। তাই ঠাকুর প্রার্থনা করতেন, 'মা, তোমার

ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না'।

যতদিন শরীরে তেজ আছে, মনে জোর আছে, ততদিন জোর ক'রে করে নিতে হয়। পরে ঐ অভ্যাসের জের থাকে। ঐতে চলে যায় জীবনটা আনন্দে।

দিনরাত ওঠাপড়া হচ্ছে। এই ভাল এই মন্দ, সর্বদা দোলাচ্ছেন। মরণপণ করে কিছুদিন একটু কিছু করলে ভিতরে তখন একটানা একটা ভাব হয়। ঐটে নিয়ে সংসারে থাকা। এটাকেই ঠাকুর বলতেন, মাঝ গঙ্গায় নৌকা রাখ। আর পাল উঠিয়ে বসে থাক। অনুকূল পবনে টেনে নিয়ে যাবে গন্তব্য স্থলে।

পুরুষকার-টার একটু ব্যবহার করা তাঁর জন্য। সবটা সংসারে দিলে ভাল জিনিসটার অপব্যয় হয়। এই আর কি!

স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দ — মাস্টার মহাশয়, আপনি একবার কাশীর দিকে চলুন। আমরা নিয়ে যাব। আমাদের কত লাভ হবে। আর ওখানে অনেক ভক্ত আছে তাদেরও লাভ হবে।

শ্রীম — না। এখন সত্তর বছর পার হয়ে গেছে। আর পারা যায় না। এখন কবে (চলে) যাওয়া!

স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দ — আপনারা সকলেই একে একে চলে যাওয়ার কথা বলছেন। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) চলে গেলেন। তখন আমাদের আইনকানুনের দরকার হতো না। ওঁদের কাছে থাকতে পারলেই যথেষ্ট মনে হতো। আপনারা রয়েছেন, আমাদের কত ভরসা। কোনও ভয় নেই। যখন মনে হয়, মাস্টার মশায়রা আছেন তখন ভয় হয় না। আর তা না হলেই আইন এসে যায়। এখন যেমন সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) আইন করেছেন।

শ্রীম — ঠিক ঠিক। ওঁদের (অন্তরঙ্গ পার্ষদদের) সঙ্গই চৈতন্য করিয়ে দেয়। দর্শনই যথেষ্ট।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ — তাই ঠাকুর বলতেন, এখানে আনাগোনা করলেই হবে। আর কিছুর দরকার নেই।

শ্রীম — হাঁ, আনাগোনাতেই চৈতন্য।

একজন সেবক এক প্লেট সন্দেশ ও রসগোল্লা লইয়া আসিলেন।

শ্রীম দুই হাতে প্লেটখানা সাধুদের সম্মুখে ধরিয়া রাখিলেন। সাধুরা প্লেট হইতে তুলিয়া খাইতেছেন। যেন মা ছেলেদের খাওয়াইতেছেন।

শ্রীম (ছাত্রদের প্রতি) — এই দেখ, এঁরা সব সাধু। এঁদের পায়ে ধরে প্রণাম কর। তোমরা হবে তো এই রকম? দেখ এঁদের।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — একবার দেখায় যা হয়, একশ' বার পড়ায় তা' হয় না।

শ্রীম (একজন ছেলের প্রতি) — আচ্ছা, সাধু কেন হয়?

ছেলে — ভগবানকে ডাকবে বলে।

অন্য ছেলে — না, সর্বদা ডাকবে বলে।

অন্য ছেলে — বিয়ে করলে কাজ করতে হয়। ডাকার সময় হয় না।

অন্য ছেলে — বুদ্ধদেব রাজ্য ছেড়ে সাধু হয়েছিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখলে কেমন? এই দেশ বলে এই। অন্য দেশে পাবে না। এখানে হাওয়াতে বাতাসে এ সব ভাব। ত্যাগের দেশ কি না! কত যুগযুগান্তর থেকে চলে আসছে এ ভাব। আবার মাঝে মাঝে অবতার আসেন। তখন এ ভাব খুব বেড়ে যায়। এখন ঠাকুর এসেছেন।

ছেলেরা ও ভক্তরা সাধুদের প্রণাম করিলেন। সাধুরা শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এখন সাড়ে দশটা।

২

এখন এগারটা। শ্রীম ছাদে দাঁড়াইয়া আছেন অন্তেবাসীর টিনের ঘরের সামনে। ঘরের ভিতর অন্তেবাসী ও ভক্তরা কেহ কেহ আছেন। শ্রীম অন্তেবাসীকে শাসন করিতেছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে চার্জসিট তৈরী হইয়াছে। প্রথম অপরাধ, ছোট জিতেনকে সাড়ে সাত আনা দেন নাই। দ্বিতীয়, হিসাবে দেনা পাওনা দেখান হয় নাই। তৃতীয়, ব্যালান্স-সিট তৈরী করেন নাই। আর চতুর্থ, এখানে নর্দমায় ময়লা জমিয়ে রাখেন।

শ্রীম (জনান্তিকে ভক্তদের প্রতি) — জগবন্ধুবাবুর এই একটা দোষ, কাজ জমিয়ে রাখেন আর ঘরের নর্দমায় ময়লা জমিয়ে রাখেন (ভক্তদের উচ্চহাস্য)।

জগবন্ধুবাবু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন। তাই ভক্তরা তাঁহার উপর গুরুতর চার্জ শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন।

শ্রীম (কল্পিত ক্রোধে) — না, এ হাসবার কথা নয় — Serious matter (গুরুতর ব্যাপার)। ঠাকুর যে বলতেন, যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে, তার কি হবে? আরও বলেছেন, সুতোতে আঁশ থাকলে ছুঁচে ঢুকবে না। আবার বলেছেন, ভক্তদের পিঠেও দুটো চোখ থাকবে। ভক্তরা হবে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক। কোন্ দিক দিয়ে গুলি এসে যায় — সর্বদা সতর্ক ও সন্ত্রস্ত। এখানে একটু অমনোযোগী হলে অমনি প্রাণ গেল! এ সব তাঁর মহাবাক্য। ভক্তদের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন। এই জীবনেই করবেন কিনা। তাঁরা সর্বদা তৈরী থাকবেন। হাতের কাজ এইটুকুও জমিয়ে রাখতে নাই। মনে করতে হয়, এখনি আমার শরীর যেতে পারে। তা হলে আর ঈশ্বরদর্শন হলো না এই জীবনে। এখন যে অবতার এসেছেন। একেবারে সুবর্ণ সুযোগ। এর advantage (সুযোগ) নিতে হবে না?

শ্রীম-র ভক্তসংগঠনের একটি নীতি — ঝিকে মারিয়া বউকে শিখান। কন্যা তো নিজের। তাই অতি সামান্য অপরাধে, বা কল্পিত অপরাধে তাহার কঠোর শাসন। তাহা দেখিয়া 'বউ' (ভক্তগণ) সাবধান হইবে এই ভাবিয়া, যে 'কন্যা'র অত গুণ তাহার উপরই অত শাসন, পান হইতে একটু চুণ খসিয়া পড়ায় — 'বউ'দের (আমাদের) তো কত অপরাধ। আর একটি উদ্দেশ্য শ্রীম-র এইরূপ শাসনপদ্ধতির। ঠাকুরের অপর মহাবাণী — যে যত বড়ই হউক, যত গুণবানই হউক না কেন, সব তাঁহার 'অণ্ডারে'।

শ্রীম-র এই ঢ্যালা দিয়া ঢ্যালা ভাঙ্গার নীতিতে অনেক অবগুণ-সম্পন্ন ভক্ত সজাগ হয়। আর গুণবান ভক্তও সশস্ত্র সৈনিক হয়। গুণ ও অবগুণ দুই-ই সাধকের শত্রু।

অন্তেবাসীর নিকট কিছু অর্থ থাকিত। উহাতে সাধু ভক্তের সেবা হয়। সামান্য অর্থ। এর আয়ব্যয় মুখে মুখে হইয়া যায়। শ্রীম তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি ভক্তদের সকল বিষয় 'শরবৎ তন্ময়' করিতে চান। তাহা না হইলে লক্ষ্যভেদ হইবে না। শ্রীম-র ভাব, পুরুষকারের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার

করিয়া মাস্তুলে-বসা পাখীর মত ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া পড়িয়া থাক। কাঁদ, অন্তরে ব্যাকুলতা বাড়াও। বাহিরে যেন সদ্য পুত্রশোকগ্রস্তা জননী!

শ্রীম বলেন, হিসাবের খাতায় লিখতে হবে, কোন সাধু বা ভক্ত এসেছিলেন তাঁর নাম ধাম। লেখা থাকবে কতক্ষণ ছিলেন, কি সব কথা হল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এতে মনের এলোমেলো ভাব নষ্ট হয়ে যায়। মন সদা ফাঁকি দিতে চায় — যেমন ছেলেমানুষ করে, তাকে বারবার ধরে এনে পড়ায় বসাতে হয়। এরূপ পূর্ণ বিবরণ লেখা থাকলে এটা ভবিষ্যতে ইতিহাসের কাজ করবে। চৈতন্যদেবের সময়ের যদি এরূপ একটা হিসাবের খাতা পাওয়া যায় তার value (দাম) কত বেশী হবে। এখন তো মনে করে লোক এর জন্য অত কেন!

শ্রীম — ভক্তদের thorough (সকল বিষয়ে সুদক্ষ) হতে হবে। অনলস ও সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। যে মন দিয়ে এডিসন গ্রামোফোন বের করেছেন সেই সংস্কৃত মনটি ঈশ্বরে দিলে ঐদিকে ধেই ধেই করে এগিয়ে যাবে। তাই তো ঠাকুর বলতেন ঐ কথা, যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে। মন তো একটা।

শ্রীম (হঠাৎ জনান্তিকে) — না, বাপু হক্ কথা বলতে হবে — জগবন্ধুবাবু কাজ জমিয়ে রাখেন। দেখ না, এখানে ময়লা জমা নর্দমায়।

জগবন্ধু — আমি জমাই না। রোজ লাঠি দিয়ে পরিষ্কার করি।

শ্রীম — আমি যে হাত দিয়ে পরিষ্কার করলুম।

জগবন্ধু — ওখানে হাত দিলেন কেন? থুথু কফ ফেলে সব।

শ্রীম — ব্রহ্ম তো সর্বত্রই — 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য ৩:১৪:১) এই ভেবে হাত দিলুম। সব চকচকে থাকবে। সর্বত্রই তাঁর পূজা কিনা।

(ভক্তদের প্রতি) অত পুরু (একহাত) দেয়াল। তার ভিতর দিয়ে নালী। ব্রহ্ম ভেবে হাত ঢুকিয়ে দিলুম। ডান হাতের তলায় কাদার একটা পাতলা লেপ এসে গেল (ভক্তদের ও অপরাধীর ঈষৎ হাস্য)। সব নির্মল থাকবে। তবে মনটি হবে নির্মল, যেমন আয়না। তাতে পড়বে ঈশ্বরের ছাপ। সব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিখুঁত হতে হবে।

সভা ভঙ্গ হইল। ভক্তগণ বিদায় লইলেন। অন্তেবাসী এই সদ্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞের উপদেশ ভাবিতে ভাবিতে শ্রীম-র আদেশে বেলেঘাটায় গেলেন

শুকলালবাবুর কাছে কোন কাজে।

সন্ধ্যা অতীত। এখন প্রায় সাতটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ কেহ বসিয়া আছেন বেঞ্চে, কেহ আসিতেছেন, কেহ যাইতেছেন। শুকলাল ও অন্তেবাসীর প্রবেশ। তারপর আসিলেন বিনয় ও ছোট নলিনী। তারপর বেলুড় মঠের স্বামী অমলানন্দ ও একজন ব্রহ্মচারী। আর একজন হেডমাস্টার, নাম নলিনী। বড় অমূল্য, ব্রুকবণ্ড যতীন ও মোটা সুধীর, বলাই, শান্তি ও ছোট রমেশ ও রমণী ক্রমে আসিয়াছেন। ছোট জিতেন গিয়াছেন রাণাঘাটের বাড়িতে। সর্বশেষ আসিলেন অমৃত, হাতে এক বাটি পায়েস। এইবার কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আজ আমাদের বেশ দিন গেল। সকালে সাধুসঙ্গ, এখনও সাধুসঙ্গ। যে দিন সাধুসঙ্গ হয় না, সেদিন বৃথা। সাধুর গেরুয়া গাধার পিঠে দেখে চৈতন্যদেব একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়েছে।

সাধু মানে কি? না, যে সর্বদা ঈশ্বরকে ডাকছে। সাধুর দর্শনই প্রশ্ন ও উত্তর, সব।

আমরা ক্রাইস্টের কথা পড়ি। আবার চার্চে গেলে আর এক রকম দেখি। তাঁর কত ভক্ত দেখা যায় সেখানে।

বুদ্ধদেবের কথা পড় সে একরকম। আবার কোন বিহারে যাও সে আর এক রকম। ঐ দিন আমরা ওখানে (কপালীটোলার বুদ্ধমন্দিরে) গেলাম সে আর এক রকম। কত ভিক্ষু। অমৃতবাবু গিছলেন, পাঁচশ' ভিক্ষু এক সঙ্গে যাচ্ছেন দেখলেন।

সাক্ষাৎ সাধুসঙ্গ এমনি দরকার।

শ্রীম (অমৃতের প্রতি) — দিন, দিন, সাধুদের পায়েস দিন। সাধুসঙ্গ সাধুসেবা ছাড়া আমাদের উপায় নাই। তাঁর কত কৃপা। বুড়ো হয়েছি, যেতে পারি না। তাই এখানেই সাধু পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

মিষ্টিমুখ করিয়া সাধুরা ও নলিনী মাস্টার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। বড় জিতেনের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীম স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাকিয়া লইলেন শান্তি ও ছোট রমেশকে। তাহাদিগকে অবশিষ্ট মিষ্টান্নাদি খাইতে দিলেন।

একটি ভক্ত (স্বগত) — এই ভালবাসা দিয়ে এদের টানছেন। একজনের বিয়ের কথা হচ্ছে। অপরটিও দুর্বল। যদি বা এই ভালবাসার টানে সাধুসঙ্গে মতি হয় আর বিয়ে না করে তাই এই চেষ্টা। সংসার জ্বলন্ত অনল, ঠাকুর বলতেন। পরম সুহৃদয়ের কাজ করছেন শ্রীম। সংসারে ঢুকলে আর রক্ষে নাই, একেবারে তলিয়ে যাবে। এই কথা বলেন শ্রীম।

শ্রীম আসিয়া আবার সিঁড়ির ঘরে বসিলেন। ডাক্তার বক্সীর প্রবেশ। আবার কথা।

শ্রীম (শান্তির প্রতি) — ভক্তদের সেবা করলে ভাল। ভক্তিলাভ হয়। তাতে সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়। কর না এঁদের সেবা। দাও না শুনিয়ে এঁদের চৈতন্যদেবের কথা। হাঁ, এটা পড়ে শুনিয়ে দাও চৈতন্যলীলামৃত থেকে।

পাঠক পড়িতেছে — রাজ-ঐশ্বর্যে পালিত রঘুর তীব্র বৈরাগ্য। কিশোর রঘুকে পিতামাতা এক পরমাসুন্দরী বালিকার সহিত বিবাহ দিলেন। যদি বা বধূর ভালবাসায় সংসারে মন ফিরিয়া আসে। কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইল। রাজকুমার রঘুর বয়স উনিশ। পত্নী ষোড়শী। অতুল ঐশ্বর্য ও ষোড়শী পত্নী ছাড়িয়া রঘু গৃহত্যাগ করিলেন, 'কারাগারাদ্বিনির্মুক্তঃ চৌরবৎ'। রঘু বার দিনে তিনশত মাইল অতিক্রম করিয়া ক্ষতবিক্ষত পদে প্রায় অনাহারে শ্রীচৈতন্যদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন নীলাচলে।

পাঠ চলিতেছে। মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিতেছেন। আর পাঠক ও ছোট রমেশের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন।

শ্রীম (শান্তি ও ছোট রমেশের প্রতি চাহিয়া) — বলতো কেন পালিয়ে গেলেন এই রাজ-ঐশ্বর্য ও পরমাসুন্দরী স্ত্রী, আবার পিতামাতাকে ছেড়ে।

উভয়ই নীরব। শান্তির বিবাহের কথা চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — প্রথমটা মনে হয়, সকলেই তো বিয়ে করে, এটা একটা সংস্কার। কিছু দিন পরেই বুঝতে পারে ঠাকুরের ঐ মহাবাক্য — সংসার জ্বলন্ত অনল। শোকতাপ দুঃখদারিদ্র্যের সঙ্গে যখন সংঘাত হয় তখন বোঝা যায় ঠাকুরের কথার অর্থ। ঠাকুর বলতেন, কাঁটার আঘাতে রক্তাক্ত মুখ, তবুও উট ঐ কাঁটাঘাস খাবে। প্রকৃতি যে পেছনে টানছে।

রামপ্রসাদের গান গাইতেন ঠাকুর। ওতে আছে, ঘুনির ভিতর মাছ ঢোকে, বেরোবার পথ রয়েছে তবুও বেরোবে না। আবার গুটিপোকা নিজের জালে নিজে বদ্ধ।

এ-ও আছে। এ না থাকলে সংসার রক্ষা হয় কিসে? আবার ও-ও আছে। রঘু এ সবের বশ নন।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠিক ঠিক যদি ঈশ্বরে অনুরাগ হয় তো সংসারে বিরাগ হবেই হবে। সংসার খসে যায় মন থেকে। সে অবস্থায় যদি সংসারে থাকেও ভক্ত, তাতে আবদ্ধ হয় না। সিংহবিক্রমে কাজ করে। ভক্তের দেহ মন আত্মা সব ঈশ্বরে সমর্পিত। কাজও তাঁর দেখে। ধ্যানও তাঁর, কাজও তাঁর, সংসারও তাঁর।

দেখ না, রঘুকে বিষয়ে বাঁধবার জন্য কত চেষ্টা। অত বিশাল জমিদারী রঘুকে দিল manage (দেখা শোনা) করতে। বয়সে প্রায় বালক, তবুও কি সুচারুরূপে manage (পরিচালনা) করছেন। ভিতরে তীব্র বৈরাগ্য, তবুও।

৩

পাঠ চলিতেছে। এক স্থানে ভাঁড়ের কথা আসিল।

শ্রীম (রহস্যের সহিত গদাধরের প্রতি) — বল তো ভাঁড় মানে কি?

গদাধর (মিশ্রিত ওড়িয়া-বাংলায়) — ভাঁড় মানে ভাণ্ড।

শ্রীম — না, হলো না। যারা খুব হাসায় লোককে, কৌতুক করে যারা। গোপাল ভাঁড়ের নাম শুনেছ? কৃষ্ণনগরের রাজার ভাঁড় ছিল সে। সর্বদা বিষয়কর্মে যারা থাকে তাদের দরকার এ সব লোকের। তুমি পার হাসাতে? কেউ বল না একটা গল্প গোপাল ভাঁড়ের।

একজন ভক্ত — একবার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, এই দারুণ শীতে যে সারারাত জলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে তাকে একটা বড় রকমের পুরস্কার দেব। একটি লোক ঐ কার্যে কৃতকার্য হলো। রাজা পাহারা রেখে দিলেন। সে পুরস্কার চাইলে রাজা বললেন, তুমি কি করে কাটালে রাতটা? সে বললে, রাজপ্রাসাদের একটা দীপের উপর মন স্থির করে

রাতটা কাটিয়ে দিলুম। রাজা বললে, তা হলে তুমি পুরস্কার পাবে না। ঐ দীপের উষ্ণতার সহায় নিয়েছ। তাই পুরস্কার দেওয়া হবে না।

গোপাল ভাঁড় রাজসভায় ছিল। সে সব শুনলো। পরদিন গোপাল ভাঁড় সভায় অনুপস্থিত। রাজা লোক পাঠালে সে বললো, চাল চাপিয়েছি ভাতটা হলে খেয়েই যাব একেবারে। সে আর যাচ্ছে না। রাজা বললে, এতক্ষণে যে কতবার ভাত রান্না হয়ে যায়। দূত এসে বললে — মহারাজ, একটা হাঁড়িতে জল আর চাল রেখে সেটাকে বেঁধে দিয়েছে একটা তাল গাছে। আর নিচে জ্বাল দিয়েছে জমির উপর গাছের গোড়ায়। রাজা ও সভাসদ সকলে হেসে বললে, ওটা পাগল হয়েছে। এতে কি করে চাল সিদ্ধ হবে? রাজা রেগে বললে, যাও ঐ পাগলকে ডেকে নিয়ে এসো এক্ষুনি। গোপাল এল। রাজা সস্নেহে তিরস্কার করে বললে তুমি নিতান্ত পাগল। এতেও কখন চাল সিদ্ধ হয়? অত উঁচুতে বাঁধা রইলো হাঁড়ি, আর গাছের নিচে আগুন। গরম কি করে লাগবে ওতে? গোপাল কৌতুকপূর্ণ অঙ্গভঙ্গিতে উত্তর করলো, কেন মহারাজ? যে ভাবে জলে দাঁড়ানো লোকটির গায়ে রাজপ্রাসাদের দীপের উত্তাপ লেগেছিল। তখন রাজা তাঁর নিজের বিচারে নিজেই বেকুব সিদ্ধ হলেন। আর জলে দাঁড়ানো লোকটি পুরস্কার পেল।

শ্রীম — ভাঁড়দের এইরূপ সুতীক্ষ্ণ বিচিত্র বুদ্ধি। (গদাধরের প্রতি) পার তুমি এরূপ বুদ্ধি দেখাতে?

পাঠ চলিতেছে। একস্থানে 'মুসলমান জমিদার', এই কথা আছে। শান্তি শব্দাংশ বিচ্ছেদ করিয়া পড়িতেছে।

শান্তি — মুসল-মান-জমি-দার ভাল লোক ছিলেন।

শ্রীম (দুষ্ট হাস্যে) — একজন পড়বে, 'রামের বিচিত্র লীলা।' সে পড়ছে রামের বিচি — (ভক্তদের হো হো করিয়া উচ্চহাস্য)।

পাঠ চলিতেছে। এক স্থানে আছে, 'গৃহদেবতার মঙ্গলারতির দেরী হইয়াছে।'

শান্তি (পড়িতেছে) — গৃহ দৈবতার—

শ্রীম — কি, কি পড়লে গৃহ —

শান্তি (বিভ্রান্ত হইয়া) — দৈবতা —

শ্রীম — দেখ দেখিন্ ভাল করে কি আছে?

শান্তি (সলজ্জে) — গৃহদেবতা —

শ্রীম (গম্ভীরভাবে ভক্তদের প্রতি) — সব কাজে মনোযোগ দরকার। যার এক বিষয়ে মনোযোগ আছে — concentration, সে ইচ্ছা করলে ঈশ্বরবিষয়েও ঐ মনোযোগ দিতে পারে।

শ্রীম (শান্তির প্রতি) — এই যে পড়লে রঘুনাথ দাসের কথা। দেখ, যেমনি মনোযোগ তেমনি তীব্র বৈরাগ্য। তখনকার বিশ লাখ টাকা আয়ের জমিদারী আর পরমাসুন্দরী স্ত্রী ঘরে। প্রথম যৌবনে এই সব ছেড়ে পালাতে চাইছেন। হৃদয় মন অধিকার করে আছেন ঈশ্বর। বংশে এই একটি ছেলে, পিতা ও জ্যেঠামশায়ের হৃদয়মণি। কিন্তু এঁরা বিপদগ্রস্ত অন্য একজন পরাক্রান্ত মুসলমান জমিদারের সঙ্গে বিবাদে। তাঁদের বিপদে ফেলে তিনি যাবেন না। তখন আবার মুসলমান বাংলার রাজা।

জমিদারী সংরক্ষণের ভার বালক রঘু নিজ হাতে নিলেন। অনলস হয়ে, অত tactfully (কৌশলের সহিত) আর প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে সিংহবিক্রমে রঘু জমিদারী পরিচালনা করছেন। যেমনি efficiency (দক্ষতা) তেমনি tact (কৌশল), আর তেমনি enthusiasm (অদম্য উৎসাহ)। আবার তেমনি iron-will (বজ্রকঠোর সঙ্কল্প) আর তেমনি অসাধারণ আত্মবিশ্বাস! প্রতিপক্ষ জমিদার বালকের এই অদ্ভুত প্রতিভা দেখে বিবাদ মিটিয়ে ফেললো।

গীতায় আছে নিষ্কাম সত্ত্বগুণী কর্মবীরের এসব লক্ষ্মণের কথা। (ডাক্তারের প্রতি) কি শ্লোকটা?

ডাক্তার — মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥

(গীতা ১৮:২৬)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অন্তরে তীব্র-বৈরাগ্য, গৃহে এক মিনিট মন টিঁকছে না। কিন্তু আসন্ন বিপদে পিতা ও জ্যেঠামশায়কেফেলে যাবেন না। একি আর মায়াতে করছেন? তা নয়, দয়ায়। সামনে যা এসে পড়লো তা করতেই হবে। এসব লক্ষ্য করতে হয় মহাপুরুষদের জীবন থেকে।

শ্রীম — রঘুর পরের জীবন দেখ। বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডের তীরে বসে

দিবানিশি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' জপ করছেন। গভীর বন। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু আসে যায়, রঘুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তপস্যায়, অনাহারে শরীর skeleton (কংকালসার)। শেষের দিকে নাকি চব্বিশ ঘন্টায় একবারমাত্র পাতার দোনায় করে একটু ঘোল খেতেন। অত কঠোরী সনাতনকেও হার মানিয়েছেন। মাঝে মাঝে উনি এসে এই কঠোরতা ত্যাগ করতে বলতেন। কে শোনে সে কথা? যে শুনবে সেই মন যে রাধাকৃষ্ণের পায়ে বাঁধা। এক মুহূর্তও বিরহ সহ্য হচ্ছে না। সর্বদা মহাযোগে আছেন। আহার বিহারের সময় কোথায়? কি তীব্র ব্যাকুলতা! তা হবে না কেন? চৈতন্যদেবের ভেতর যে এসব দেখে এসেছেন পুরীতে।

Parting message (বিদায়কালীন উপদেশ) চৈতন্যদেব দিয়েছিলেন, যখন বার বছর পুরীতে বাসের পর তিনি তাঁকে বৃন্দাবন উদ্ধারে রূপসনাতনের সহায়তায় পাঠান —

গ্রাম্য কথা না কহিবে,
গ্রাম্য কথা না শুনিবে;
আর ভাল না খাইবে,
আর ভাল না পরিবে;
আর ব্রজের রাধাকৃষ্ণ ভজিবে।

এই উপদেশের মূর্ত বিগ্রহ রঘুনাথের জীবন। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে আছে 'রঘুর নিয়ম যেন পাষাণের রেখা'।

ভারত সংস্কৃতির এঁরা সব মূল স্তম্ভ। কোথায় পাবে এসব কথা? অন্য দেশে দু'চারটে জীবন দেখা যায় এরূপ কিন্তু এখানে শত শত জীবন। তবেই তো এই দেশে, ভারতের হাওয়া বাতাসে, ঈশ্বরের কথা ঝংকৃত হচ্ছে সর্বত্র। ব্রহ্মমূল এদেশ!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরকে না দেখলে এসব কথা বুঝাই যেত না। চৈতন্যদেব শেষের বার বছর রাধাভাবে মহাভাবে ছিলেন। বাইরে জড়বৎ। কোনই হুঁশ নাই দিন রাতের।

চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গরা এই সব অতি উচ্চ অবস্থা দেখেছেন কিনা চোখের সামনে, তাই তাঁরাও সর্বদা ভিতরে ঢুকে থাকতে চান।

মোহন — মহাভাব কি নির্বিকল্প সমাধির মত?

শ্রীম — এসব বিচারবুদ্ধির অগম্য। যাঁর হয় কেবল তিনিই বুঝেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেলে শ্রীরাধা বাকী জীবন এই মহাভাবে ছিলেন। চৈতন্যদেব যুগ্ম অবতার। অন্তরে কৃষ্ণ, বাইরে রাধা। একাধারে এই দুই ভাবের সমন্বয়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আলাদা, রাধা আলাদা। নীলাচলে এই দুইজন একাধারে শ্রীচৈতন্য।

ঠাকুরের অহরহ এই দুই অবস্থাই হতো — মহাভাব ও নির্বিকল্প অবস্থা। এই দুই অবস্থাই বাক্য-মনাতীত — transcendental, জগতের ওপারের অবস্থা। দেশকাল রহিত অবস্থা। মহাভাবে, প্রেমে সব একাকার। সব কৃষ্ণ। একমাত্র কৃষ্ণ। জগত অন্তর্হিত। প্রেমময় কৃষ্ণ। কৃষ্ণই প্রেম। প্রেমই কৃষ্ণ। খালি, প্রেম প্রেম প্রেম। প্রেমের পুতুল প্রেমসাগরে বিলীন।

নির্বিকল্প সমাধিতে নুনের পুতুল লবণাম্বুতে ডুবে এক হয়ে যায়। সব সমুদ্র। এখানে জ্ঞান-সমুদ্র। চিদানন্দ সমুদ্রে সব বিলীন। বিশ্ব জগৎ নাই। নাম-রূপ নাই। দ্বৈত নাই। কি আছে তা বাক্যমনাতীত। যা আছে তাই আছে। চিৎ চিৎ চিৎ — খালি চিৎ। এক অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্র!

মহাভাব প্রেমে একাকার, নির্বিকল্প সমাধিজ্ঞানে একাকার। বলতে হলে অতটুকু মাত্র বলা চলে। এই দুই অবস্থাই মুখে বলা যায় না।

ঠাকুর বলেছিলেন, জীবকোটির ভাবসমাধি পর্যন্ত হয়। প্রথমে ঈশ্বরে ভালবাসা। এরই নাম ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। মানে, ঘনীভূত ভক্তিই ভাব। কৃষ্ণে ভালবাসা, কৃষ্ণে ভক্তি, কৃষ্ণে ঘনীভূত ভক্তি। খালি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। এটি ভাবসমাধি। নিচে নেমে এলে নাম-রূপ, জগৎ থাকে। কিন্তু সব কৃষ্ণময়। বৃক্ষ-লতা, জীব, নিজের দেহ, সব কৃষ্ণময়। রাসে গোপীগণ তাই দেখেছিলেন, নিজেরা কৃষ্ণময়। স্ত্রীজ্ঞান অন্তর্হিত।

মহাভাব এরও আগে। কেবল প্রেম। ভাব আরও ঘনীভূত। জমাটবাঁধা হয়ে যায়। ভাব ঘনীভূত হলে প্রেম। প্রেম ঘনীভূত হলে মহাভাব। রাধা ও কৃষ্ণ, এই দ্বৈত ভাব বিলুপ্ত। রাধা গ'লে কৃষ্ণ হলো। কৃষ্ণ গ'লে প্রেম। প্রেমের ঘনীভূত অবস্থা মহাভাব। প্রেমসমুদ্র। ঘনীভূত যেন সব বরফ, উত্তর মেরুতে — দক্ষিণ মেরুতে। প্রেমসমুদ্র আর জ্ঞানসমুদ্র দুই-ই এক। আনন্দের শেষ উভয়ই। ঠাকুর বলেছিলেন, জ্ঞানপথেই যাও আর প্রেমপথেই যাও, উভয়ের শেষ এক। বলতে গেলে মহাভাবের যেন জলের উপর

দাগের মত একটা রেখা থাকে। ওটা বাস্তব না থাকারই মত।

এই প্রেম, মহাভাবের খেলা চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গগণ তাঁর ভিতরে দেখেছেন। তাই তাঁরা ঐ-তে ডুবে থাকতে চাইতেন।

ঠাকুরের ভক্তগণ, অন্তরঙ্গগণও ঠাকুরের ভিতর দিবানিশি ঈশ্বরীয় ভাবের বিলাস দেখেছেন। তাঁরাও ওর ভিতর ডুবে থাকতে চান। তাঁরা যদি বাইরে কাজ করেন দেখা যায়, সে কেবল প্রত্যাদিষ্ট হয়ে কাজ করেন, অবতারলীলার প্রচার ও প্রকাশের জন্য। নিদ্রাবিষ্টের ন্যায় কাজ করেন। প্রেমানন্দ সমুদ্রে, জ্ঞানানন্দ সমুদ্রে ডুবে থাকতে চান।

যদি বল কেন এঁদের ডুবতে দেন না সর্বদার জন্য? তার উত্তর — লোকশিক্ষা হবে কি করে তা হলে। তাই দেখা যায় যেন তাঁরা কাজ নিয়ে আছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁদের মন ভিতর থেকে টানছে ডুবে যেতে। তাঁর বিদ্যামায়া টেনে রাখছে বাইরে লোকশিক্ষার জন্য। এই দোটানার ভিতর তাঁদের জীবন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ অবিদ্যামায়ার কর্তৃত্বের বাইরে। বিদ্যামায়া তাঁদের নিয়ে অবতার লীলা প্রকাশ করছেন।

সংসারের লোক এই contrast (তুলনা) দেখলে তবে যদি একটু চৈতন্যলাভ করতে পারে। তাই এই দুই বিরুদ্ধভাবের ক্রীড়াভূমি অবতার ও পার্ষদদের জীবন।

কেউ বিষয়ে জড়, এঁরা চৈতন্যে জড়। কেন এসব পাঠ? এঁদের জীবনচরিত অনুধ্যান করলে ঐ সব অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস লাভ হতে পারে। তাই এত সব পাঠ। দেখলে আরও লাভ। পড়ে তত হয় না। একদিন দেখলেও রক্ষে নাই। অবতারাদি ঈশ্বরে জড়, সংসারী জীব বিষয়ে জড়। রাত্রি নয়টা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২৭শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ১২ই পৌষ ১৩৩১ সাল।
শনিবার, শুক্লা প্রতিপদ ৩/৫, দ্বিতীয়া ৫৪ দণ্ড ২০ পল।

চতুর্থ অধ্যায়

মানুষ যেন একটি বাঁশি

১

মর্টন স্কুল। চারতলার শ্রীম-র কক্ষ। শীতকাল। সকাল প্রায় আটটা। শ্রীম বিছানায় বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। ভক্তরা কেহ বেঞ্চে, কেহ চেয়ারে বসিয়াছেন। কেহ দাঁড়াইয়া আছেন। রামপুরহাট হইতে রেক্টার মুকুন্দ আসিয়াছেন। বিনয়, ছোট নলিনী ও গদাধর, বুদ্ধিরাম, সুখেন্দু, ছোট রমেশ ও জগবন্ধু রহিয়াছেন। ছোট রমেশ দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পর আসিল সত্যবান।

মুকুন্দ শ্রীম-র অতি প্রীতিভাজন, ছাত্রাবস্থায় অতি অল্প বয়স হইতে। তিনি বহুকাল পূর্বে একটি ভজন শ্রীম-র মুখে শুনিয়াছিলেন। উহা তাঁহার মনোমত গান। আবার শুনিবার ইচ্ছা। ঐ বিষয় কথা হইতেছে।

মুকুন্দ (শ্রীম-র প্রতি) — অনেকদিন পূর্বে হাওড়া পুলের ওপর দাঁড়িয়ে দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে আপনি একটি গান গেয়েছিলেন, 'মহাসিংহাসনে বসি' — বহুকাল এটা আর শুনি নাই আপনার মুখে।

শ্রীম গাহিতেছেন প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে —

গান। মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত,
তোমার রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্তের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত॥
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যথা রবি শশী সেই সভা মাঝে বসি,
তোমারে শুনাতে গীতি এসেছি তাহারি লাগি।
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত॥

গান সমাপ্ত হইল। কিন্তু গানের ভাব শ্রীম-র মনকে ভিতরে টানিয়া রাখিয়াছে। চক্ষু দুইটি সমুজ্জ্বল ও ছলছল। কি যেন দেখিতেছেন বিস্ময়ানন্দে। কিছুকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি আশ্চর্য! সব ঠিকঠাক করে রেখেছেন আগে থেকে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কখন মনের কি অবস্থা হয়, কি ভাল লাগে, সে সব আগেই ভেবে রেখেছেন। এখন ভৈরবীর সময় তাই ঐ রাগিণী বেরোল।

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী, তাঁরই দেওয়া। আবার তিনিই প্রচার করেছেন শিবের মুখে।

ভোর সকালে ভৈর। তারপর আশাবরী। সন্ধ্যায় পুরবী, আর রাত্রে বাগেশ্রী, বেহাগ। গোপীরা বেহাগ গেয়ে ঘরে ফিরে যেতেন কৃষ্ণ দর্শনের পর।

Cosmic song (বিশ্বের গীতি) আছে একটা। দিবারাত্রি উহা চলছে। যোগীরা শুনতে পান গভীর রজনীতে।

ঠাকুর রাত একটা দুটোর সময়, এই সঙ্গীত শুনে পাগলের প্রায় পোস্তাতে দৌড়োদৌড়ি করতেন। একে অনাহত শব্দ-সঙ্গীত বলে শাস্ত্রে।

মানুষ শুনতে পায় না — ইন্দ্রিয় মন, সব বিষয়ে মগ্ন। বিষয় থেকে, রূপরসাদি থেকে, যখন সম্পূর্ণরূপে উঠে যায় মন, তখন ঐ ছন্দ শুনতে পাওয়া যায়। কি আশ্চর্য, ঐ ছন্দ শুনলে অন্য সব আলুনী হয়ে যায়।

এসব যোগীদের উপভোগ্য। এরও উপরের অবস্থা আছে। তখন সব বিলীন। এই দুইয়ের উপরের অবস্থা।

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর॥

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — মানুষ যেন একটি বাঁশি, একটি যন্ত্র। যাকে যেমন করে বাজাচ্ছেন, সেই সুর বের হচ্ছে তার ভিতর থেকে। বাঁশির ইচ্ছায় সুর বেরোয় কি? যে বাজায় তার ইচ্ছায় বেরোয়। এসব সুর, তাঁরই রাগিণী। মানুষের বাহাদুরী নাই এতে।

ঠাকুরের ভিতর দিয়ে বেরোচ্ছে ব্রহ্মরাগিণী, দিনরাত। কি অবস্থা! যেন ঢেঁকির পাট। এক দিক নীচু হলো তো অন্য দিক উপরে ওঠে গেল।

আহা কি অবস্থা! কত ভাব খেলছে দিবানিশি ঠাকুরের ভিতরে! একটা যায় তো অপর একটা আসছে — দিব্যলীলা।

কিন্তু মানুষের কি দুর্ভাগ্য, এসব ভাববারও সময় নেই।

ঠাকুর জীবন্ত এক একটা ভাব নিয়ে খেলতেন। যেন ঝালে ঝোলে অম্বলে খাওয়া। একঘেয়ে নয়।

বলতেন, আমার মেয়েলী স্বভাব। তাই অতসব ভাবের ঐশ্বর্য।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি) — ইনি (বুদ্ধিরাম) কাল তীর্থ করে এসেছেন। কামারপুকুর, জয়রামবাটী হয়ে এলেন। এঁর মুখে শুনতে হয় তীর্থের সব কথা। (বুদ্ধিরামের প্রতি) শুনিয়ে দাও, এঁদের কিছু সংবাদ।

বুদ্ধিরাম — সিংহবাহিনীতে একটি বৃদ্ধা আমায় বললেন — বাবা, তোমরা যাঁকে ধরে সাধু হয়েছো তাঁর সঙ্গে আমরা কত দৌড়োদৌড়ি করেছি, খেলেছি। তোমাদের কি ভক্তি তাঁর উপর! কিন্তু, আমাদের তো কিছু হল না। তোমাদের মায়ের সঙ্গে আমরা বাল্যকাল কাটিয়েছি।

শ্রীম (সত্যবানের প্রতি) — একজনের কাছে শুনে নিলেও কিছু হয়, অন্ততঃ আট আনা। শ্রবণ একটা ইন্দ্রিয় কিনা! যে কোন দরজা দিয়ে ঢুকলেই হলো। মনে যাবে ক্রমে।

আবার কারো কারো এমনি acute understanding (সূক্ষ্ম ধারণাশক্তি) যে তাতেই বুঝে নেয় সব। আবার কারো কারো blunt (স্থূলবুদ্ধি)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কথা শুনতে হয়, আবার প্রসাদ খেতে হয়। আবার যারা তীর্থ করে আসে তাদের খাওয়াতে হয়। তবে হয়।

যাদের মন খুব শুদ্ধ তাদের একটু শুনে, কি একটু প্রসাদ খেয়েই একেবারে উদ্দীপন হয়।

গয়া থেকে ফিরে চৈতন্যদেব একেবারে বদলে গেলেন। পূর্বের তর্ক, শাস্ত্র সব পড়ে রইলো। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করে পাগল।

চৈতন্যদেব গয়া থেকে ফিরে গেলে ভক্তদের বললেন — শ্রীবাসাদিকে, তোমরা সব শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে যেয়ো। সেখানে সব বলবো, আমার কি কি হয়েছিল।

ঠাকুর তখন কাশীপুরে অসুস্থ। আমরা তখন গিছলাম কামারপুকুর,

জয়রামবাটী। সরস্বতী পুজোর দিন যাই। গিয়ে দেখি পুজো হচ্ছে। ফিরে এলে খুঁটে খুঁটে সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, এটা দেখেছ, ওটা দেখেছ, বলে।

শ্রীম (ছোট রমেশের প্রতি — চোখের ইঙ্গিতে বুদ্ধিরামকে দেখাইয়া) — ইনি, a pilgrim from the holy land (একজন তীর্থযাত্রী, পুণ্যভূমি দর্শন করে এসেছেন)।

বুদ্ধিরাম (শ্রীম-র প্রতি) — তারকেশ্বর থেকে হেঁটে যাবার সময় নদীতে স্নান করেছিলাম। তখন জলে একটা টাকা পেয়েছিলাম। আমার কাছে ছিল ছয় আনা। ঐ দিয়ে রঘুবীরের সেবায় কিছু দিলাম। আর বাকী পয়সা দিয়ে গাড়ীভাড়া ও খাওয়ার খরচা হল।

শ্রীম (চিন্তিত হইয়া) — নিবেদন করে খেয়েছ তো? তা হলেই হলো। গীতায় আছে, সব তাঁকে দিয়ে খেতে হয়।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (গীতা ৯:২৭)

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — কেউ কেউ এমন আছে, হাতে ছোঁয় না। পড়ে আছে তো থাকুক।

সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে যমুনাতটে তপস্যা করছেন। তখন একটা লোক সংসার জ্বালায় জর্জরিত হয়ে যমুনায় ঝাঁপ দিচ্ছিল। মাগ, ছেলে রয়েছে। তাদের খাওয়াতে পরাতে পারছে না।

ইনি তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, এখানে মাটি খোঁড়। পা দিয়ে দেখালেন জায়গাটা। সে ব্যক্তি মাটি খুঁড়ে একটা মানিক পেলো — কি বলে যেন, স্পর্শমণি। ওটা নাকি সাতরাজার ধন। অমনি ঐটে নিয়ে একেবারে দৌড়। ভয়, যদি বা পাছে কেড়ে নেয়।

যেতে যেতে রাস্তায় গিয়ে চৈতন্য হলো। ভাবলে — আচ্ছা, যে লোকটা আমাকে এটা অনায়াসে দিয়ে দিলে, সে কি ধন পেয়েছে যে এটাকে গ্রাহ্য করে না, আবার পা দিয়ে দেখিয়ে দিলে। এই বলে অমনি দৌড়ে আবার ফিরে এলো সনাতন গোস্বামীর কাছে। বলল —

যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি তাহারই খানিক।
মাগি আমি নত শিরে, এত বলি নদীনীরে ফেলিল মানিক॥

গীতায় আছে —

'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' (গীতা ৬:২২)

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি, চক্ষু উপরে তুলিয়া) — এমনি ব্যাপার! পা দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ছুঁলেও যে মন মলিন হয়!

শ্রীম (দুষ্ট হাস্যে) — 'আমি direction (অনুমতি) পাবার পূর্বেই বাক্স থেকে দু টাকা বের করে ফেলি।' (সকলের বিস্ময়ে হাস্য)।

টাকা ছুঁলেও মন মলিন হয়। ঠাকুরের হাত বেঁকে যেতো। শ্রেয় চাইলে প্রেয় সব ছাড়তে হয়।

জগবন্ধু — যদি পেয়ে ভিক্ষুকদের দিয়ে দেয়?

শ্রীম — একটু ভোগও নেবে না নিজে — তা হলে হয়।

২

সন্ধ্যা ছয়টা। শ্রীম চারতলার স্বীয় কক্ষে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন বিছানায়, পশ্চিমাস্য। বাহিরে পাশের ঘরে ও সিঁড়ির ঘরে ভক্তগণ বসিয়া আছেন। কেহ কেহ ধ্যান করিতেছেন। আজ প্রধান ভক্ত 'হিলিংবাম' দুর্গাপদ মিত্র আসিয়াছেন। বলাই, রমণী ও 'ব্রুকবণ্ড', সুখেন্দু, শান্তি ও অমৃত, বিনয়, ছোট নলিনী ও ছোট রমেশ, গদাধর, বুদ্ধিরাম ও জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তগণ সমবেত হইয়াছেন।

ধ্যানান্তে শ্রীম ভজন গাহিতেছেন। কি মধুর স্বর! গানের সঙ্গে যেন প্রাণটি বিগলিত হইতেছে।

গান। যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি।
সে রূপ লুকালে কোথা করালবদনী॥ ইত্যাদি।

গান। ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী। ইত্যাদি।

গান। নাচে গৌরাঙ্গ আমার শ্রীবাসঅঙ্গনে। ইত্যাদি।

গান। গৌর হে আমি সাধন ভজনহীন,
পরশে পবিত্র কর আমি অতি দীন হীন।
চরণ পাব পাব পাব বলে হে,
আমার আশায় আশায় গেল দিন॥ ইত্যাদি।

শ্রীম বাহিরে আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য,

দরজার পাশে। ভক্তগণ বেঞ্চে বসা সম্মুখে ও শ্রীম-র বাম পাশে। যোগেনের প্রবেশ। মন অশান্ত।

যোগেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের খাজাঞ্চী। শ্রীম-র কথায়, তাঁহার কর্মটি হইয়াছে। কিন্তু মন্দিরের রিসিভার কিরণ দত্তের সঙ্গে বনিবনা হয় না। তাই কর্ম ছাড়িয়া দিতে চান। শ্রীম বুঝাইয়া শান্ত করেন। তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিবাদ করেন অপর কর্মচারীদের সঙ্গেও। শ্রীম মন্দিরের সেবাপূজা প্রভৃতির সম্বন্ধে যোগেনের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

যোগেন (উত্তেজিতভাবে) — কিরণবাবু ওদের (অন্য কর্মচারীদের) কথা শোনেন। আমার কথায় কান দেন না —

শ্রীম (কথা শেষ হইতে না দিয়া) — আপনার অত কথায় কাজ কি? জবাব দিতে নেই। আপনার উদ্দেশ্য হলো ওখানে থাকা। কেন থাকা? না মায়ের সেবার জন্য। ঠাকুর ঐ মায়ের সঙ্গে কথা কইতেন, খাওয়াতেন। আর মানুষ শরীরে ত্রিশ বৎসর বাস করেছেন ওখানে। এইজন্যই না থাকা!

নিজের উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে মানুষ মিলেমিশে থাকে। অন্য রকম ভাব হলে ঝগড়া করে, কথা কাটাকাটি করে। কি দরকার আমার অত দেখার, কে দুখানা লুচি বেশী খেল, কিংবা কে দুটি পান বেশী নিল।

কথায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়। ছি ছি, সামান্য বিষয় নিয়ে কথা বলা উচিত নয়। ওসব দিকে নজর দেয় যাদের মন বিষয়ে, ভোগে। ওরা তো করবেই ওসব, মাগছেলেকে খাওয়াতে পরাতে হয়। হয়তো মাইনে দশটাকা মাত্র। এসব যে ওরা করে তা কিরণবাবু জানেন। তাই তিনি overlook (উপেক্ষা) করেন। আপনি কেন ওরকম করেন না?

আর, আপনি কি ইচ্ছা করলেই কর্ম ছেড়ে দিতে পারেন? তা হলে আর রক্ষে ছিল না। অর্জুনকে বললেন (কৃষ্ণ), তোমার ঘাড়ে করবে কর্ম (যুদ্ধ)। বললেই হলো করবো না? 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি।'

তবে যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন, তিনিই কেবল এই প্রকৃতি বদলিয়ে দিতে পারেন। ঠাকুর ভক্তদের প্রকৃতি বদলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অসাধ্য কিছুই নয়। কিন্তু অপরের কর্ম নয়। এ কাজ ছেড়ে গেলে অন্য কাজ এসে ঘাড়ে চড়বে। তাই যদি হলো, তবে এখানে থাকা ভাল। কত বড়

তীর্থস্থান! ভগবান ত্রিশ বছর থেকেছেন। আবার নিজে এই মাকে সেবাপূজা করেছেন। কত বড় privilege (সুযোগ)।

মোহন — প্রকৃতির কর্ম নষ্ট করতে পারা যায়?

শ্রীম — দেখেছি, ঠাকুর ভক্তদের কারো কারো কর্ম একেবারে কমিয়ে দিয়েছেন। তা করতে পারেন, তিনি ঈশ্বর।

তাই ধ্যান জপ তপস্যা সৎসঙ্গ করতে হয়। আর কেঁদে কেঁদে বলতে হয় — প্রভো, কমিয়ে দাও সব কর্ম। বিদ্যামায়া আশ্রয় করে থাক, ঠাকুর বলতেন।

মোহন — বিদ্যামায়াও তো মায়া। যেখানে মায়া, সেখানে ঈশ্বর নাই।

শ্রীম — তা বটে! তবে ঠাকুর বলতেন, যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে দুই-ই ফেলে দেয়, তেমনি। অবিদ্যা কাঁটাকে বিদ্যা কাঁটা দিয়ে তোলা। বিদ্যামায়া মায়া হলেও, ঈশ্বরের কাছে যাবার সিঁড়ি — নিকটতম সিঁড়ি।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি) — অত ঘোরা ভাল নয়। এটা ছেড়ে ওটা ধরা ভাল নয়। একটাতে লেগে থাকা চাই।

(সহাস্যে) তবে কারো অভিশাপ থাকে ঘুরে বেড়ান। নারদকে দক্ষ অভিশাপ দিলেন — কি তুই আমার মনে কষ্ট দিলি, তুই খালি ঘুরে ঘুরে বেড়াবি (হাস্য)। দক্ষ-প্রজাপতির ছেলেদের নারদ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করে সন্ন্যাসী করেছিলেন, এই অপরাধ (হাস্য)। দক্ষ বড় ভাই কিনা।

যোগেন (বিনীতভাবে) — দক্ষিণেশ্বর মন্দির আমার খুব ভাল লাগে — মন বসে।

শ্রীম — তাই তো আমরা আপনাকে ওখানে থাকতে বলছি।

জোর করে কর্মসন্ন্যাস হয় না। (ডাক্তার বক্সীকে দেখাইয়া) আমাদের ডাক্তারবাবুর ইচ্ছা, একেবারে সন্ন্যাস হয়ে যায়। তা কি করে হয়? মনের ভেতর যে জমা বদরস রয়েছে! সেগুলো বের না হলে কি করে হবে?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কর্ম ভেতরে থাকতে সন্ন্যাস হয় না। হয়, কেটে রক্ত পুঁজ বের করে দাও — নইলে, ঔষধ দিয়ে একেবারে শুকিয়ে দাও। দুই-ই পথ।

কেটে বের করাই সাধারণ পথ। অর্থাৎ, নিষ্কামভাবে কর্ম করে চিত্ত শুদ্ধ করা। তখন সন্ন্যাস। অর্জুনকে এই পথ দেখিয়েছেন।

আর এক (পথ) আছে — শুকিয়ে দেন। সেটি একমাত্র ভগবানের ইচ্ছাসাপেক্ষ।

সাধন ভজন করলেও ও হয় না। দমন থাকে। কিন্তু নিঃশেষ হয় না। সে হতে পারে ভগবানের কৃপায়।

অবতার পারেন তা'। ঠাকুর ভক্তদের কারুকে কারুকে করেছেন এরূপ। একেবারে শুকিয়ে নিজড় করে দিয়েছেন।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি) — আপনি কিরণবাবুর সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করুন। দুইজনে পরামর্শ করে কাজ করলে কাজটি হবে নিখুঁত। দেখুন না গান্ধী মহারাজ স্বরাজিস্টদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছেন। কেউ কখনও ভাবতে পারে নাই, ইনি এদের সঙ্গে মিলবেন। উদ্দেশ্য ঠিক আছে বলে সম্ভব হয়েছে। উদ্দেশ্য — ভারত উদ্ধার। গান্ধী মহারাজের মতের সঙ্গে ওঁরা মিল হতে পারলেন না — (সি.আর.) দাশমশায়, মতিলাল নেহেরু। গান্ধী মহারাজই এসে যথাসম্ভব এঁদের মতে মত দিলেন। একযোগে কাজ হওয়ায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভীত হয়ে পড়েছে।

আপনার উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। উপায় দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর সেবা, ঠাকুর সেবা। উদ্দেশ্যের উপর প্রখর দৃষ্টি রেখে কিরণবাবুর সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে কাজ করুন।

যোগেন প্রণাম করিয়া পুনরায় দক্ষিণেশ্বর ফিরিয়া গেলেন।

৩

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মনে ভোগবাসনা থাকলে সেবা করা যায় না। সেবাকাজ বড় কঠিন। দীনহীন ভাবে না এলে ভগবান সেবা নেন না। উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় অনুরাগ থাকলে মানুষ সব সইতে পারে। কিন্তু মহামায়া তা' হতে দেন না। বিচিত্র তাঁর খেলা!

বুদ্ধিরাম — আমি পাওয়া টাকা খরচ করে খেয়েছি। পাপ হয়েছে তো? এখন কি করবো?

শ্রীম — তাঁকে নিবেদন করে খেয়েছ, এইটে ভাল। আর রঘুবীরের সেবায়ও দিয়েছ। বাকী তাঁর কাছে প্রার্থনা করা উচিত, আর এরূপ না হয়। নিজের দোষ দেখে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করেন।

একাদশী তিন রকম আছে — নির্জলা, ফলমূল খেয়ে, আর লুচি ছক্কা খেয়ে। সাধুও তিন রকম। প্রথম, অজগর বৃত্তি। যা সামনে এসে পড়ে তাই খাবে। দ্বিতীয়, গৃহস্থের দরজায় 'নারায়ণ হরি' বলে দাঁড়ায়। তৃতীয়, ভিক্ষা না দিলে জোর করে আদায় করে।

এ সব জেনে রাখা ভাল। ঠাকুরের মহাবাক্য কিনা সব!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — প্রথমেই একেবারে নিষ্কাম হয় না। প্রথম হয়তো মাইনে নিচ্ছে না, শুধু খাচ্ছে। এও ভাল। একটা তো ছেড়েছে। তার পরের stage হলো, মাইনেও নিচ্ছে না, আবার খাচ্ছেও না। নিজে ভিক্ষে করে খেয়ে সব করে দিচ্ছে। এটাই সর্বোত্তম।

এর পরও আছে। হয়তো কাজই করতে হলো না। সব আপনি এসে যাচ্ছে। 'যোগক্ষেম' ঈশ্বরই বহন করছেন। এটা সকলের উঁচু অবস্থা।

এ সব অবস্থা নিচে থেকে উপরে ওঠা। মানুষ মনে করে সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেইটে ideal stage (আদর্শ অবস্থা। তা নয়। ঠাকুর বলতেন, ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে বলেছিল, এগিয়ে যাও, চন্দনের বাগান পাবে। তারপর রূপো সোনা হীরে মানিক কত কিছুর খনি পাবে। তারো বাড়া — তারো বাড়া আছে।

ছাদে কি এক লাফে ওঠা যায়? ধীরে ধীরে ওঠা। এক সিঁড়ি দুই সিঁড়ি করে। তবে যিনি ছাদে উঠেছেন তিনি যদি ঝোলায় বসিয়ে টেনে তুলে নেন, তা হলে হতে পারে। একেবারেই উঠে যায়। সে ঈশ্বরেচ্ছা। তা না হলে ঐ — 'শনৈঃ শনৈঃ পন্থাঃ।

একজন ভক্ত — পারা যায় না অত!

শ্রীম — উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, এটা মনে থাকলে সব পারা যায়। উদ্দেশ্যে যে যত সুদৃঢ় হবে উপায়ে সে তত firm (অবিচলিত) হবে। Serious (দৃঢ়সঙ্কল্প) না হলেই যত বাধা এসে পড়ে। টিমে তেতালার কাজ নয়।

সাধুসঙ্গ করতে হয়, আর তপস্যা। তবে শক্তি বাড়ে।

মানুষ আর কি করবে? তাঁর শরণাগত হয়ে কাঁদুক। আর সাধুসঙ্গ,

সাধুসেবা করুক।

এই পথ ঠাকুর দেখিয়ে গেছেন, এই সময়ের জন্য। শরণাগতি, শরণাগতি — আর সাধুসঙ্গ।

শ্রীম তিনতলায় নামিয়া গেলেন আহার করিতে। ডাক্তার বক্সী চৈতন্য-লীলামৃত পাঠ করিতেছেন শ্রীম-র আদেশে। চৈতন্য-সন্ন্যাস অধ্যায় পাঠ হইতেছে। শ্রীম ফিরিয়া আসিলেন প্রায় নয়টায়। তখনও ঐ পাঠই চলিতেছে। নবদ্বীপ ছাড়িয়া গৌরাঙ্গ কাটোয়ায় আসিয়াছেন কেশব ভারতীর কুটীরে। এখানে সন্ন্যাস নিবেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কাটোয়ার description-টি (বর্ণনা) কি সুন্দর! এটি চৈতন্য-ভাগবতের বর্ণনা। চৈতন্য-ভাগবত লিখেছেন বৃন্দাবন দাস। ইনি শৈশবে চৈতন্যদেবকে দর্শন করেছিলেন। শ্রীবাস আচার্যের কন্যা নারায়ণীর পুত্র ইনি। তাঁর ভিতর শক্তি সঞ্চার করেছিলেন এরূপ কথা আছে। চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার সম্বন্ধে এঁর version-ই (বিবরণই) খুব correct (ঠিক) বলে মনে হয়।

কবি কর্ণপুরও লিখেছেন (চৈতন্যমঙ্গল) চৈতন্যদেবের জীবনী। মুরারি গুপ্তের কড়চা, আবার গোবিন্দ দাসের কড়চা, এ সবই ঠিক ঠিক লেখা — first-hand information. এঁরা সকলেই তাঁকে দর্শন করেছেন, তাঁর সঙ্গ ও সেবা করেছেন। এ সব বিবরণই প্রথম শ্রেণীর বিবরণ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন, চৈতন্যচরিতামৃত। ইনি রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছে চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে শুনে লিখেছেন। তাই এটা second class information (দ্বিতীয় শ্রেণীর বিবরণ)। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যদেবকে দর্শন করেন নাই। ইনি বৃন্দাবনে লিখেছেন। ভাগবতের বর্ণনা, আর ভাগবতই ঠিক বলে মনে হয়।

একজন ভক্ত — গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যচরিতামৃতকে অতি উচ্চে স্থান দেন প্রামাণ্য গ্রন্থের মধ্যে।

শ্রীম — তা হোক না। তবুও তো first class evidence (প্রথম শ্রেণীর সাক্ষ্য) নয়। Direct evidence আর indirect evidence (সাক্ষাৎ সংবাদ আর পরোক্ষ সংবাদ) আছে। সাক্ষাতের দাম বেশী, বিচারশীল লোকদের কাছে। ভাবের দিক অন্য কথা।

বাইবেলের চারটি 'গস্‌পেলের' মধ্যে ম্যাথু আর জনের গস্‌পেলকে direct evidence (সাক্ষাৎ সংবাদ) বলে। এঁরা উভয়ই এপোস্‌ল্‌, মানে ক্রাইস্টের অন্তরঙ্গ, সাক্ষাৎ শিষ্য। মার্ক আর লুকের বিবরণ সেকেণ্ড ক্লাস সংবাদ। ভক্তদের কাছে উভয় প্রকার সংবাদই আদরণীয়। শেষের দুটি অপরের মুখে শুনে লেখা।

ভক্ত — চৈতন্যদেব ছিলেন প্রথমে গৃহস্থ, পরে হলেন সন্ন্যাসী। আর নিত্যানন্দ বার বছর বয়স থেকে সন্ন্যাসী। বিশ বছর ধরে সন্ন্যাসী। ইনি হলেন বিয়ে করে গৃহস্থ। এরূপ কেন হলো?

শ্রীম — কেন এরূপ হলো, এর জবাব দিতে পারেন ভগবান। আর চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ। এক মতে আছে, চৈতন্যদেব বলেছিলেন, আমি ঘরে থাকলে কেউ মানবে না আমার কথা। তাই সন্ন্যাস নিলেন। সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু। তাঁকে সকলেই মানে। না মানলে, কেউ কথা শোনে না। শুনতেও পারে, কিন্তু কাজ করবে না, পালন করবে না নিজ জীবনে।

আবার ভক্তদের শিক্ষাও দরকার, অন্তরঙ্গদের। তাঁরা অনেকে গৃহস্থ। তাঁদের শিক্ষার জন্য একটি আদর্শ চাই। সেটি হলেন নিত্যানন্দ। চৈতন্যদেব বা নিত্যানন্দ দুই-ই ঈশ্বরকোটি, অবতার। তাঁদের মুক্তির প্রয়োজন নাই। তাঁরা এসেছেন অপরকে মুক্তির পথ দেখাতে। তাই দেবকার্য সাধনের জন্য নিত্যানন্দ সন্ন্যাস ছেড়ে গৃহস্থ হলেন। এই এক মত, অন্য মতও থাকতে পারে।

ঠাকুরও তাঁর অন্তরঙ্গদের মধ্যে কারো কারোকে একেবারে কুমার সন্ন্যাসী করলেন। আবার কারোকে গৃহস্থাশ্রম থেকে টেনে বের করে সন্ন্যাসী বানালেন। আবার কারোকে লোকশিক্ষার জন্যে ঘরে রাখলেন। অন্তরে সকলেই পূর্ণ সন্ন্যাসী, বাইরে কেবল কেহ গৃহী। গৃহীই তো সংসারে অধিক লোক। তাদের শিক্ষার জন্য আচার্যের দরকার। তাই তাঁদের ঘরে রাখলেন। এদের দু'খানা তরোয়াল ঘুরাতে হয়, কর্মের ও জ্ঞানের। আর যাদের ঘরের বার করে নিলেন তারা কেবল জ্ঞানের তরোয়াল ঘুরায়, ঠাকুর বলতেন। এ সবই লোকশিক্ষার জন্য। ঠাকুর বলতেন, স্থির থাকলেও জল, হেললে-দুললেও জল। কত বড় ত্যাগী — নিত্যানন্দ! ঠাকুরের ভক্তরাও কেহ (শ্রীম) সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর বললেন — মা আমায় বলেছেন, তোমায় ঘরে থাকতে হবে

লোকশিক্ষার জন্য।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অবতারলীলা বোঝা যায় না মানুষের বুদ্ধিতে। একসেরে ঘটিতে দশসের দুধ ধরে না, ঠাকুর বলতেন। এ কথা বলে তোমার বিচার খতম করে দিয়েছেন। এ কি finite-এর (সাংসারিক বিষয়ের) বিচার? তোমার এইটুকু বুদ্ধিতে কি করে মাপবে Infinite-কে (অনন্তকে), ঈশ্বরকে? একমাত্র পথ গুরুবাক্যে বিশ্বাস, ঠাকুর বলেছিলেন।

ঠাকুর বলেছিলেন, আমি আর চৈতন্যদেব এক। চৈতন্যলীলা বুঝতে হলে চৈতন্যদেবের কথা নিতে হবে। আর ইদানীং ঠাকুরের কথা। তাই তাঁদের কথা নাও। তাঁরা বলেছেন — বিশ্বাস কর, গুরু বাক্যে বিশ্বাস। আর কেঁদে কেঁদে বল, বুঝিয়ে দাও তোমরা কে, দেখিয়ে দাও তোমাদের স্বরূপ।

মোহন — আর একটা পথও তো রয়েছে — ঋষিদের পথ, জ্ঞানপথ। ওদিক দিয়ে গেলে অবতারকে না চিনলেও কাজ হয়।

শ্রীম — সে পথেও হয় বটে। ঋষিরা রামকে বলেছিলেন, আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপাসক। তোমাকে উপাসনা করে ভরদ্বাজাদি। পথ তো চিরন্তনী রয়েছে। কিন্তু অধিকারী কোথায়? বিশেষ এখন, এই কলিকালে। আয়ু কম, অন্নগত প্রাণ, মন চঞ্চল। ঠাকুর তাই বলেছিলেন, ভক্তিপথ এখন যুগধর্ম। এটা সোজা পথ। উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন। তা যদি সোজা পথে হয়ে যায়, কে যায় ঘুরতে? এ পথে কেঁদে কেঁদে বলা, শরণাগত হয়ে থাকা। ঠাকুর বলেছেন, আমায় ধর। বাকী সব আমি করে দিব। দেখেছি, তিনি ঈশ্বরদর্শন করিয়ে দিয়েছেন। বলেছিলেন, অবতারকে দর্শন করলেই ঈশ্বরদর্শন হল। আবার বলেছিলেন, আমি অবতার। আমার ধ্যান করলেই হবে। আমি কে, আর তোমরা কে, এ জানলেই হবে। অর্থাৎ আমি ঈশ্বর আর তোমরা আমার সন্তান। ব্যস্। এ জানলেই কাজ ফতে হয়ে গেল।

রাত্রি দশটা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৩০শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ। ১৫ই পৌষ, ১৩৩১ সাল।
মঙ্গলবার, শুক্লা পঞ্চমী ৪৩ দণ্ড। ৩ পল।

পঞ্চম অধ্যায়

গঙ্গাসাগর-যাত্রী সাধু

১

মর্টন স্কুল। সকাল আটটা। শ্রীম চারতলার নিজের কক্ষে বসিয়া আছেন বিছানায় পশ্চিমাস্য। শ্রীম-র বাঁ হাতে বেঞ্চে বসা জগবন্ধু, বিনয়, গদাধর ও মনোরঞ্জন।

কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের মহন্ত স্বামী নির্ভরানন্দ কথামৃত চাহিয়াছেন। শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, চিঠিতে লিখে দিন — কাল ডাকে বই পাঠাচ্ছি। কালের ডাকে চিঠি ও বই দুই-ই যাবে।

সন্ধ্যা ছয়টা। শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে আসিয়া বসিলেন চেয়ারে, দক্ষিণাস্য। তাঁহার বাঁ পাশে বসা বেঞ্চে নলিনী ও তাহার সঙ্গী, জগবন্ধু, গদাধর, বিনয় ও অক্ষয় ডাক্তার। এ-কথা সে-কথার পর ক্রাইস্টের কথা উঠিল। এ সময়টায় তাঁহার জন্মোৎসব।

আজ ২৮শে ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। ১৩ই পৌষ, ১৩৩১ সাল। রবিবার, শুক্লা তৃতীয়া। ৫২।৩৯ পল।

শ্রীম আজকাল ভগবান ক্রাইস্টের কথা অনুধ্যান করিতেছেন। খ্রীস্টভক্তগণ কি করিয়া আনন্দোৎসব করিতেছেন, তিনি তাহা সর্বদা ভাবিতেছেন। আর ভক্তগণের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন। বলিতেছেন, ট্রাম লাইনের কাছে চার্চ হলে একবার দর্শন করে আসা যায়। অক্ষয় ডাক্তার বলিলেন, ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর একটা চার্চ আছে। গড়ের মাঠে বেড়াতে গেলে হয়। তখন দেখে আসা যেতে পারে।

শ্রীম সম্মতি দিয়া তখনই বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে লইলেন অন্তেবাসী ও অক্ষয়কে। প্রথমে ঠনঠনিয়ার মা কালীকে দর্শন করিলেন। এ স্থান শ্রীম-র অতি প্রিয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম প্রথম এখানে আসিয়া বসিতেন। আর মা কালীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া গান শুনাইতেন।

শ্রীমও তাই সর্বদা এখানে আসেন।

মা কালীকে প্রণাম করিয়া এস্‌প্ল্যানেডের ট্রামে উঠিলেন। সঙ্গে উঠিলেন অন্তেবাসী ও অক্ষয়। ধর্মতলা ও চৌরঙ্গীর মোড়ের কাছে সকলে ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িলেন। দক্ষিণ ফুটে একটি গির্জা আছে। শ্রীম ভক্তসঙ্গে উহাতে প্রবেশ করিলেন। এখন 'ম্যাস' বা সম্মিলিত প্রার্থনা চলিতেছে। ভক্তগণ সকলে হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীমও ভক্তসঙ্গে অনুরূপ মুদ্রায় প্রার্থনায় যোগদান করিলেন —

Our Father which art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy Kingdom come. Thy will be done
in earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts,
as we forgive our debtors.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil :
For thine is the Kingdom,
and power, and the glory, for ever.
Amen!*

শ্রীম পদব্রজে চলিয়াছেন গড়ের মাঠে দক্ষিণ ফুটপাথ দিয়া। সম্মুখে দ্বিতলে ব্রিস্টল হোটেল, বিচিত্র আলোকমালায় সজ্জিত। শ্রীম-র দৃষ্টি উহাতে পড়িলে বালকের ন্যায় আনন্দে বলিয়া উঠিলেন — বা, বা, কি চমৎকার আলো! শ্রীম উভয় ফুটের বিপণিশ্রেণী, সুন্দর অঙ্গরাগ, রকমারী দীপাবলী এবং গমনব্যস্ত পথচারীগণকে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন

হে স্বর্গবাসী পিতঃ, আপনার নাম জয়যুক্ত হোক। আপনার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক। এই ধরাধামে স্বর্গধামের ন্যায় আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমাদের দৈনন্দিন ভোজন আজ আমাদিগকে প্রদান করুন। আর আপনি আমাদিগকে ঋণমুক্ত করুন ঠিক যেমন আমরা আমাদের ঋণগ্রহিতাকে ঋণমুক্ত করিয়া থাকি। আর আপনি আমাদিগকে বিষয়ভোগে নিপাতিত করিবেন না। কিন্তু সর্বদা পাপের হাত হইতে রক্ষা করুন। আপনার ধর্মরাজ্য সর্বদা বিরাজ করুক। আর আপনার দিব্য শক্তি ও দিব্য মহিমা সদা প্রসারিত হউক। ওঁ শান্তি।

পশ্চিম দিকে, ঠিক যেন আনন্দময় একজন শিশু!

ক্রসিং-এর সামনে একজন হকার উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, 'Sunday Statesman'. সে শ্রীম-র নিকট আসিয়া বলিল — নিন, একখানা কাগজ। শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, এক আনায় হয়তো নাও। কিন্তু আজকের কাগজের দাম দুই আনা। তাই লওয়া হইল না।

মোড় অতি সন্তর্পণে পার হইয়া শ্রীম ট্রামের বিশ্রামাগারে উপনীত হইলেন। তিনি নিকেলের চশমা ডান হাতে এক একবার চোখের উপর ধরিতেছেন আর নামাইতেছেন। কৌতুক-আনন্দে সব দর্শন করিতেছেন। আনন্দময় পুরুষ শ্রীম আজ। অন্তেবাসীকে বলিলেন, কই শ্যামবাজারের ট্রাম? বলামাত্রই ঐ ট্রাম আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। শ্রীম ও অন্তেবাসী উহাতে উঠিয়া পড়িলেন। অক্ষয়ও উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন এই বলিয়া, আমাদের যাবার পয়সা এঁর (অন্তেবাসীর) কাছে আছে। তোমরা চীৎপুরের ট্রামে উঠে পড়। শ্রীম ট্রামে বসা। অন্তেবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা তো কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে যাবে? ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিয়া অন্তেবাসী উত্তর করিলেন — আজ্ঞে হাঁ, ঐ পথেই যাবে! ট্রামে প্রমথর সঙ্গে দেখা।

ঠনঠনিয়ায় নামিয়া পড়িলেন। পুনরায় মা কালীকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। একজন লেকচার দিতেছে। বিষয় — 'শক্তি ও সংসার'।

শ্রীম মর্টন স্কুলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, দ্বিতলের বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া আছেন। বহু ভক্ত অপেক্ষা করিতেছেন — ডাক্তার, নলিনী, বিনয় ও ভূঁইঞা, মোটা সুধীর, বলাই, ছোট রমেশ ও রমণী, 'ব্রুকবণ্ড' যতীন, গদাধর, মনোরঞ্জন ও শান্তি। জগবন্ধু শ্রীম-র সঙ্গে আসিয়াছেন। এখন প্রায় রাত্রি আটটা।

শ্রীম অতিশয় ক্লান্ত। বলিতেছেন, কালীতলায় একজন বক্তৃতা দিচ্ছেন। বলছেন, যিনি কালী তিনিই কৃষ্ণ। বেশ কথা। কিন্তু বৈষ্ণবরা ঝগড়া করে।

মোটা সুধীর বলিলেন, আদি সমাজে আচার্য আজ ক্রাইস্টের কথা বললেন। বললেন, সাধুসঙ্গ দরকার। শ্রীম উত্তর করলেন, বা, এ বেশ কথা — সাধুসঙ্গ।

নিম্নে অক্ষয় ডাক্তারের বাড়িতে কীর্তন হইতেছে। শ্রীম ভক্তদের আদেশ করিলেন — যান্ যান্, শুনে আসুন সব। অনেকেই গেলেন,

সভাও ভঙ্গ হইল। এখন সাড়ে আটটা।

২

চীৎপুর রোড। আদি ব্রাহ্ম সমাজ। ডিসেম্বরের শেষ দিন। অপরাহ্ন চারিটা। অনেকদিন পর শ্রীম আজ আদি ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে ভক্তগণ।

এখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শুভাগমন করিয়াছিলেন। তখন কেশব সেন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহকারী আচার্য ছিলেন। বয়স সাতাশ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'দেখছি, এর ফাত্না ডুবেছে।' অর্থাৎ বড়শিতে মাছ ঠোকরাইলে জলের উপরে ভাসমান শোলা এক একবার ডুবিয়া যায়। সেইরূপ ধ্যান ঠিক ঠিক হইলে মন এক একবার ভগবানে ডুবিয়া যায়।

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের মাধ্যমে বাংলায় ভারতের নবযুগের উদ্বোধন করেন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। বাংলার শিক্ষিত যুবকগণ অনেকে এই আন্দোলনে যোগদান করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমও অন্যতম। তিনি প্রথমে প্রায়ই এখানে উপাসনায় যোগদান করিতেন। পরে কেশব সেন স্বতন্ত্র নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনা করিলে শ্রীম শ্রীকেশবের অনুরক্ত হন। স্কুলে পড়িবার সময় হইতে উনি কেশব সেনের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

শ্রীম-র আর একটি আকর্ষণ ছিল এই আদি সমাজের প্রতি। সেটি হইল, প্রাচীন বৈদিক সুরে বেদপাঠ। শ্রীম সম্ভবতঃ এই বেদপাঠ এখানেই শিখিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর বেদপাঠ শুনিয়া ভক্তগণ মুগ্ধ হইতেন। এখানকার আর একটি আকর্ষণ, উপনিষদ-ভাঙ্গা সঙ্গীত। উপনিষদের উচ্চ ব্রহ্মভাব ও ভাষা লইয়া এইসব সঙ্গীত রচিত হইত। পাখোয়াজ আর তানপুরা সংযোগে প্রাচীন পবিত্র সুরে যখন এই সকল গীত হইত, শ্রীম-র মন তখন আনন্দে আপ্লুত হইত। শ্রীম বলেন, এই সব দেখে অল্প বয়সে বৈদিক যুগের শান্তি-সুখ আনন্দ কল্পনার সাহায্যে উপভোগ করতুম।

আদি সমাজের এই সুখস্মৃতি শ্রীম সারাজীবন জাগ্রত রাখিয়াছিলেন। বার্ধক্যে শরীর অচল হইলেও তিনি ভক্তদের পাঠাইয়া দিতেন। ভক্তগণের

মুখে কোন্ গান হইল, পাখোয়াজ বাজিয়াছিল কি না, এসব সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। প্রতি বুধবারের উপাসনায় শ্রীম-র আদেশে শেষ দিন অবধি একজন ভক্ত গিয়া যোগদান করিতেন। শ্রীম ভক্তের মুখে সংবাদ শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেন।

বৈদিক ভারত শ্রীম-র অতীব প্রিয়। ঋষি, বেদ, উপনিষদ, তপোবন, তপস্যা, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী — এই সব শব্দ সর্বদা শ্রীম-র মনকে সবলে হরণ করিয়া লইয়া যায় ভারতের সুদূর অতীতে — বৈদিক যুগে, যখন ভারতের অন্তরাত্মা পরমব্রহ্মে লীন থাকিত, যখন ভারত দর্শন করিত সেই পরমব্রহ্মকে প্রতি জীবে, যখন সত্য সংযম সদাচার সহৃদয়তা সর্বভূতে সহানুভূতি ছিল ভারতের সামাজিক সম্পদ।

শ্রীম সমাজ মন্দিরের দ্বিতলে উঠিতেছেন, সঙ্গে ডাক্তার, অমৃত ও জগবন্ধু। সিঁড়ির পাশেই অফিস। শ্রীম সমাজসেবায় দুইটি টাকা দিলেন। এবার উপাসনায় যোগদান করিলেন।

আচার্য বেদীতে আসীন। প্রার্থনা করিতেছেন — 'অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আবিরাবির্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।'

উপনিষৎ-ভাঙ্গা গান হইতেছে, অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্ — বিনে অনুরাগ, ক'রে যজ্ঞযাগ, তোমারে কি যায় জানা। ইত্যাদি।

আচার্য একটি ক্ষুদ্র সারমন্ দিয়া উপাসনা সমাপ্ত করিলেন। সারমনের সার — নিরাকার সগুণ ব্রহ্ম হইতে এই জীবজগৎ আসিয়াছে। এই জীবজগতের অন্তরে তিনি বিরাজমান। জীবের ভিতর ব্রহ্ম দর্শন করা উচিত। এটি সহজ সাধনা। 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।'

৩

শ্রীম মোটরে আসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে ডাক্তার, অমৃত ও অন্তেবাসী। মোটর আসিয়া দাঁড়াইল রতন সরকারের স্কোয়ারের নিকট।

এখানে পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরযাত্রী সাধুগণের জমায়েৎ। প্রতি বৎসরই ভারতের নানা স্থান হইতে নানা সম্প্রদায়ের সাধুগণ একত্রিত হন। মারোয়াড়ী ভক্তগণ সাধুগণের সেবা করেন। এ বৎসরও সাধুগণ

আসিয়াছেন। অমৃত একদিন তাঁহাদের দর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মুখে শুনিয়া অবধি শ্রীম দর্শনের জন্য ব্যাকুল।

স্কোয়ারের ভিতর সাধুগণ আসন পাতিয়াছেন। এটি প্রধান জমায়েৎ। স্থান কম হওয়ায় স্কোয়ারের বাহিরে চারিদিকে আসন দেখা যাইতেছে। আশেপাশের অন্যান্য রাস্তায়ও সাধুগণ বসিয়া আছেন। কোথাও নগ্ন অবধূতগণ, কোথাও পরমহংস, কোথাও নির্বাণগণ, কোথাও বৈষ্ণবগণ। নানা পন্থী সাধুগণ নিজ নিজ ভাবে আসীন।

ভক্তগণ অনেকে পূর্বেই এখানে আসিয়াছেন। দক্ষিণ দিক হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইল, বাগান ডান হাতে। অগ্রে শ্রীম পশ্চাতে ভক্তগণ — ডাক্তার বক্সী, অমৃত ও সুখেন্দু, বলাই ও 'ব্রুকবণ্ড' যতীন, ছোট নলিনী ও সঙ্গী, গদাধর, বুদ্ধিরাম ও জগবন্ধু প্রভৃতি। সুখেন্দুর বাসাও এই স্কোয়ারে।

শ্রীম একজন নগ্ন মহাত্মার ধুনির কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। সাধু একেবারে নগ্ন। মাথায় খুব লম্বা জটা। গায়ে বিভূতির গাঢ় প্রলেপ। অর্ধ নিমীলিত নেত্রে সাধু যোগাসনে উপবিষ্ট। দর্শকগণ সেবার্থ অর্থাদি উপহার প্রদান করিয়াছে — সম্মুখে অর্থাদির স্তূপ। সাধুটির মুখের প্রশান্ত ভাব দেখিয়া মনে হয়, তিনি অর্থপ্রার্থী নহেন। ভক্তগণ শ্রদ্ধায় ভেট চড়াইতেছে তাই ঐ সব পড়িয়া আছে। হয়তো অপর কেহ ঐ অর্থদ্বারা ভোজন সামগ্রী খরিদ করিয়া সকল মহাত্মাদিগকে বিতরণ করিবে। পশ্চিমের ফুটপাথের উপর একটি বালক সাধু বাংলায় ভজন গাহিতেছে গোপীযন্ত্র সহায়ে — 'পথের মাঝে খেলা করছে' ইত্যাদি।

স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি প্রৌঢ় পরমহংস হিন্দীতে সমাগত দর্শক ভক্তদের উপদেশ দিতেছেন।

পরমহংস (ভক্তদের প্রতি) — ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মাত্ব কোই কুছ্ নেহি হ্যায়। আগর আপনা মন শান্ত না হোয়। মনকী প্রশান্তি হি সব সুখকা কারণ হ্যায়। গীতামে ইসি বাতকা হি শ্রীকৃষ্ণ ভগবানজীনে প্রচার কিয়া — 'অশান্তস্য কুতঃ সুখম্'। (গীতা ২:৬৬)

যদি যথার্থ শান্তি চাহ, যথার্থ সুখ চাহ, তো মনকো পহিলে শান্ত করো। মন শান্ত হোতা হ্যায় ভগবৎ চিন্তনসে। ভগবানকা কোই ভী ভাব

লেকর উপাসনা করো, চরণকমলমে মনকো লগন করো। কৌশিশ করো। ধীরে ধীরে মন শান্ত হো জায়েগা। মন সব অন্দরমে ঘুস গিয়া, তো আপনা কাম ফতে হো গিয়া। কোই বাসনা ভাবভী মনমে উদয় হোগী তব হি ভগবানকে চরণকমলমে উসি বাসনাকো বিসর্জন কর দো। ইস্ উপায়সে ধীরে ধীরে মন বশমে আ জায়েগা। তব হি কমলপত্রকে জলকে মাফিক্ অনাসক্ত হোকর সংসারমে রহ্ স্যাকতা হ্যায়।

জনৈক জিজ্ঞাসু — মহারাজ, গুরুকৃপা বেকর তো কুছ্ ভী নহি হো স্যাকতা হ্যায়। তো গুরু লাভ ক্যায়সে হোতা হ্যায়?

পরমহংস — গুরু তো বহ্ হি হ্যায়। বোলো, প্রার্থনা করো, মিল জায়েগা। তুমারি বাসনা হার্দিক হো তো জরুর মিলা দেংগে।

বহ্ হি গুরু হ্যায়, বহ্ হি চেলা হ্যায়। আরে ভেইয়া, খাস্ আদমি না হো তো পরীক্ষামে উত্তীর্ণ নেহি হো সেকতা হ্যায়।

এক গুরুকে পাশ দো চেলে গয়ে। পরীক্ষাকে লিয়ে দুনোকো একান্ত স্থানমে আসন লাগানেকে লিয়ে কহা গুরুজীনে। বস্, একতো থোড়ে হি দিনমে পাগল হো গিয়া। ঔর দুসরে চেলেকো দিন দিন আনন্দ প্রাপ্ত হোনে লাগা। যহ চেলে, ভগবান হি সর্ব জীবমে হ্যায়, সর্বত্র হ্যায়, যহ অনুভব করনে লাগা।

সমগ্র বাগান শ্রীম ভক্তসঙ্গে প্রদক্ষিণ করিয়া, দক্ষিণ ফটক দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আর সকল সাধুদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দর্শন ও যুক্তকরে প্রণাম করিতেছেন। শ্রীম-র আদেশে ভক্তগণ সব স্থানেই কিছু প্রণামী দিতেছেন। দর্শন শেষ হইলে, শ্রীম পুনরায় দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাগানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এবার শ্রীম কানাই সেনের গলি (মাথাঘসা গলি) দিয়া বাগানের পশ্চিম দিকবর্তী জয়গোপাল সেনের সুবৃহৎ গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম অন্তর্মুখ। বলিতেছেন, জয়গোপাল সেন কেশববাবুর ভক্ত ছিলেন। তাঁরই বেলঘরিয়ার বাগানবাড়িতে ঠাকুর কেশবকে দেখতে গিয়েছিলেন হৃদয় মুখার্জীর সঙ্গে। কেশব সেন সদলবলে তখন ঐ বাগানে তপস্যায় নিরত ছিলেন। একবার এই বাড়িতেও ঠাকুর এসেছিলেন জয়গোপাল সেনের অনুরোধে। তাই এসব স্থান পবিত্র তীর্থসদৃশ। মন্দির স্থাপন করে ভগবানের

মূর্তিকে পূজা করলে ঐসব স্থান পবিত্র হয়। আর এখানে মনে কর, ভগবান সশরীরে এসেছিলেন। কত বড় পবিত্র মহাতীর্থ এসব স্থান।

গৃহের অঙ্গনে সেন-পরিবারের গৃহদেবতার মন্দির। শ্রীম দেবতার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। গৃহ দর্শন করিয়া পুনরায় ফটক দিয়া বাগানের পশ্চিম দিকের রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাধুদের আসন এই রাস্তায়ও লাগিয়াছে। এবার উত্তর দিকে চলিলেন। সেখানেও রাস্তার পাশে সাধুদের আসন। একজন সাধু বলিলেন — লাও ভকতজী, পরসাদ লাও। শ্রীম মস্তক নত করিলে সাধু তাঁহার ললাটে সম্মুখস্থিত ধুনি হইতে ভস্ম লইয়া তিলক কাটিয়া দিলেন। ভক্তগণের ললাটেও অনুরূপ তিলক অঙ্কিত হইল। আর একজন বৈষ্ণব সাধু সকলকে তুলসী প্রসাদ দিলেন। সর্বত্রই ভক্তরা প্রণামী দিলেন। শ্রীম বাগানের উত্তর-পূর্ব কোণে গিয়া মোটরে উঠিলেন। সঙ্গী হইলেন ডাক্তার, অমৃত ও জগবন্ধু।

৪

রাত্রি আটটা। মর্টন স্কুলের দ্বিতলের বারান্দা। শ্রীম চেয়ারে উপবিষ্ট দক্ষিণাস্য। বহু ভক্ত বেঞ্চে বসা। তিনি আজ খুব পরিশ্রান্ত। গঙ্গাসাগরযাত্রী-সাধুসঙ্ঘ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাহার আগে দর্শন করিয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজ। পরিশ্রান্ত বটে, তবুও সাধুর গুণকীর্তনে মুখর। ধীরে ধীরে শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কয়দিন থেকেই ইচ্ছা হচ্ছিল, সাধু দর্শন করি। আজ হয়ে গেল এঁর (ডাক্তার বক্সীর) কৃপায়। এঁর মোটর না হলে হয়তো যাওয়াই হতো না। শরীরটা বুড়ো হয়ে গেছে, এই প্রতিবন্ধক। মন চাইছে, সর্বদা এমন সব স্থানে থাকি সাধুসঙ্গে।

যদি বল, ঐ সব সাধুই কি খাঁটি? তার উত্তর, আমার অত বিচারের কাজ কি? তাঁদের দেখে উদ্দীপন তো হচ্ছে, ঈশ্বরের কথা স্মরণ হচ্ছে। আর মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সব পড়ে থাকবে — এসব কথা তো স্মরণ হচ্ছে। তা হলেই হলো। ওঁরা খাঁটি কি মেকী সে বিচার ভগবান করবেন। তোমার কাজ তুমি সেরে নাও।

সাধু দেখলে কি মনে হয়? ভক্ত যাঁরা তাঁরা ভাবেন, সর্বস্ব ছেড়ে তাঁকে

ডাকছেন এঁরা। আমি তা পারছি না। এটা মনে হলেই হয়ে গেল কাজ।

এই difference-টা (প্রভেদটা) বুঝতে পারলেই অন্তর থেকে ক্রন্দন ও প্রার্থনা হবে — প্রভো, সব প্রতিবন্ধক দূর করে দাও। আমার সাধ্য নয়, এই সংসারের বেড়াজাল থেকে বের হই।

তিনি শুনতে পান হৃদয়ের ডাক। তাঁর কৃপা হলে সংসারে থেকেও অনাসক্ত। তাই তো বললেন আজ নাগা মহাত্মা, 'পদ্মপত্রস্থিত জলের মত থাক সংসারে'।

সাধুদের কাছে গেলে, তাঁদের সেবা করলে এই অমূল্য সম্পদ লাভ হয়। কিন্তু তাঁর মহামায়া সকলকে দেয় না বুঝতে। যাদের কতক চৈতন্য হয়েছে তাদের উঠে পড়ে লাগতে হয়। কখন শরীর চলে যায়। তাই উঠে পড়ে লাগা।

একজন ভক্ত — কেহ কেহ বলে, সাধুবেশী পাষণ্ডরা সমাজের প্রভূত অকল্যাণ করছে।

শ্রীম — তাতে সাধুদের দোষ কোথায়? তাদের বেশ নিয়ে লোক ঠকালে তাতে সাধুদের দোষ কোথায়? এরা যে সাধুদের বেশ নেয় এতেই বোঝা যায় সাধুগণ শ্রেষ্ঠ। সমাজের লোক এই সাধুদেরই সাধু বলে, শ্রদ্ধা করে, খেতে পরতে দেয়। ভণ্ড ঠিক করা — এতো রাজার কাজ, সমাজের কাজ। সাধুরা তার কি করবেন? তাঁদের কাজ ঈশ্বরচিন্তা করা, আর লোককে ঈশ্বরের কথা বলা। তা তো করছেন এঁরা।

একদিন ঠাকুরের কাছে একজন সাধুনিন্দা করেছিল। তিনি বললেন, তা নয়। সব সাধুকে সম্মান করা উচিত। সাধুও সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণী হয়। তমোগুণী হলেও নারায়ণ। বলেছিলেন, আমারও পূর্বে ধারণা ছিল তমোগুণী সাধু ভাল নয়। এক বৃদ্ধ এখানে ছিলেন। তিনি সে ধারণা ভেঙ্গে দিলেন। বললেন, তমোমুখ নারায়ণ।

ভক্ত — পয়সা উপায়ের জন্য সাধু আসন করে বসে থাকে। জ্বালাতন করে।

শ্রীম — পয়সা না দিলে ওঁরা খাবেন কি? সুরেশবাবু এলাহাবাদ কুম্ভ থেকে এসে ঠাকুরকে এই কথা বলেছিলেন — সাধুরা কেউ কেউ পয়সা চায়। ঠাকুর শুনে ঐ কথা বলেছিলেন, পয়সা না দিলে ওরা খায় কি?

পয়সা দিতে হলেই সাধু খারাপ!

শ্রীম (ভক্তের প্রতি) — চিরকাল এ সাধুর ধারা চলে আসছে। কখনও একটু নীচু হয়ে যায় আদর্শ। আবার ভগবান অবতার হয়ে এসে উঁচুতে উঠিয়ে দেন। তিনি এসে নূতন সাধু তৈরী করেন। ঠাকুর এসে সম্প্রতি নূতন কত ভাল ভাল সাধু তৈরী করেছেন। মেকী থেকেই ভাল হয়। সাধুর ধারা, প্রবাহ বন্ধ করতে নেই।

আমরা বলি কি, এই সব সাধু না থাকলে, আমাদের উদ্দীপন হবে কি করে? কাকে দেখে মনে হবে — ঈশ্বরই উপাস্য? ধন জন যৌবন, সব তাঁর জন্য উৎসর্গ করতে হবে। আগে ঈশ্বর, পরে সংসার। সাধুরা একথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁদের দেখলে মনে হয়, এঁরা সর্বস্ব ছেড়ে তাঁকে ধরতে চেষ্টা করছেন।

দোষে গুণে মানুষ। সংসারে যারা আছে তারা কি সব জানে? তারা যে criticise (সমালোচনা) করে, লজ্জা হয় না? তারা তাদের সব কর্তব্য পালন করছে? তবে কেন সাধুদের দোষ দেখা? তাঁদের দোষ থাকে তো ঈশ্বর দেখবেন, যাঁর জন্য এঁরা বের হয়ে এসেছেন! নানা stage (অবস্থা) আছে। সকলে কিছু সিদ্ধপুরুষ হয় না একদিনে — 'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।' (গীতা ৬:৪৫)

এ সব ডেঁপোমি করতে হবে না। ঠাকুর যে নিজে সাধুদের পুজো করে গেলেন। আলাদা ভাণ্ডার করিয়েছিলেন মথুরবাবুকে দিয়ে। সাধুরা যা চাইতো তাই ঐ ভাণ্ডার থেকে দেওয়াতেন। ঠাকুরের আচরণ আমাদের গ্রহণীয়। আবার ভক্তদের দ্বারা জোর করে এই সব সাধুরই সেবা করাতেন।

এখন ঠাকুর নিজে অবতার হয়ে এসেছেন আর ভাল সাধু তৈরী করেছেন। কালক্রমে এও নীচু হয়ে যাবে। আবার এসে নূতন সাধু তৈরী করবেন। ধারা চলতে থাকবে। ধর্মের বাহ্য আচরণগুলি এসব সাধুরাই ধরে রাখেন। অবতার এসে ব্যাকুলতার সংযোগ করে দেন। পূজাপাঠ, জপধ্যান, তপস্যা, ত্যাগ, জটা, ছাই মাখা, এসব থাকে। তিনি অবতার হয়ে এসে এদের ভিতরই শক্তি সঞ্চার করেছেন। ভারতের এই সনাতন পদ্ধতি। ধর্মের আশ্রয় সাধুগণ। ধর্ম রাখতে হলে সাধু রাখতে হবে। তাই ঠাকুর জোর করে বলেছেন, নিত্য সাধুসঙ্গ দরকার।

মর্টন স্কুল, কলকাতা। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ।
১৬ই পৌষ ১৩৩১ সাল। বুধবার, শুক্লা ষষ্ঠী ৪১ দণ্ড। ৩ পল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লোক পাগল সংসারে, অবতার পাগল ঈশ্বরে

১

শ্রীম আজ সারাদিন মর্টন স্কুলের আফিসে কাটাইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট— তিনি ছুটিতে, তাই। দুইটি নূতন ছাত্র স্কুলে ভর্তির জন্য আসিয়াছে। একটি যুবক শিক্ষক শ্রীম-র আদেশে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন। সাড়ে চারিটার সময় শ্রীম দ্বিতলের আফিস হইতে চারতলার ছাদে আসিয়াছেন। সাধু ও ভক্তগণ শ্রীম-র অপেক্ষায় এখানে বসিয়া আছেন।

কাশী অদ্বৈতাশ্রমের স্বামী হরানন্দ আসিয়াছেন। মায়ের মন্ত্রশিষ্য অশ্বিনী চক্রবর্তীও আসিয়াছেন। গদাধর ও বুদ্ধিরাম বসা। জগবন্ধু পাশেই তাঁহার ঘরে বসিয়া পড়িতেছেন।

শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়া আছেন। কাশীর সাধু ও ভক্ত সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সংক্ষেপে ৺কাশী-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শ্রীম এইবার সাধু ও গৃহস্থদের কর্তব্য ঠাকুরের দৃষ্টিতে কিরূপ, সেই সব কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, সাধুসঙ্গ ছাড়া উপায় নাই। তাই সর্বদা সাধুসঙ্গ করা উচিত। বলতেন, যেদিন সাধুসঙ্গ হয় নাই, হরিকথা হয়নি, সেই দিনই বৃথা। এই দেখুন না, ইনি কাশী থেকে এসেছেন সাধুসঙ্গ করতে মঠে। তা আসবেন না? এঁরা কিনা ঠাকুরকে আশ্রয় করে রয়েছেন। তাই তাঁর উপদেশ মান্য করছেন। ঠাকুর বলতেন, সাধুরও সাধুসঙ্গ দরকার। তা বলবেন না? মহামায়া তো কাউকে ছাড়েন না। মনে প্রাণে তাঁর শরণাগত হতে পারলে তবে রক্ষে। নইলে নিষ্কৃতি নাই। সাধুদেরও ফেলে দেন! চণ্ডীতে আছে, ঋষি বলছেন সুরথ ও

সমাধিকে —

জ্ঞানীনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥ (চন্ডী ১:৫৫)

এমনি কাণ্ড! তাঁর সঙ্গে চালাকী চলে না! মহামায়ার হাতে সব। এইজন্য লোকশিক্ষার জন্য ঠাকুর সর্বদা প্রার্থনা করতেন — মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না। জ্ঞানীদেরও ফেলে দেন।

সাধু ঠিক থাকলে ভক্ত ঠিক থাকবে। জগদগুরু কিনা সাধু। লোক সব তাঁদের অনুকরণ করে। তাই বড় কঠিন ব্যাপার সাধু হওয়া। নিজের মুক্তি, আবার অপরের মুক্তি — এই দুই কাজ সাধুর। সেইজন্যই তো ঠাকুর এসেছেন। সাধু তৈয়ার করার জন্য তাঁর আগমন। এই সাধুদের দিয়ে সমাজের ও জগতের কল্যাণ করাবেন। আবার সাধুদের নিজেদের মুক্তি দিবেন।

শ্রীম (স্বামী হরানন্দের প্রতি) — সাধুসঙ্গ করলে ধাত ঠিক থাকে। নইলে অন্য রকম হয়ে যায়। যারা প্রথমেই গৃহস্থের সঙ্গে খুব মেশে তাদের খুব বিপদ। উপরে উঠতে পারে না। প্রথম প্রথম গৃহস্থসঙ্গে বাস একেবারে বর্জন করতে হয়। গৃহ মানে, ভোগের আড্ডা কিনা! আবার স্ত্রীলোক রয়েছে। পুরুষদের সঙ্গে আলাপ হলেই ওদের সঙ্গেও হবে। তাইতে মন নেমে যায়।

তাই অত বড় আদর্শ ধরেছেন সামনে। ঠাকুর বলতেন, সাধু স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। স্ত্রীলোক জীবন্ত দেখা তো দূরের কথা!

এসব কি আর কারো উপর আক্ষেপ করেছেন, না কারো নিন্দা করেছেন? না, তা নয়। কি করা, রোগ সারাবার জন্য এ ব্যবস্থা। স্বভাবতঃই পুরুষ স্ত্রীকে চায়, আর স্ত্রী চায় পুরুষকে। এই ভাবটি উলটিয়ে স্ত্রীর ভিতর যে ভগবান রয়েছেন তাঁর উপর দৃষ্টি নিতে হবে। তাই এসব ছেড়ে সেই ভগবানকে চিন্তা করতে হয় বহু বৎসর ধরে সাধুসঙ্গে থেকে। অনেকটা যখন পাকা হয়ে গেল, কামিনী-কাঞ্চন কি তা বোঝা গেল, তখন নেহাৎ না হয় বাইরে সকলের সঙ্গে মেশা যায়। প্রথম তফাতে থাকতে হয়। তেমনি স্ত্রীলোক সাধকদেরও পুরুষ থেকে বহু দূরে থাকতে হয়।

তাই মহাপুরুষগণ অত কঠিন নিয়ম করেছেন সাধুর জন্য। চৈতন্যদেব বলতেন, শুধু স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ নয়, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও ত্যাগ করতে হয়। ভোগী কি না, তাই।

ভোগীর সঙ্গ করলে ভোগের বাসনা জাগ্রত হয়ে উঠে। ভোগবাসনা অতি সূক্ষ্মভাবে সুপ্ত থাকে মনে। এই জন্মে না হয় পরজন্মে জেগে উঠবে।

যারা আশ্রম করে, আশ্রমের নাম করে টাকা তোলার জন্য বেশী মিশে গৃহস্থের সঙ্গে, তাদের অনেকের পতন হয়। 'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংস সঙ্গস্তেষু উপজায়তে' (গীতা ২:৬২)। আশ্রম করে কেন? না, তাতে নিজেরও সুবিধা হবে তাই। শেষে না হয় গৃহস্থ, না হয় সাধু।

তারপর আশ্রমের নাম করে টাকা তুলে সেসব নিজেদের ভোগবিলাসে খরচ করে। আর আরামে স্বচ্ছন্দে থাকে। এই করে করে পড়ে যায়।

এই ভোগের পথ। দরজা একেবারে খোলা। ঠিক তার উল্টো পথে যেতে হবে — একেবারে উল্টো পথ। শত হস্তীর বল থাকে তো এগিয়ে চলো।

অন্তেবাসী এতক্ষণ তাঁহার ঘরে বসিয়া কথা শুনিতেছিলেন। এখন শ্রীম-র সম্মুখে বেঞ্চে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীম (সহাস্যে অন্তেবাসীর প্রতি) — ঋষিকেশে একটি সাধু একটি আসন করেছে। গরম দিন ছিল। তাই ঠাণ্ডা স্থান দেখে আসনটি পেতেছে — গাছের তলায় গঙ্গার পাশে। এখন তার পেচ্ছাব পেয়েছে। পেচ্ছাপ করতে যেই বাইরে গেছে অমনি আর একটি সাধু এসে ওখানে বসে পড়েছে। ওর আসন পেতে নিলে। পেচ্ছাপ সেরে ঐ ব্যক্তি এসে ওকে যেতে বললে। কে আর যায়। তুমুল ঝগড়া। মারামারি হয় আর কি! চোখ রাঙ্গিয়ে বলছে — কেঁও তুমনে মেরা আসন্ উঠাকর রাখ্খা? শেষ অবধি পুলিশের জমাদারের কাছে গিয়ে নালিশ। ভাল ভক্ত লোককে ওদিকে রাখে পুলিশের কাজে। সে তখন হাত জোড় করে বুঝায় সাধুদের। বলে, আপ্লোগ শান্ত হো। আপ্লোগোকে লিয়ে ঝগড়্না আচ্ছা নেহি। শান্ত হো মহারাজ!

ওদিকে সব ভাল পুলিশ দেয়। যাতে সাধুদের ওপর অত্যাচার না

করে, মারধর না করে। তারপর অনেক কষ্টে উভয় পক্ষকে শান্ত করে।

এমন বালাই! আশ্রম করলে এই হয়। একজনের interest-এ (অধিকারে) ঘা পড়লেই ঝগড়া। আর কি হয়? না, যে কামিনীকাঞ্চন ছেড়ে আসা গেছে, তাই নিয়ে আবার থাকতে হয়। টাকার দরকার, তাই ধনী লোকের কাছে যেতে হয় চাঁদার জন্য। বকুনি খেয়েও যেতে হবে। আর মেয়েমানুষদের কাছেও যেতে হয়, যাদের টাকা থাকে। যা ছেড়ে গেল আবার তাই নিয়ে রইলো। এমনি অদ্ভুত কাণ্ড মহামায়ার। তাই সর্বদা 'ত্রাহি ত্রাহি।'

শ্রীম কিছুক্ষণ কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাই বিলেতের একজন বিশপ — বিশপ অব নরফক, 'টাইমস্ অব লণ্ডনে' একটা চিঠি লিখেছিলেন মিশনারী সাধুদের লক্ষ্য করে। বলেছিলেন, এরা যা করছে এ সব Apostolic Christianity (ক্রাইস্টের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের আচরিত খ্রীস্টধর্ম) নয়। নিজেদের সুবিধার জন্য এরা সব করছে।

বিলেতে চাঁদা ক'রে বড় বড় গির্জা করে কিনা! চাঁদা হয়তো পাঁচ লাখ, কি দশ লাখ, কি বিশ লাখ হয়ে গেল। তাতে, ভাল বাড়ি, ঘরদোর, গাড়ীঘোড়া, দাসদাসী সব হল। আবার জমা টাকার সুদে খুব আরামে জীবনযাত্রা চলতে লাগলো।

এই সব দেখে তাই ঐ সাহেব বলেছিলেন ঐ কথা। আরও বলেছিলেন — আমি জানি, আমি যা বললাম তাতে অনেকে অসন্তুষ্ট হবে। কিন্তু হক্ কথা না বলে থাকতে পারছি না। তাই বললাম।

বিশপ বলেছিলেন আরো — 'the son of man hath not where to lay his head' — ক্রাইস্টের মাথা রাখবার স্থান ছিল না। তা হলে এরা যা করছে — বড় বড় গির্জা আর আরামের বন্দোবস্ত — এসবকে তা হলে কি করে 'Apostolic Christianity" — অন্তরঙ্গদের আচরিত খ্রীস্টধর্ম বলা যায়।

ক্রাইস্টের example-এ (দৃষ্টান্ত দেখে) তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ vow of mendicancy (মাধুকরী ব্রত) নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন কি সব ভোগের বাহার চলছে!

তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তরা তাঁর দৃষ্টান্ত নিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁরই মত গাছতলায় থাকতেন। আর ভিক্ষা করে খেতেন।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি) — ভিক্ষে করে কেউ খেতে চায় না। এই যে আমরা তোমাকে ভিক্ষা করতে বলি, তুমি কি তা করতে চাও? (ভিক্ষে করতে) যাও, যেমন গলায় সাপ বেঁধে দেওয়ার মত। ভিক্ষে করে খেতে হয় সাধুদের। বুদ্ধদেব রাজধানী কপিলাবস্তুতে গিয়ে ভিক্ষে করে খেতেন। শংকরাচার্য ভিক্ষে করে খেতেন। চৈতন্যদেবও ভিক্ষা করে খেতেন।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি) — নচিকেতার গল্প জান? দেখ নচিকেতা কেমন — কিছুই নিলে না। 'ইমে রামাঃ?' (কঠো ১:১:২৪) না, চাই না। রাজ্য স্ত্রী পুত্র? না, তাও চাই না। নচিকেতা কিছুই নিলে না। কেন নেবে? যে তিন দিন ধরে উপোস্ রয়েছে সে কি আর এসব চায়? সে ভগবানের জন্য ব্যাকুল। অন্য কিছু চাই না, শুধু চাই আত্মজ্ঞান, তার এই এক কথা।

সদানন্দের প্রবেশ। সে গদাধরের বড় ভাই।

শ্রীম (সদানন্দের প্রতি) — বসো বসো, শোন। (গদাধরের প্রতি চাহিয়া), বড়দাদা-মশায়কে বল। একা খেতে নেই। বল, নচিকেতার গল্প।

গদাধর — সবটা জানি না। বাপের নামও জানি না।

শ্রীম — নাই বা জানলে বাপের নাম। বল, বাপ এক রাজা ছিলেন।

গদাধর (সদানন্দের প্রতি) — এক রাজার এক ছেলে ছিল, নাম নচিকেতা। বাপ সব দান করছিল। নচিকেতা বললে, আমাকে কা'কে দিলে?

শ্রীম — না, না। যত সব মরা মরা গরুগুলি দান করছিল। শাস্ত্রে আছে কিনা গরু দান করতে হয়। তাই গরু দিচ্ছিল। দিতে হয় ভাল গরু। কিন্তু রাজা দিচ্ছিল, পিঁজরাপোলের যত সব গরু। বার বছরের ছেলেমানুষ হলেও নচিকেতা জানতো, এই দানের ফল হবে নরকে বাস। তাই পিতাকে রক্ষা করবার জন্য বললো — বাবা, আমাকে কা'কে দান করলে? পুত্র সব চাইতে বড় ধন কিনা। তাই নচিকেতা ভাবলে, মরা মরা গরু দানে যে পাপ হবে সেই পাপ কেটে যাবে পুত্রদানের ফলে।

(সহাস্যে) এই গরুদান কেমন? যেমন ঠাকুর-পূজোর সন্দেশ —

চিনির ঢেলা। মাথায় মারলে হয় রক্তপাত।

শ্রীম (সদানন্দের প্রতি) — ছেলেটি বড় ভাল ছিল, উচ্চ সংস্কারবান। নইলে বার বছরের বালকের এই আস্তিক্য-বুদ্ধি হয়? 'বাবা, আমাকে কা'কে দান করলে?' — বারবার এই কথা বলায়, বাপ রেগে বললে, যমকে।

নচিকেতা সোজা চলে গেল যমের বাড়ি। যম তখন 'টুরে' (tour) ছিলেন। বাড়ির লোক খেতে বললেও খেলে না। উপোসী পড়ে রইলো। খাবে কি করে? নচিকেতা যে এখন যমের অতিথি — যমের অনুমতি ছাড়া সে খায় কি করে? দেখ, কেমন ভাল ছেলে ছিল নচিকেতা। তারপর তিনদিন পর যম বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ির লোকের মুখে সব শুনে যম বললেন, গৃহস্থবাড়িতে ব্রহ্মচারী তিনদিন না খেয়ে পড়ে আছে, এতে পাপ হয়েছে গৃহকর্তার। প্রায়শ্চিত্ত দরকার। ভেবে ঠিক করলেন যম, তিনদিনের পাপের জন্য তিনটা বর দিলে পাপ মুক্ত হবো। তখন তাকে তিনটা বর দেন। প্রথম বরে নচিকেতা চাইলো, পিতার চিত্তের প্রশান্তি। ছেলেকে হারিয়ে পিতা নিশ্চয় অশান্ত হয়েছিল। দেখ কেমন ছেলে! দ্বিতীয় বরে চাইলো সহজে যাতে লোক স্বর্গে যেতে পারে তার উপায়স্বরূপ একটি যজ্ঞ। যম 'তথাস্তু' বলে দুই বরই দিলেন। তৃতীয় বরে চাইলো, আত্মজ্ঞান। বললে, কেউ বলে মরণের পর আত্মা জীবিত থাকে। কেউ বলে, না। আমাকে এই বিষয়ের জ্ঞান দান করুন। যম বললেন, তুমি ছেলেমানুষ, একি কথা! সংসার ভোগ কর। বৃহৎ সাম্রাজ্য নাও, সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, সুবর্ণ, হস্তী, অশ্ব, এসব নাও। নানাভাবে ভোলাতে চাইলেন। কিন্তু নচিকেতা বললে — মহারাজ, এ সব নিয়ে কি হবে? আপনি যে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি না থাকলে অবশ্য নিতাম। অর্থাৎ নাশবান বস্তু এই সমস্ত সংসার। আর বিনাশের কর্তা যম। তাই কিছুই নিলে না। শেষে উপযুক্ত পাত্র জেনে খুশি হয়ে যম তাকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিলেন।

নচিকেতা বুঝলো, অজর আত্মা অমর অভয়। তাঁকে বলে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান। গড, আল্লা, কত নাম তাঁর। (সাধুকে দেখাইয়া) এই সাধু তাই কেবল ঈশ্বরকেই চান। তাই সব ছেড়েছুড়ে মঠে এসেছেন।

সংসার ভোগ চাইলে ঈশ্বরকে ছাড়তে হয়। ঈশ্বর চাইলে সংসারভোগ

ছাড়তে হয় — যেমন নচিকেতা।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পুনরায় কথাবার্তা হইতেছে।

স্বামী হরানন্দ — মাস্টার মশায়, আপনাকে এখনও স্কুলের কাজ করতে হয় কি?

শ্রীম (সহাস্যে) — 'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং' (গীতা ৩:৮)। হাঁ, মাঝে মাঝে দেখতে হয়। যাঁরা আত্মস্থ হয়ে থাকেন তাঁদের এ দরকার হয় না।

'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥' (গীতা ৩:১৭)

তা না হলে যতদিন শরীর ততদিন কাজ। কাজ ছাড়বার উপায় আছে? 'ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।' (গীতা ১৮:১১)

দেখ না, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমার কিছুই দরকার নেই। তবুও দিনরাত কাজ করছি — 'বর্ত এব চ কর্মনি'। (গীতা ৩:২২)

লোকশিক্ষার জন্য করতে হয় কর্ম মহাপুরুষদের। অপরে নইলে করবে না। 'অতন্দ্রিতঃ' (গীতা ৩:২৩) হয়ে কাজ করছেন শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ, বিশ্রাম নিদ্রাদি ত্যাগ করে। কত বড় দায়িত্ব ও গুরুত্ব!

সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম বলিতেছেন, এখন সব ছেড়ে ঈশ্বরচিন্তা করা দরকার, ঠাকুর বলতেন। আপনারা ধ্যান করুন।

শ্রীম নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অর্গলবদ্ধ হইয়া ধ্যান করিতেছেন। অপর সকলে কেহ ছাদে, কেহ সিঁড়ির ঘরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। প্রায় একঘন্টা ধ্যানের পর শ্রীম গান গাহিতেছেন। কি করুণ ও প্রেমময় কণ্ঠস্বর! সবই ঠাকুরের গান।

গান। কি দেখিলাম রে কেশবভারতীর কুটীরে।
গান। গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
গান। কে হরিবোল হরিবোল বলে যায়,
যা রে মাধাই জেনে আয়।
গান। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়।
গান। গোরা নাচে সংকীর্তনে শ্রীবাস অঙ্গনে।
গান। চল গুরু দুজন যাই পারে।
গান। শ্রীহরি কাণ্ডারী যেমন, আর কি তেমন আছে নেয়ে

পার করেন দীনজনে অধম-তারণ চরণ দিয়ে।

রাত্রি সাতটা। শ্রীম-র কক্ষে ভক্তসভা। জগবন্ধু গদাধর ও বুদ্ধিরাম, বিনয় 'ব্রুকবণ্ড' ও ছোট রমেশ, বলাই ও মোটা সুধীর প্রভৃতি শ্রীম-র আহ্বানে তাঁহার কক্ষে গিয়া বসিলেন। সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রীম আজ পরিশ্রান্ত। তাই বলিলেন, পাঠ হোক। (জগবন্ধুর প্রতি) দিন তো লীলামৃতটা।

শ্রীম শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলামৃত হাতে লইয়া পাতা উল্টাইতেছেন। 'দিব্যোন্মাদের লক্ষণ' অধ্যায় বাহির করিয়া মোটা সুধীরের হাতে দিলেন পড়িতে।

সুধীর বেঞ্চে বসিয়া হ্যারিকেনের আলোতে পড়িতেছেন — শ্রীচৈতন্য দিব্যোন্মাদনায় সমুদ্রে ঝম্প দিলেন। আর একদিন সিংহদরজায় অসারবৎ পড়িয়া রহিলেন। এইসব দৈব উদ্দীপনা পূর্ণ বিবরণ পাঠ হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলামৃত অন্তেবাসী কিছু কাল হয় বেলেঘাটা হইতে আনিয়াছেন। আজকাল প্রায়ই উহা পাঠ হয়।

পাঠের শেষ সময় আসিলেন বড় জিতেন, ছোট জিতেন, বড় অমূল্য আর বিবেকানন্দ সোসাইটির তারক।

শ্রীম বলিলেন, আপনারা যা শুনলেন বসে চিন্তা করতে থাকুন। ভগবানের জন্য একেবারে পাগল। দেহজ্ঞান বিলুপ্ত, বাহ্য জগতের জ্ঞানও প্রায় বিলুপ্ত। ঠাকুরের এইসব অবস্থা চোখে দেখেছি। এইটি দেখাতে মানুষ হয়ে তিনি আসেন। লোক পাগল সংসার নিয়ে। এঁরা পাগল ঈশ্বরকে নিয়ে। এই দেখে তবে যদি জীব মধ্যপন্থা ধরতে পারে, এইটে দেখাতে আসেন।

এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম আহার করিতে ত্রিতলে নামিলেন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৫ই জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীঃ। ২১শে পৌষ, ১৩৩১ সাল।
সোমবার, শুক্লা একাদশী ৪৪ দণ্ড। ১০ পল।

সপ্তম অধ্যায়

অবতারের শাস্ত্রব্যাখ্যা ঠিক

১

রাত্রি সাড়ে ছয়টা। শ্রীম নববিধান ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বসিয়া আছেন পশ্চিমদিকে। আচার্য বেদী হইতে সারমন্ দিতেছেন। শ্রীম এখানে আসেন, ঠাকুর আসিয়াছিলেন তাই। ইহা তীর্থ। দ্বিতীয় কারণ, ঠাকুরের স্পর্শ গানের ভিতর দিয়া যদি লাভ হয়। ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল কেশব সেনের গায়ক। তিনি ঠাকুরের কথা ও ভাব লইয়া গান বাঁধিতেন। সেইসব গান শুনিতে আসেন। তৃতীয়, কেশব সেনের ভিতর দিয়া ঠাকুরের বহু ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ঠাকুরের কাছে যাইবার পূর্বে শ্রীম এই ভাবপ্রবাহে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীম বলেন, কেন কেশববাবুর কথা অত ভাল লাগতো তা বুঝতে পেরেছিলাম যখন ঠাকুরকে দর্শন করি। ঠাকুরের উচ্চ ভাবের প্রবাহ percolated (প্রবাহিত) হত কেশববাবুর ভিতর দিয়ে। তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কথামৃত শুনে বুঝতে পেরেছিলাম, এ-সবের source (মূল) ঠাকুর। আর একটি জিনিস সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ে অনুভব করেছিলাম। সেটি এই — কেশববাবুর বক্তৃতায় উদ্দীপন হতো ঈশ্বরের। কিন্তু মনে হতো — ঊর্ধ্বে, অতি ঊর্ধ্বে অতি দূরে রয়েছেন ঈশ্বর। ও মা, ঠাকুরের কাছে গেলে মনে হতো ঈশ্বর অতি নিকটে, যেন করতলে।

এখানে তিনি প্রায়ই আসেন, আর ভক্তগণকে পাঠাইয়া দেন। কেশববাবুর ভিতর দিয়া ঠাকুরের ভাবসমূহ তাঁহার শিষ্যবর্গের হৃদয়-মনে স্থান পাইয়াছে। এই শিষ্যগণের সারমনের ভিতর দিয়া যদি বা ঠাকুরের অমৃতকণা লাভ হয়, এই আশায়। অনেক সময় শ্রীম এই অমৃতকণা ভক্তদের পরিবেশন করিয়াছেন, অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত স্বর্ণকে যেরূপ পৃথক করিয়া লয় স্বর্ণবিশারদ, ঠিক সেইরূপে।

শ্রীম-র পাশে ও পিছনে বসিয়াছেন ভক্তগণ — জগবন্ধু, ডাক্তার বক্সী ও বুদ্ধিরাম, আর যোগেন ও তাঁহার পুত্র খোকা। কিছুক্ষণ পর শ্রীম ভক্তসঙ্গে সমাজ-মন্দিরের বাহিরে আসিলেন, পূর্বদিকে চলিতেছেন। অদূরে রাস্তার মোড়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটে অবস্থিত একটি মসজিদ আছে। সশ্রদ্ধভাবে যুক্ত করে এই মসজিদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ফুটপাথে পশ্চিমাস্য। কয়েকজন ভক্ত নামাজ পড়িতেছেন। এবার শ্রীম কিছুক্ষণ পর দক্ষিণ দিকে চলিতেছেন আমহার্স্ট স্ট্রীটের পূর্ব ফুটপাথ দিয়া। কিছুদূরে বাম হাতে সি.এম্. এস্. গির্জা। পাড়ার লোকেরা ইহাকে বলে লং সাহেবের গির্জা। শ্রীম ক্ষণকাল ইহার সম্মুখে পূর্বাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আবার চলিতেছেন।

এবার রাস্তা পার হইয়া পশ্চিম ফুটপাথে অবস্থিত মারোয়াড়ী হাসপাতালে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্তী ইহার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। তিনি ভক্ত লোক শ্রীম-র বিশেষ প্রিয়। তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন এখানে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখনও উৎসর্গ হয় নাই। তাই একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে উৎসর্গ হইবে। কর্মচারী সঠিক তারিখ বলিতে পারিল না। শ্রীম-র ধারণা ছিল উৎসর্গ-উৎসব হইয়া গিয়াছে। তাই দেব-দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

রাস্তা পার হইয়া পূর্ব ফুট দিয়া উত্তর দিকে চলিতেছেন। রাস্তায় ছোট জিতেন আসিয়া মিলিত হইলেন। সি.এম্.এস্. কলেজের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হোস্টেলের ছেলেরা পড়িতেছে। শ্রীম খোকাকে বলিলেন — এই দেখ, ছেলেরা কেমন পড়ছে। তোমার ইচ্ছা হয় না এরূপ পড়তে? খোকা ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে।

শ্রীম-র ভিতর আজ ঠাকুরের ধর্মসমন্বয়ের সুমধুর প্রবাহ চলিতেছে। তাই আনন্দে ব্রাহ্মসমাজ, মসজিদ, গির্জা ও মন্দির দর্শনে বাহির হইয়াছেন। শ্রীম-র ভিতর এই সমন্বয়ের ভাবটি ঠাকুরের শিক্ষায় সহজ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবন, বাণী ও আচরণ দেখিয়া তাহাই মনে হয়। ভক্তগণ শ্রীমকে দেখিয়াই ঠাকুর যে ধর্মসমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন, তাহা অনুমান করিতে চেষ্টা করেন।

আজ ৬ই জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ। ২২শে পৌষ ১৩৩১ সাল।

মঙ্গলবার, শুক্লা দ্বাদশী, ৪৮।২০ পল।

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের লম্বা বারান্দা। এখন রাত্রি আটটা। নিত্যকার ভক্তগণ শ্রীম-র জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীম আসিয়া বারান্দার পশ্চিম দিকে বেঞ্চে বসিয়া আছেন। শ্রীম-র পিছনে ও সামনে ভক্তগণ বেঞ্চে বসা। বড় জিতেন, ছোট জিতেন ও ডাক্তার, যোগেন, বিনয় ও জগবন্ধু, বলাই, ছোট রমেশ ও মোটা সুধীর, বিজয়, মনোরঞ্জন ও ছোট নলিনী, রমণী, বড় অমূল্য ও 'ব্রুকবণ্ড', সুখেন্দু, বুদ্ধিরাম, খোকা প্রভৃতি আসিয়াছেন।

যোগেন ঁদক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের খাজাঞ্চী। তিনি শ্রীম-র নিকট মন্দিরের কর্মচারীদের নামে নানা অভিযোগ করিতেছেন। শ্রীম-র কথায় তাঁহার ঐ কর্ম হয়। বয়স পঞ্চাশ। সংসারে একটিমাত্র পুত্র খোকা। স্বভাব চঞ্চল। আরও কয়েকবার শ্রীম-র নিকট এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্রীম চুপ করিয়া শুনিলেন। তিনি এসব আচরণ পছন্দ করেন না। সর্বদাই শান্তভাবে সকলকে সদুপদেশ দেন। কিন্তু যোগেন ছাড়িবার পাত্র নহেন। ক্রমাগত বকিয়া যান। এক একবার একটু থামেন আবার অধিকতর বেগে বকিয়া চলিতেছেন। অতিষ্ঠ হইয়া শ্রীম এবার মুখ খুলিলেন।

শ্রীম (প্রশান্তভাবে যোগেনের প্রতি) — আপনি যাদের আশ্রয় নিচ্ছেন ওরা কি সব খাঁটি লোক? আগে এদের করুন না reformed (খাঁটি)। আর যে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করছেন এদের আগে করে আসুন খাঁটি। তারপর এ হবে।

কালীঘাট (মা কালীর মন্দির) দেখুন না। সেখানে কত রকম কিছু হচ্ছে। হালদাররা (পুরোহিতরা) বেশ বলে, মা আমাদের দিচ্ছেন তাই খাচ্ছি। আর বৃন্দাবন — কত মন্দির ওখানে। একবার গিয়ে দেখে আসুন না। ওদের বলে আসুন না, তোমরা এরকম অন্যায় আচরণ করো না, খাঁটি হও। যান না একবার। দেখবো কেমন পারেন।

ওসব হবেই। যত সব মন্দির দেখছেন সর্বত্রই হয় এসব। কি করে বলুন? মাগ ছেলে রয়েছে,তাদের খেতে দেবে না? এ সামান্য বেতনে কুলোয় কি করে? সকলেই জানে এসব করে মন্দিরে। মন্দিরের মালিকরা কি সব চোখ বুজে থাকে? সব জানে এসব হয়। আবার এও জানে, মাইনে কম দি। দাও

না বেশী মাইনে — এদের পুষিয়ে দাও। তা হলে হয়তো এসব করবে না। মাইনের বেলা পাঁচ টাকা! এখন পাঁচসাত জন লোক নিয়ে কি করে থাকে এতে? কাজেই অন্যরকম আয়ের পথ করে।

ওদের যদি খাঁটি করতে চাও তবে আগে মাইনে বাড়াও। তখন তাদের অভাব থাকবে না তত। তখন বললে কেউ কেউ হয়তো শুনবে। সকলে শুনবে না। যতক্ষণ না এদের অভাব পূরণ করছো ততক্ষণ তোমার বলবার অধিকারও নাই। এই নিয়েই তো সারা জগতে ঝগড়া চলছে। রাশিয়ার আন্দোলনের মূলেও এই — labour (শ্রমজীবী) আর vested interestএ (কায়েমী স্বার্থে) লড়াই।

আপনার কথা শুনবে না ওরা। বেশী বাড়াবাড়ি করলে ওখানে আপনার থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রাণ সঙ্কট হওয়া বিচিত্র নয়। শুধু মুখে অন্যায় বললে তো চলবে না।

একবার সৃষ্টিটার দিকে তাকিয়ে দেখুন। সর্বত্র হচ্ছে এসব। Struggle for existence (বেঁচে থাকবার জন্য লড়াই)। কোথায় আপনার ন্যায়?

এই দেখুন, আমরা দুধ খাচ্ছি। কি করে দুধ আনা হয় দেখুন বিচার করে। আমরা জানি, বাচ্চাকে তার দেবদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করি। জানি আমরা তার কষ্ট হয়। তথাপি খাচ্ছি। কই, পারি কই, না খেয়ে? মুখটা মায়ের বাঁটে দু' একবার লাগিয়ে অমনি সরিয়ে দেয়। আর তাকে শুকনো খড় খেতে দেয়। এদিকে দুধ দুইয়ে নিচ্ছে। কয়দিন পর কঙ্কালসার। মরে যায় তারপর। কি অন্যায়! শুধু কি তাই? যেই দুধ ছাড়লে অমনি গেল কসাইয়ের হাতে। এতো দেখেও আমরা দুধ ছাড়তে পারছি কই?

কেন দুধ খাই? না, এ শরীরটাকে রক্ষার জন্য। এ শরীরটাও মিথ্যা। ও সবই মিথ্যা। মিথ্যা দিয়ে মিথ্যাকে রাখা।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখুন, দান, পরোপকার এ তো ভাল কাজ। এর সঙ্গে আবার কত অমঙ্গল জড়িত। একবার পুরীতে একজন বড়লোক সাধুসেবা, কাঙ্গালীসেবা করবে। হাজার হাজার লোক একত্র হয়েছে। একটা দরজায় একটু ফাঁক রেখে একজন করে ঢোকাচ্ছে। যত লোকের ভীড় লেগে গেছে। ধাক্কাধাক্কি মারামারি শুরু হলো। শেষে দেখা গেল, একশ

না কত লোক মরে গেছে। অমনি আর সাধুরা কেউ খেল না। সব ফিরে গেল। রইল সব মহাপ্রসাদ পড়ে। শেষে সমুদ্রের জলে ঐ মহাপ্রসাদ ভাসিয়ে দেয়। কত, চার হাজার টাকার বুঝি প্রসাদ। বিপাক দেখে ঐ বড়লোক দে ছুট — একেবারে পলায়ন।

দান তো ভাল কাজ। দেখুন তাতেও এই একশ লোকের প্রাণনাশ। আর কি-ই বা দান। খাওয়াবে তো একটু খিচুড়ি আর তরকারী!

শ্রীম (যোগেনের প্রতি) — আচ্ছা, আপনি আগে ওদের ঠিক করে আসুন, আপনার পরামর্শদাতাদের। ওদের বলে আসুন, তোমরা মিথ্যা কথা বলে অর্থ উপার্জন ক'রো না। দেখবো কেমন বাহাদুর আপনি। ওটা আগে ক'রে আসুন, তারপর আপনার অভিযোগের প্রতিকার হবে। যান যান, শীঘ্র যান।

শ্রীম (স্বগত) — সকলেই ভাবে আমি খাঁটি। কি মহামায়ার খেলা! নিজের দিকে দৃষ্টি করলে, দেখতে পায় অন্যায়-সাগরে ভাসমান। তা দেখতে দেবে না মা। তা হলে যে খেলা চলবে না। রাম রাম!

২

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — একটু পাঠ হোক ভাগবত।

যুবক চতুর্থ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায় পাঠ করিতেছেন। শিবনিন্দা করায় যজ্ঞস্থলে সতী, পিতা দক্ষ প্রজাপতিকে উপদেশ দিতেছেন। শ্রীম নিমীলিত নেত্রে পাঠ শুনিতেছেন। চতুর্থ অধ্যায় পাঠ শেষ হইল। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ঐটা আবার পড়ুন তো — মহাত্মারা জীবের দোষ দেখেন না।

যুবক পড়িতেছেন — সতী তাঁহার পিতাকে কহিতেছেন — হে দ্বিজ, আপনার ন্যায় যাহারা অসূয়া পরবশ তাহারা অপরের গুণ থাকিলেও তাহাতে কেবল দোষ দর্শন করিয়া থাকে।

কেহ কেহ গুণ ও দোষ যথাযথ বিচার করিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগকে মধ্যস্থ বলা যায়।

আবার যে সকল সাধু ব্যক্তি কেবল গুণ গ্রহণ করেন, কদাপি দোষ

গ্রহণ করেন না, তাঁহারা মহত্তর ব্যক্তি নামে অভিহিত।

আবার কিছুসংখ্যক মহাত্মা আছেন, তাঁহারা অপরের দোষ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, যৎকিঞ্চিৎ গুণকেও প্রচুর বলিয়া গ্রহণ করেন, ইঁহারা মহত্তম মহাত্মা।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি) — শুনুন আপনি এটা মুখস্থ করে রাখুন।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি) — মহাত্মাদের ক'টা ক্লাস করলেন, বলুন তো?

পাঠক — তিনটে ক্লাস। প্রথম, মধ্যস্থ মহাত্মা। এঁরা যথাযথ বিচার করেন দোষগুণের। দ্বিতীয়, মহত্তর মহাত্মা। এঁরা অপরের দোষ মোটেই দেখেন না। খালি গুণটার উপর নজর এঁদের। আর তৃতীয়, মহত্তম মহাত্মা। এঁরা যে শুধু লোকের গুণই দেখেন তা নয়। তিল পরিমাণ গুণকে তাল পরিমাণ দেখেন এঁরা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই শেষের গুণ-দৃষ্টিটি ঠাকুরে দেখেছি। একটু গুণ যেই দেখলেন ভক্তদের ভিতর অমনি ওটা টান মেরে বের করে ফেলবেন। যেমন আবর্জনার ভিতর যদি একটা gold bar (সোনার পাত) পড়ে থাকে, সেটাকে যেমন লোক বের করে নেয়। ঐ গুণটা এতো বড় করে ধরতেন ভক্তদের কাছে যে ভক্ত শুধু ওটাই চিন্তা করতো। আর ওটা ধরে উপরে উঠে পড়তো। তার ফলে প্রতিকূল সংস্কারগুলি নিচে পড়ে যেতো। এ গুণটি অবতারে সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়, ঠাকুরের আচরণে দেখেছি। একজন হয়তো একটিমাত্র ভজন জানে। তাকে সেইটি গাইতে বলতেন। এইটি ধরে রাস্তা করে দিলেন ভক্তকে, ঠাকুরকে চিন্তা করতে।

অমনি যদি বলতেন, আমাকে চিন্তা কর, তা হলে হয়তো করবে না। তাই ঐ পথে ঠাকুরের সঙ্গে ঐ গানটি দিয়ে যোগ করে দিয়ে ঠাকুরের চিন্তা করিয়ে নিতেন ঠাকুর স্বয়ং ভক্তের দ্বারা।

ভক্ত ভাবছে, পরমহংসদেব ঐ গানটি শুনতে ভালবাসেন। গানকে অবলম্বন করে ঈশ্বরকে, নিজেকে চিন্তা করিয়ে নিতেন তিনি।

এই একটা গুণ ধরে এমন টান দিতেন যে মন্দ সংস্কারগুলি আর মাথা তুলতে পারতো না। তীব্র প্রতিকূল সংস্কার মাথা তুলে বটে। কিন্তু বার বার আঘাত খেয়ে নিচে পড়ে যায়। অবতারগণ পারেন এটা। এক ছোবলেই খতম — যেমন কেউটের ছোবল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শশীর সেবার ভাব। তাকে ঐটে ধরে টেনে নিলেন। ঠাকুর তাকে বলতেন, এক পয়সার বরফ আনবি। কোথায় কলকাতা আর কোথায় দক্ষিণেশ্বর — পাঁচ ছ' মাইল ব্যবধান। ছেলেমানুষ, পয়সা নেই। কোনও রকমে দুচার পয়সা যোগাড় করে বরফ কিনে কাপড়ে জড়িয়ে চলল দক্ষিণেশ্বর হেঁটে হেঁটে। উঃ, কি রোদ্দুর, গ্রীষ্মের! ভ্রূক্ষেপ নেই। মনে আনন্দ, ঠাকুর খাবেন। শেষে কি সেবা! মন প্রাণ শরীর অর্পণ করে সেবা করলো ঠাকুরের — যেন মহাবীরের মত সেবা।

শ্রীম (সকলের প্রতি, লক্ষ্য যোগেন) — লোকে এসব দেখবে না। খালি খুঁৎ ধরে অপরের। কে একটু সন্দেশ বেশী নিলে, কে দু'খানা লুচি বেশী খেলে — এসবে নজর।

তারপর ঠাকুরের আচরণ তো দেখা উচিত যারা তাঁর চিন্তা করছে। তিনি এই সব লোকের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ত্রিশ বছর কাটালেন। সকলের গুণ নিয়ে একটি মধুচক্র রচনা করা। তবে শান্তি, তবে সুখ।

৩

পরের দিনও সারাদিন শ্রীম স্কুলের কাজে ব্যস্ত। স্কুলের নূতন বৎসরের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ছাত্র ভর্তি করা, আবার নূতন শিক্ষক নিয়োগ করা প্রভৃতি নানা কাজ। আজ একজন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন, এম.এ. পাশ — নাম রমণী চৌধুরী। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, শ্রীম-র স্নেহভাজন।

শ্রীম খুব পরিশ্রান্ত। স্কুল ছুটি হইলে তিনি চারতলায় উঠিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। ভক্তগণ একত্রিত হইয়াছেন। কেহ ছাদে কেহ সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন। বড় জিতেন, ছোট জিতেন ও ছোট নলিনী, ডাক্তার, বিনয় ও জগবন্ধু, বলাই, 'ব্রুকবণ্ড' ও ছোট রমেশ, রমণী ও সুখেন্দু, বিবেকানন্দ সোসাইটির তারক ও মোটা সুধীর প্রভৃতি শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

রাত্রি সাতটায় শ্রীম নিজের কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন। ভক্তগণ দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা ও প্রণাম করিলেন। তিনি দোরগোড়ায় চেয়ারে বসিয়াছেন দক্ষিণাস্য। ভাগবত পাঠ করিতে বলিলেন। পরিশ্রান্ত থাকিলে প্রায়ই শাস্ত্র

পাঠ করিতে বলেন। তাঁহার আদেশে দশম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ চলিতেছে।

বালক কৃষ্ণ রাখাল বালকগণের সঙ্গে বাল্যলীলায় নিমগ্ন। গোবৎসগণসহ কৃষ্ণ ও রাখালগণ ক্রীড়া করিতে করিতে বনভূমিতে অগ্রসর হইতেছেন। অচিরকাল মধ্যে কৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন, দুষ্ট মায়াবী দানব। অঘাসুরের কবল মধ্যে তাঁহারা প্রবিষ্ট। তাই নিজের বিভূতিবলে রাখালগণসহ নিজেকে ও গোবৎসগণকে আকাশ প্রমাণ স্ফীত করিতে লাগিলেন। অঘাসুর দমবন্ধ হওয়ায় তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বাল্যলীলাচ্ছলে ঠাকুরও কত খেলা খেলেছেন বয়স্যদের সঙ্গে। মানিক রাজার আমবাগানে যাত্রাভিনয় করেছিলেন। নিজে নিলেন শিবের ভূমিকা। তা এমনি ভাবের অভিব্যক্তি করলেন, শিব — তো হুবহু শিব। লোকের মনে হল যেন সাক্ষাৎ শিব এসেছেন মানবশরীর ধারণ করে। গ্রামের কুলবধূগণের প্রাণ গদাই। তাঁকে না দেখলে তাঁদের প্রাণ ছট্‌ফট্ করে। শ্রীকৃষ্ণের জন্যও গোপবধূগণ ব্যাকুলা। তাঁকে না দেখলে প্রাণ যায়।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — বলুন তো, কেন কামারপুকুরের স্ত্রীপুরুষগণ ঠাকুরকে অত ভালবাসতেন?

ভক্ত — আপনি সেদিন বলেছিলেন, ঠাকুর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত পরমব্রহ্ম। তিনি নিজের শক্তি মহামায়ার দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ করেন। তিনিই সাড়ে তিন হাত মানুষ হয়ে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তিনিই আবার সকলের অন্তরাত্মা।

শ্রীম — হাঁ, তিনি সকলের অন্তরাত্মা। আত্মাকে, আপনাকে, নিজেকে, কে না ভালবাসে? যিনি অন্তরে রয়েছেন অন্তর্যামীরূপে, তিনিই সামনে রয়েছেন বালকরূপে।

নরলীলায় দেবতা ঋষিগণ আসেন লীলা সম্ভোগের জন্য। কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বরের বৃক্ষলতা পর্যন্ত চৈতন্যময়, ছদ্মবেশী দেবতা ও ঋষিগণ।

একজন ভক্ত (স্বগত) — তাই কি শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে গেলে, দেখতে পাই, বৃক্ষগণকে প্রেমালিঙ্গন করেন। কখন বলেন, এখানকার প্রতিটি ধূলিকণা

চৈতন্যময়।

একবার ঝড়ে পড়ে যায় একটা আমগাছ গাজিতলার কাছে। চাকররা কেটে রাস্তা পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। কুড়োলের কোপের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীম আঁতকে উঠেছিলেন আর মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যায়।

শ্রীম — শুকদেব যে এইমাত্র বললেন, বৃন্দাবনের গোপ বালকগণ সব দেবতা। আর গোবৎসগণ যত সব ঋষি।

এই অবতারতত্ত্ব, প্রেমলীলা বিচারে টেঁকে না। এটি বোঝা যায় যদি ঈশ্বরের কৃপা হয়। কি করে বোঝে মানুষ, ঈশ্বর মানুষ হয়ে এসেছেন! যদি বল, তবে কেন করেন এ সব লীলা? তার উত্তর, ভক্তরা যে চায় তাকে মানুষরূপে। তাদের জন্য এই লীলা। ভক্তরা চায় মানুষরূপী তাঁর সঙ্গে আমরা মানুষের মত ব্যবহার করবো — খাওয়াবো পরাবো, হাসি কৌতুক করবো। এই স্থূল শরীর দিয়ে স্থূল শরীরধারী ভগবানের সঙ্গে আমরা লোক ব্যবহার করবো।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, কি সুন্দর এই চিত্রটি! পরমব্রহ্ম পাঁচ বছরের শিশু কৃষ্ণ। তাঁর ডান হাতে দই ভাত, আর বাম হাতে সব ফল — দৌড়াদৌড়ি করছেন।

আপনারা পাঠ শুনুন, আর এই সব চিন্তা করুন। পরে আমাদের বলবেন। আমরা খেয়ে আসছি।

৪

শ্রীম আহার করিতে তিনতলায় নামিয়া গেলেন। ডাক্তার বক্সী ভাগবত পাঠ করিতেছেন ত্রয়োদশ অধ্যায়। এখন রাত্রি আটটা। এই অধ্যায় পাঠ করিয়া চতুর্দশ অধ্যায়ও প্রায় শেষ হয় হয়, তখন আসিলেন শ্রীম। ইনি পূর্বের চেয়ারেই বসিলেন। এইবার কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি) — বলুন, কি পাঠ হলো?

পাঠক — ভগবানের আরও লীলামহিমা দর্শনের জন্য ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণ ও গাভীগণকে অপহরণ করেছিলেন।

একজন ভক্ত — শ্রীকৃষ্ণ খুঁজে যখন পেলেন না, তখন বুঝতে পারলেন এটা ব্রহ্মার কার্য। তাই তিনি নিজে গোপাল ও গোবৎসগণের রূপ ধারণ করলেন। এক বছর এই রূপে ছিলেন। ব্রজবাসীগণ মোটেই ইহা বুঝতে

পারেন নাই। তবে মায়েদের সন্তানগণের উপর যে মোহাশ্রিত স্নেহ থাকে তা ছাড়াও এক দৈব আকর্ষণ অনুভব করতেন।

ছোট জিতেন — ব্রহ্মা বড় ফাঁপরে পড়ে গেলেন দু' সেট গোপবালক ও গোবৎস দেখে। কোন্‌টা বাস্তব, কোন্‌টা কৃষ্ণের তৈরী বুঝতে পারলেন না। কৃষ্ণকে মোহিত করতে গিয়ে নিজেই মোহিত হয়ে পড়লেন।

ছোট রমেশ — ব্রহ্মা সব বালক ও বৎসগণকে চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বৈকুণ্ঠবাসী জ্ঞানানন্দময় মূর্তিতে দর্শন করলেন। আর সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখে অতি বিস্ময়ে 'একি একি' বলে সংজ্ঞাহীন হয়ে বাহন থেকে পড়ে গেলেন।

শ্রীম — বিনয়বাবু, বল তুমি কি শুনলে।

বিনয় (সলজ্জ অনুনাসিক স্বরে) — ব্রহ্মা বললেন, হে প্রভো, আপনিই সগুণ, আপনিই নির্গুণ।

রমণী — স্তবে ব্রহ্মা বললেন, পৃথিবীর সব পরমাণু, শূন্যের হিমকণার পরমাণু এবং নক্ষত্রাদির কিরণসমূহের পরমাণু গণনা করা বরং সম্ভব, কিন্তু আপনার গুণসমূহের গণনা সম্ভব নয়।

বড় জিতেন — ব্রহ্মা বললেন, এই ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর। এরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের গতাগতির গবাক্ষস্বরূপ ভগবানের একটি লোমকূপ।

তারক ব্রহ্মচারী — শুকদেব পরীক্ষিৎকে বললেন, যারা সারগ্রাহী সাধু, হরিকথাই তাদের বাক্য, কর্ণ ও অন্তঃকরণস্বরূপ।

সুখেন্দু — বলরামও দেখলেন, যত সব গোপবালক আর গোবৎস সব কৃষ্ণময়। বলরামের প্রশ্নে কৃষ্ণ তখন তাঁর নিকট এই লীলা বর্ণনা করেন।

জগবন্ধু — ব্রহ্মা বললেন, আপনার নরলীলা, সহজে ভক্তগণ যাতে সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারে, তজ্জন্য করা। ভগবানের এই সব নরলীলা-কাহিনী আদরসহকারে যে সর্বদা শ্রবণ-কীর্তন করে সে সহজে ও অনায়াসে মুক্তির অধিকারী হয়। ভগবানের উপর ভালবাসা এলে ভক্তি হয়। ভক্তিতে মুক্তি হয়।

ভক্তগণের ভাগবত বর্ণনা শেষ হইল। এইবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তগণের প্রতি) — আহা, কি সব কথা! ব্রহ্মা সব তন্ময়

দেখলেন — অখিল বিশ্ব কৃষ্ণময়। ঠাকুর বলেছিলেন, শিব এই দৃশ্য দেখে — তিনিই চরাচর বিশ্বরূপে বিরাজিত — বিস্ময়ানন্দে নৃত্য করেছিলেন। ঠাকুরও দেখেছিলেন সব চৈতন্যময় — বৃক্ষলতা পশুপক্ষী, গৃহ বাগান, ফুল ফল, মালী, মন্দির মূর্তি, সব চৈতন্যে মোড়া। চৈতন্য-স্বরূপ ভগবান এই বিশ্বরূপে বিরাজিত। নাম-রূপের ক্ষুদ্র আবরণে চৈতন্যের ছড়াছড়ি, চৈতন্যের হাটবাজার — 'সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।' (ভাগবত)

ঠাকুর বলেছিলেন, এখানে এলে গেলেই হবে। কি হবে? এই যা বললেন ব্রহ্মা — মুক্তি। সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি।

এ আর কি বড় কথা! তাঁ'তে অহৈতুকী ভক্তি লাভ হয়। ভক্তগণ মুক্তি চায় না। চায় কেবল ভক্তি।

বলেছিলেন, এখানকার যত কিছু কাজ, সব লোকশিক্ষার জন্য। মানে, এসব নজীর। কোনও সমস্যায় পড়লে এসব কথা তা দূর করবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভাবতে ভাবতে তাঁ'তে ভালবাসা হবে। তা হলেই আর সংসারের শোক মোহে অভিভূত হবে না।

নরলীলায় বিশ্বাস হয় শেষ জন্মে, ঠাকুর বলেছিলেন। ভগবানের যত রকম দান আছে তার মধ্যে সব চাইতে বড় দান এইটে — অবতারশরীর ধারণ। অবতার না হলে ঈশ্বরকে মানুষ বুঝতে পারে না — ঐ অসীম অনন্তকে।

তাঁর রূপচিন্তা, লীলাচিন্তা, আর মহাবাক্যচিন্তা এই সবই ধ্যেয়। এসব করলে তাঁ'তে ভক্তি হয়। তারপর তাঁর কৃপায় তাঁর স্বরূপ দর্শন হয়।

নিরাকার নির্গুণকে কি করে মানুষ ধারণা করে? এ তত্ত্ব ধারণা করতে পারে না সকলে। তাই তিনি সাকার সগুণ রূপ ধারণ করেন। আবার নরলীলা। নরলীলায় মানুষ তো ষোল আনা মানুষ। না ধরা দিলে কেউ ধরতে পারে না অবতারকে। দেখ, ব্রহ্মা ধরতে পারলেন না প্রথমে। বলরাম পর্যন্ত ধরতে পারেন নাই। উভয়েই জগৎ কৃষ্ণময় দেখে বিস্ময়াবিষ্ট। কৃষ্ণ নিজে পরিচয় দিলে বলরাম বুঝলেন, কৃষ্ণ কেবল আমার ভাই নয় — কৃষ্ণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

বড়ই কঠিন ব্যাপার অবতারকে বোঝা। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁকে বোঝা যায়। তাও আবার এক একবার সংশয় এসে যায়। তাঁর মহামায়ার এমনি খেলা! এক একবার যেন একেবারে প্রাকৃত (সাধারণ) মানুষের ব্যবহার।

শ্রীম কিছুকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শাস্ত্র বুঝা বড় শক্ত কাজ। অবতার না এলে এ সব sealed books (অবোধ্য গ্রন্থাবলী) হয়ে থাকে। পণ্ডিতরা কদর্থ করে।

শাস্ত্র পড়তে চায় অনেকে। এখন শাস্ত্র interpret (ব্যাখ্যা) করে কে? গুরুমুখে শোনা যায় তো হয়। শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশানো থাকে। গুরু চিনি আলাদা করে ধরেন ভক্তদের কাছে। গুরু মানে অবতার, যেমন ঠাকুর। তাইতো বাবুদের লেকচার শুনতে আমাদের আর ভাল লাগে না। কি বলতে কি বলে বসে। এক বলতে আর ঢুকিয়ে দেয়, মনগড়া সব কথা। সব মানুষের idiosyncracy (খামখেয়াল) সব আছে কি না। কিন্তু অবতার যা বলেন, তা খাঁটি সত্য। এতে খাদ নেই, সব সার। সব সত্য। বাবুদের লেকচারের কর্ম নয় শাস্ত্রার্থ করা।

আমরা ব্রাহ্মসমাজে যাই কেন? ঠাকুর গিছলেন তাই। আর এদের ভিতর ঠাকুরের ভাব তিনি নিজেই ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাই যাই যদি ঐ ভাব percolate করে (অনুস্রাবিত হয়ে আসে) এদের ভিতর দিয়ে, তাই শুনতে। কেশব সেনের ভিতর ঠাকুরের ভাব ঢুকেছে কিনা। 'মা, মা' করে এরা। এটা ঠাকুর ঢুকিয়েছেন।

আদি সমাজের উপনিষদ্ পাঠ শুনতে যাই — ঋষিদের কথা সব। এতে আবর্জনা নেই। সব নির্মল। শুদ্ধ পবিত্র সত্য কথা সব। গীতাও ভগবানের মুখ দিয়ে বের হয়েছে। এই সবই revelation (বেদবাণী)।

তা হলেও এই সব কথাই আবার ঠাকুরের মুখ দিয়ে বের হয়েছে। তবেই তো এতে আর সংশয় নেই — একেবারে Gospel Truth (বেদবাণী)।

ঠাকুর বলেছিলেন, বেদের উপনিষদের সব সত্য। আবার তিনি বলেছিলেন, গীতার কথায় আঁচড় দেবার যো নেই। সব সত্য।

কে বলতে পারে এসব কথা? কার এ শক্তি আছে ভগবান ছাড়া। তাই একদিন গোপনে ডেকে নিয়ে আমায় বললেন, 'এই মুখ দিয়ে তিনিই কথা কন' — অর্থাৎ ঈশ্বর। আপনারা এই মহাবাক্য ভাবতে ভাবতে বাড়ি যান।

রাত্রি দশটা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ৭ই জানুয়ারী ১৯২৫ খ্রীঃ।
২৩শে পৌষ ১৩৩১ সাল। বুধবার শুক্লা ত্রয়োদশী। ৫৩ দণ্ড। ১৬ পল।

অষ্টম অধ্যায়

প্রেমানন্দ সারদানন্দের দৃষ্টিতে

১

মর্টন স্কুল। শ্রীম-র চারতলার কক্ষ। জানুয়ারী মাস। সকাল আটটা। ছোট জিতেন, জগবন্ধু, বিনয় ও গদাধর শ্রীম-র সম্মুখে বেঞ্চে বসা। শ্রীম বিছানায় দক্ষিণ-পশ্চিমাস্য। তিনি গদাধরের সহিত ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি) — আচ্ছা, তুমি রাঁধ না কেন? স্বপাক খাওয়া ব্রহ্মচারীর কর্তব্য। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় এতে। ঠাকুর ভক্তদের দিয়ে রাঁধিয়ে নিতেন।

(নয়ন হাস্যে) ধর্মব্যাধ জীবন্মুক্তির পরও মাংস বেচতেন। কি করবেন এ না করে? কর্ম করতেই হবে, প্রকৃতিতে যে রয়েছে, ভয় করলে যাবে না।

ঠাকুর বলেছিলেন, কেরাণী জেলে গেল। জেল থেকে এসেও কেরাণীগিরিই করবে। এই দেখ, বিনয়বাবু (শ্রীম-র বালিশের ওয়াড়) সেলাই করবে (হাস্য)। ইনার এটি ভাল লাগে। আমাকে দেখ না, মাস্টারী করছি।

শ্রীম কথা কহিতে কহিতে ছাদে আসিয়াছেন। ছোট নলিনী ও বিজয়ের প্রবেশ। শ্রীম-র ফষ্টিনষ্টি চলিতেছে।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি) — আজ কি তিথি?

একজন ভক্ত — ত্রয়োদশী হবে (আজ পূর্ণিমা)।

শ্রীম (রহস্য করিয়া) — আচ্ছা বেশ, এই শুভ তিথিতে শুভ মুহূর্তে তোমার নাম রাখলাম আমরা গদাধর মহারাজ। তুমি তো মঠের সাধু হবে না। ঠাকুর যা বলতেন তা হবার ইচ্ছে — কুমড়ো-কাটা বড় ঠাকুর। (হাসিতে হাসিতে) বড় জ্যাঠা হয়ে গেছ।

আজ ৯ই জানুয়ারী ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ। ২৫শে পৌষ ১৩৩১ সাল, শুক্রবার। পূর্ণিমা, ৬০ দণ্ড।

আজও সারাদিন শ্রীম স্কুলে কাজ করিয়াছেন। ছুটির পর ছাদে আসিয়াছেন। এখন পাঁচটা, শ্রীম খুব ক্লান্ত। চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়াছেন। তাঁহার ডান হাতে বেঞ্চে বসা জগবন্ধু, গদাধর, বিনয়, ডাক্তার ও ছোট অমূল্য*।

ছোট অমূল্য আজই দেশ হইতে আসিয়াছেন আড়াইটার সময়। খুব শান্ত মধুর স্বভাব তাঁহার। শ্রীম তাঁহাকে বলেন সত্ত্বগুণী ভক্ত। তিনি শ্রীম-র অমুমতি লইয়া সাধনভজনে দিন অতিবাহিত করেন। হগ মার্কেটে তাঁহার কর্ম ছিল। উহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া তাহার সুদে জীবিকা নির্বাহ করেন। মধ্যবিত্ত অবস্থা। ঘরে মা, স্ত্রী ও একটি কুমারী কন্যা আছে। কলিকাতা আসিলে ডাক্তার বক্সীর কাছে থাকেন। বয়স পঁয়ত্রিশের উপর হইবে। ভক্তরা সকলে তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসেন। আর আদর করিয়া 'খুড়ো' বলেন।

শ্রীম আনন্দে ছোট অমূল্যের সহিত দেশের সব কুশলাদির সংবাদ লইলেন। আর জিজ্ঞাসা করিলেন, তপস্যার কুশল তো? বেশ করেছেন, শান্ত হয়ে তাঁর নাম করছেন। ঠাকুর যদি দেখতেন, কারো মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা আছে তবে আনন্দে দু হাত তুলে নাচতেন। বলতেন, এ ব্যক্তি ইচ্ছা করলে ভগবানকে ডাকতে পারে। পেটের চিন্তায় যোগভ্রষ্ট হয়ে যায়।

সদানন্দের প্রবেশ। সে গদাধরের বড় ভাই। অদ্বৈত আশ্রমে কর্ম করে। ফষ্টিনষ্টি চলিতেছে।

শ্রীম (সদানন্দের প্রতি, লক্ষ্য গদাধর) — আহা কি ভক্তি! আমরা যা বলি তা শোনে না (হাস্য)। বাপকে আমি খুব ভক্তি করি। কিন্তু তাঁর কথা শুনি না (সকলের উচ্চহাস্য)। এ বড় জ্যাঠা হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হয় হয়। অনেকগুলি ভক্ত আসিয়াছে। শ্রীম সকলকে বলিলেন, আপনারা ধ্যান ট্যান করুন। আমি আসছি। এই বলিয়া শ্রীম উঠিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অনেকক্ষণ ধ্যানের পর এবার গান গাহিতেছেন।

*দুইজন অমূল্যই ভক্ত। ইনি বয়সে বড়, আকারে ছোট - তাই ইনি ছোট অমূল্য। আর একজন বয়সে ছোট, আকারে বড় - তাই বড় অমূল্য।

ভক্তগণ সকলে পাশের পার্টিশানের ঘরে বসিয়া ভজনানন্দ উপভোগ করিতেছেন। এতক্ষণে দুর্গাপদ মিত্র, বড় জিতেন ও ছোট জিতেন, বলাই ও মোটা সুধীর, 'ব্রুকবণ্ড' ও রমণী প্রভৃতি একত্রিত হইয়াছেন। আর পূর্ব হইতেই জগবন্ধু ও বিনয়, ডাক্তার ও ছোট অমূল্য, গদাধর ও সদানন্দ বসা।

অমৃত গুপ্ত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সমরের হাতে মালপোয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। সমর মর্টন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। অন্তেবাসী মালপোয়া রাখিয়া দিলেন।

শ্রীম গানের পর গান গাহিয়া চলিয়াছেন, তরঙ্গের মত। কি করুণ ও মধুর কণ্ঠস্বর! ভক্তগণ পাশের ঘরে বসিয়া সঙ্গীত-সুধা-পানে নিমগ্ন।

গান। দুর্গানাম ভুল না, ভুল না, ভুল না রে মন।

গান। মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।

গান। ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।

গান। শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।

শ্রীম কুড়ি মিনিট নীরব। পুনরায় সঙ্গীত।

গান। চিদাকাশে হলো প্রেম পূর্ণচন্দ্রোদয় হে।

গান। জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী।

প্রভৃতি।

শ্রীম উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। ডাক্তারবাবুকে চৈতন্যলীলামৃত পাঠ করিতে বলিলেন। ডাক্তার দরজার সামনে বসিয়া পাঠ করিতেছেন। ভক্তগণ যে যেখানে বসিয়াছিলেন সেখানে বসিয়া আছেন। পাঠের স্থান নিজে বাহির করিয়া দিলেন।

নিত্যানন্দ দেবাদিষ্ট হইয়া নবদ্বীপে আসিয়াছেন। ইনি বার বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। বিশ বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতের তীর্থপর্যটনে ও তপস্যাতে অতিবাহিত করেন। বত্রিশ বৎসর বয়সে শ্রীভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হন — 'আমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি এসো।' তাঁহার পূর্বাশ্রম বীরভূম জেলায়। পিতার নাম হারু ওঝা।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও অদ্বৈতাচার্যও আদিষ্ট হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেমিক গৃহস্থ ভক্ত। পূর্বাশ্রম পূর্ববঙ্গে। তিনি সঙ্গতিসম্পন্ন মাননীয় ব্যক্তি। বাহিরে রজোগুণের আবরণ।

কিন্তু অন্তরে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসমুদ্র। একদিন চৈতন্যদেব, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতে পণ্ডিত গদাধরকে পাঠাইলেন। তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির রাজসিক ভাব ও বৈভব দেখিয়া রুষ্ট মনে ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার ভাব বুঝিয়া অন্য একদিন মুরারী গুপ্তের সহিত গদাধরকে পাঠাইলেন বিদ্যানিধির গৃহে। বলিয়া দিলেন, মুরারী গুপ্ত যেন গিয়া গোপী-গীতা আবৃত্তি করেন। বিদ্যানিধি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসিয়া আলবোলায় তামাক খাইতেছিলেন। যখন শুনিলেন,

'তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্ ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ॥'

— তখন বিদ্যানিধির রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। ভাবে বিভোর হইয়া তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। আর শয্যা হইতে ভূতলে পতিত হইয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিলেন শুদ্ধ প্রেমে। গদাধর স্তম্ভিত হইলেন। আর হীনভাব পোষণ করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষিত হইলেন।

অদ্বৈতাচার্য বৃদ্ধ, জ্ঞানী ভক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ রাজমন্ত্রী। সমাজের ভক্তিহীন ভাব দেখিয়া ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেন নীরবে ব্যাকুলভাবে, যাহাতে তিনি অবতীর্ণ হন। তাঁহার হৃদয়ের ডাকে ভগবান শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনিও দেবাদিষ্ট হইয়া নবদ্বীপে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

এইরূপ পাঠ চলিতেছে। শ্রীম ভক্তদের বলিলেন, আপনারা বসে শুনুন, আমরা খেয়ে আসছি। ডাক্তারও বলিলেন, আমিও উঠবো। শুনিয়া শ্রীম বলিলেন — বেশ, তা হলে ইনি (মোটা সুধীর) পড়ুন। অন্তেবাসী বলিলেন, অমৃতবাবু মালপোয়া পাঠিয়েছেন। শ্রীম উত্তর করিলেন, কই দেখি কেমন। হাতে লইয়া বলিলেন — বাঃ, বেশ মালপো।

শ্রীম মালপোয়ার ভাণ্ড দুই হাতে লইয়া, জুতা ছাড়িয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিবেদন করিলেন। ঐ ভাণ্ড অন্তেবাসীর হাতে দিয়া বলিলেন, দিন সকলকেই এক একটা করে।

শ্রীম ও ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ভক্তরা মালপোয়া খাইয়া পুনরায় আসিয়া বসিলেন। সুধীর পাঠ করিতেছেন।

শ্রীম আহার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন নয়টার পর। সিঁড়ির ঘরে বসিয়াছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য। পাঠ বন্ধ হইয়াছে। পাঠ চলিলে বাজে কথা হয় না। তাই তিনি ভক্তদের পাঠে নিরত রাখিয়া অন্যত্র যান। শ্রীম বসিয়া আছেন। ভক্তরা দেখিতেছেন তাঁহার মন অন্য কোন স্থানে। খানিক পর কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আশাবরী কেমন বাজাচ্ছে!

আহা, এই রূপ রস গন্ধ দিয়েই তাঁর পূজা করা। অনিত্য দিয়ে নিত্যের পূজা করা। এতেই তিনি সন্তুষ্ট।

শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পৌত্র অরুণ বাঁশি বাজাইতেছে তিনতলায়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি চাহিয়া) — ও এখন বড় মুস্কিলে পড়েছে। এগ্‌জামিনের পড়া করতে হবে এখন। মহা মুস্কিলে পড়েছে বেচারা। যে রস ও পেয়েছে আর কি পড়া ভাল লাগে!

এই সব রাগরাগিণী সব শিবের মুখ থেকে বের হয়েছে — ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।

ঠাকুর বলতেন, এ দিয়েও তাঁর পূজা হয়। বলেছিলেন, গান গেয়েও সিদ্ধিলাভ করতে পারে। রামপ্রসাদ গানে সিদ্ধ। অনিত্য দিয়ে নিত্যের পূজা। কথাটা হচ্ছে এই, যার যা আছে তাই তাঁকে দেওয়া। আন্তরিক হলে তাতেই দর্শন দেন।

রাত্রি দশটা।

২

মর্টন স্কুল। অপরাহ্ণ আড়াইটা। শ্রীম চারতলার ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। পাশে টিনের ঘরে অন্তেবাসী ও ভক্তগণ কেহ কেহ বসিয়া আছেন।

'উদ্বোধন' হইতে স্বামী সারদানন্দ আসিয়াছেন। ইনি ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ; রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জীবনভর সেক্রেটারী, 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'র রচয়িতা আর শ্রীশ্রীমায়ের প্রধান সেবক ও দ্বারপাল।

স্বামী সারদানন্দ মর্টন স্কুলের ফটকের কাছে মোটরে বসিয়া আছেন। সঙ্গে আসিয়াছেন স্বামী অসিতানন্দ, স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ, স্বামী অশেষানন্দ ও দেবু। স্বামী অসিতানন্দ চারতলায় উঠিয়া অন্তেবাসীকে স্বামী সারদানন্দের

আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিলেন। অন্তেবাসী দ্বারে আঘাত করিলে শ্রীম বাহির হইয়া ছাদে আসিলেন। তখন তাঁহাকে স্বামী সারদানন্দের আগমন সংবাদ নিবেদন করা হইল।

শ্রীম অন্তেবাসীর হাতে তিনতলার প্রভাসবাবুর ঘরের চাবি দিয়া বলিলেন — যাও, শীঘ্র ঐ ঘর খুলে রাখ। আমরা আসছি।

শ্রীম-র ইচ্ছা তিনি নিচে গিয়া দেখা করিবেন। স্বামী সারদানন্দ স্থূলকায়, উপরে উঠিতে কষ্ট হইবে। অন্য দিকে স্বামী সারদানন্দ ভাবিতেছেন শ্রীম বৃদ্ধ। তাঁহাকে কেন কষ্ট দেওয়া। তাই তিনি নিজে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া তিনতলার বারান্দায় দাঁড়াইলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীম তিনতলার বারান্দায় নামিয়া আসিয়া দেখিলেন স্বামী সারদানন্দ পূর্বেই উপরে উঠিয়াছেন। তিনি বিচলিত হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে একখানা মাত্র চেয়ার। শ্রীম বলিলেন, বসো বসো। ঘেমে গেছ যে! স্বামী সারদানন্দ সহাস্যে উত্তর করিলেন, মাস্টার না বসলে ছাত্র বসে কি করে?

আর একখানা চেয়ার আসিলে উভয়ে বসিলেন — শ্রীম দরজার কাছে দক্ষিণ-পশ্চিমাস্য, স্বামী সারদানন্দ পূর্ব-দক্ষিণাস্য। আর সাধু ভক্তগণ সকলে দাঁড়াইয়া দুই গুরুভ্রাতার মিলনানন্দ দর্শন ও উপভোগ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমকে সুখাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া সুবিবেচক মর্যাদাপালক মাতৃ-হৃদয় প্রশান্তমূর্তি স্বামী সারদানন্দ স্থূলকায় হইয়াও বালকের ন্যায় মেঝেতে হাঁটু গাড়িয়া শ্রীমকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। শ্রীম ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং হাত ধরিয়া উঠাইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন — আহা, শরৎমহারাজ, করছ কি? "দাদাকে প্রণাম করছি" — বলিয়া স্বামী সারদানন্দ উঠিয়া পুনরায় চেয়ারে বসিলেন।

স্বামী সারদানন্দ যখনই কলিকাতার বাহিরে ৺কাশী, পুরী বা অন্যত্র যান তখনই আসিয়া শ্রীমকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া অনুমতি লইয়া বাহিরে যান। ফিরিয়া আসিয়াও তাহাই করেন। কয়েকবারই এইরূপ আচরণ করিতে দেখা গিয়াছে।

একজন ভক্ত (স্বগত) — শরৎ মহারাজের এরূপ আচরণের উদ্দেশ্য কি লোকশিক্ষা ছাড়া? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, গৃহী ও সন্ন্যাসীর ভিতর যে অলৌকিক প্রেমসম্বন্ধ রহিয়াছে, যাহা অন্যত্র বিরল গুরুভাইদের ভিতর, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম-পরিবারের সকলের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। তবুও এই লৌকিক আচরণ কেন?

স্বামী প্রেমানন্দকে এইরূপ আচরণ করিতে দেখা গিয়াছে। এই মহাপুরুষগণের আচরণ অসাধারণ। স্বামী প্রেমানন্দ কখনও শ্রীমকে একেবারে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতেন।

একবার ঠাকুরের জন্মতিথিতে শ্রীম বেলুড়মঠে গিয়াছেন। শরীর খারাপ। ঠাকুর দর্শন ও প্রণাম করিয়া কিছু জলযোগ করিবেন। সঙ্গে ছিল খই। দই চাই। হেমেন্দ্রকে (পরে স্বামী সদ্ভাবানন্দ) বলিলেন ভাঁড়ারে দই আছে কিনা দেখিতে। হেমেন্দ্র ফলমিষ্টির ভাঁড়ারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দই আছে কিন্তু এখনও ভোগে উঠে নাই। ফিরিয়া যাইতেছে হেমেন্দ্র। স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরঘর হইতে নামিয়া হেমেন্দ্রকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন — হেমেন্দ্র, কি জন্য এসেছিলে ভাঁড়ারে? হেমেন্দ্র সব কথা বলিলে তিনি ঠাকুর-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া এক হাঁড়ি দই হাতে লইয়া ঠাকুরের ছবির কাছে যুক্ত করে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধরিয়া রাখিলেন। তারপর হেমেন্দ্রের হাতে ঐ হাঁড়ি দিলেন। শ্রীম গঙ্গার ধারে আমতলায় বসা।

এদিকে ঠাকুর-ভাঁড়ারীকে ভাবে গদগদ হইয়া স্বামী প্রেমানন্দ বলিতে লাগিলেন, আজ একটা মহা অন্যায় কার্য থেকে ঠাকুর আমাদের রক্ষা করলেন। জানিস্, এঁরা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। এঁদের মুখ দিয়ে ঠাকুর খান। পড়িস্ নি 'কথামৃতে' ঠাকুর বলছেন, এঁদের খাওয়ালে হাজার সাধু খাওয়ানোর সমান হয়। ইনি রামকৃষ্ণাবতারে বেদব্যাস আর নারদমুনি একাধারে! দিবানিশি ঠাকুরের কথামৃত নির্ঝরের মত এঁর মুখ থেকে নির্গত হয়। আজ বড় একটা ত্রুটির হাত থেকে ঠাকুর বাঁচালেন।

ভক্ত আরও ভাবিতেছেন, লৌকিক দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীই গৃহীর প্রণম্য। এখানে এই বিপর্যয় কেন? কয়েকবারই এইরূপ আচরণ দেখিয়াছি। ভক্তের মনে এই প্রশ্ন অনেকবার উঠিয়াছে। আজ স্বামী সারদানন্দের

কথায় — 'দাদাকে প্রণাম করছি' — ঐ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল। ভক্ত আজ বিস্ময়ে ভাবিতেছেন — ও ও, এঁরা দেখিতেছি সন্ন্যাসীর বাহ্য আচরণ হইতেও আন্তরিক সম্বন্ধকে অধিক মূল্যবান মনে করেন!

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। ইঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ। পরস্পর পরস্পরকে ভাইয়ের মর্যাদা প্রদান করেন। সকলেই ঠাকুরের সন্তান। আর শ্রীম বয়সেও বড়, ঠাকুরের কাছে যানও আগে। আহা, কি প্রেম-সম্পর্ক ইঁহাদের মধ্যে! প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি হইলেও, প্রত্যেকেই নিজ মতকে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করিলেও, ঠাকুরের সম্পর্কে সকলে একমত। সকলে তাঁহার সন্তান। এই মর্যাদা ইঁহারা সর্বদা রক্ষা করেন। এই সকল মহাপুরুষগণ শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের লীলা-সহচর। তাঁহার নাম ও মহাবাণীর প্রচারক। ইঁহারা সকল লোকব্যবহার রক্ষা করেন। তবে অন্য লোকও তাহা শিক্ষা করিবে তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া।

শ্রীম প্রায় কাহাকেও চরণ স্পর্শ করিতে দেন না — সন্ন্যাসীকে তো নয়ই। কেহ কখনও জোর করিয়া চরণ স্পর্শ করিলে বলেন, এতে আমার কষ্ট হয়। সন্ন্যাসী যদি এরূপ করেন, তখন বলেন, আহা, গেরুয়া পরে এ করতে নেই।

ভক্ত আরও ভাবিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞের পূজা ও প্রণাম ভারতীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ বেদানুমোদিত। ভূতিকাম ব্রহ্মজ্ঞের পূজা করিবে, ইহা বেদের অনুশাসন। পুরাণেও তাহারই অনুবর্তন দৃষ্ট হয়। আচার্য শংকর প্রতিষ্ঠিত বুনিয়াদি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েও এই রীতি প্রচলিত। নিত্য গুরু প্রণামে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ব্রহ্মজ্ঞানের দশজন আচার্যের মধ্যে বশিষ্ঠ, শক্তৃ, পরাশর ও ব্যাসকে প্রণাম করেন। তাঁহারা সকলেই গৃহাশ্রমী। আবার, আজন্ম সন্ন্যাসী জ্ঞানঘনমূর্তি শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞ গৃহাশ্রমী জনকের চরণে প্রণত।

আজ ভক্ত অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষিত একটি সিদ্ধান্ত লাভ করিলেন। তিনি বুঝিলেন, ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ যেখানেই থাকুন গৃহে বা প্রব্রজ্যায়, গৃহী বা সাধু, সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণের প্রণম্য!

শ্রীম এক মিনিটের জন্য উঠিয়া আসিয়া অন্তেবাসীর কানে কানে বলিলেন, আফিসে গোপেনবাবুকে বলে আসুন, কথামৃত প্রথম ভাগ যেন

চার শ' দেওয়া হয় দপ্তরীকে বাঁধতে। চতুর্থ ভাগ পরে দেওয়া হবে। আর আপনি দশটা বড় রসগোল্লা আর দশটা টাটকা সিঙ্গাড়া নিয়ে আসুন।

ইতিমধ্যে স্বামী সারদানন্দ আনীত মিষ্টি ও কমলালেবু মোটর হইতে আনাইয়া শ্রীমকে দেওয়া হইল। শ্রীম অন্তেবাসীকে কহিলেন, রেখে দাও। ঠাকুরকে দেওয়া হবে।

রসগোল্লা ও সিঙ্গাড়া স্বামী সারদানন্দের সম্মুখে ধরা হইলে উনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। এক টুকরা রসগোল্লা ও এক টুকরা সিঙ্গাড়া ভাঙ্গিয়া লইয়া প্রণাম করিয়া মুখে দিলেন। বাকী মিষ্টি সাধুদের হাতে হাতে দেওয়া হইল।

এখন দুই গুরুভ্রাতা গুরু পরিবারের কথা আনন্দে আলোচনা করিতেছেন। সাধারণ লোক আলোচনা করে তাহাদের নিজেদের পরিবারের কথা। ঠাকুর ও মায়ের সম্পর্কিত যে যেখানে আছেন তাঁহাদের কথা হইতে লাগিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারপাল। তাই শ্রীম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (মায়ের পালিতা কন্যা ভ্রাতুষ্পুত্রী) রাধু কোথায় আছে? তার শরীর ভাল তো? মামারা কেমন? তাঁরা মাকে চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভুলে যেতেন। এক একবার বলতেন, জগদম্বা। জয়রামবাটীতে তো তুমি মায়ের মন্দির করলে। কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দিরের কি হলো? 'ওরা জায়গা ছাড়তে চায় না। হবে পরে। আমরা দেখতে পাবো না' — স্বামী সারদানন্দ বলিলেন।

এইবার বিদায়। স্বামী সারদানন্দ বায়ু পরিবর্তনের জন্য ৺পুরী ধামে যাইবেন। সকলে উঠিলেন। শ্রীম আগে চলিলেন, তারপর স্বামী সারদানন্দ, তারপর সাধু ভক্তগণ। সকলে মোটরের সামনে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছেন। পুনরায় ঠাকুরের ভক্তগোষ্ঠীর কথা উঠিল। ইঁহাদের কথা আর ফুরায় না। সকলে মোটরে উঠিয়া বসিলেন। পুনরায় শ্রীম বলিতেছেন, গোলাপ মা যেদিন প্রথম যান ঠাকুরের কাছে, সেদিন উনি চলে আসতে চাইলেন একা। ঠাকুর বললেন, 'বসো, ওদের সঙ্গে গাড়ীতে যেয়ো। বড় ধূপ' আহা, কি ভালবাসা! মাথায় বায়ুর রোগ ছিল কিনা। তাই একা আসতে দেন নাই। একটু বকতেন মাঝে মাঝে। কিন্তু কি ভালবাসা ঠাকুর ও মায়ের উপর।

উভয় পক্ষের যুক্তকরে প্রণামান্তর মোটর ছাড়িয়া দিল।

৩

শনিবার। অপরাহ্ন। ছাদে অনেক ভক্ত একত্রিত হইয়াছেন। শীতকাল, তাই সকলে রৌদ্রে বসিয়াছেন। ভাটপাড়ার ললিত রায়, ভোলনাথ মুখার্জী (ভবরাণী), প্রতি শনিবার আফিসের ফেরৎ শ্রীমকে দর্শন করিয়া যান। শ্রীম-র আজ বিশ্রাম হয় নাই। তবুও ভক্তগণ আসায় ছাদে আসিয়া বসিলেন।

ইতিমধ্যে কুঞ্জবাবু আসিলেন। আগামী কাল ইটালীতে (ইন্টালীতে) উৎসব অর্চনালয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয় ঠাকুরের ভক্ত দেবেন মজুমদারের স্থাপিত। তিনি সপার্ষদ শ্রীমকে উৎসবের নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। শ্রীম কুঞ্জবাবুর সহিত উৎসব, অর্চনালয় ও মজুমদার মহাশয়ের সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতেছেন। শ্রীম বিস্ময়ে বলিতেছেন, তাইতো কি দ্রব্য ঠাকুরের কাছে ভক্তরা লাভ করেছিলেন যাতে সকলে কেনা হয়ে রইলেন? তাঁর কাছে যাঁরা গিছলেন, যিনি যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁর গুণগান, তাঁর সেবা ছাড়া তাঁদের অন্য অবলম্বন নেই। অবতার যখন আসেন তখনই উহা সম্ভব। তাঁদের আত্মাকে ঠাকুর দেহ থেকে উঠিয়ে নিয়ে ব্রহ্মলোকে বিসর্জন করে দিয়েছেন। এখানে সূর্যাস্ত হয় না। সদা দীপ্তিমান্। 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' (কঠো ২:২:১৫) কি করে মানুষ বোঝে তাঁকে? অত আবরণে ঢাকা।

ভক্তরা কেহ কেহ টিনের ঘরে বসিয়া এই সব প্রসঙ্গ শুনিতেছেন। অন্তেবাসী নিবিষ্ট মনে চৈতন্য-লীলামৃত পড়িতেছেন। শ্রীম আদেশ করিয়াছেন আগামী কাল তাঁহাকে রবিবাসরীয় সৎপ্রসঙ্গ সভাতে বক্তৃতা দিতে হইবে। বিষয় 'নিত্যানন্দ'। তিনি তাই নিত্যানন্দচরিত অধ্যয়ন করিতেছেন।

রাত্রি সাতটা। এবারের ভক্ত মজলিশ সিঁড়ির ঘরে। জানুয়ারীর শীতে ছাদে বসা অসম্ভব। নিত্যকার ভক্তগণ আসিয়াছেন — বড় জিতেন, ছোট জিতেন ও ছোট অমূল্য, ডাক্তার বিনয় ও জগবন্ধু, বলাই সুখেন্দু ও শান্তি, রমণী 'ব্রুকবণ্ড' ও ছোট রমেশ, শুকলাল ও মনোরঞ্জন প্রভৃতি। শুকলাল

আজ কয়েকদিন পর আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ধর্মপত্নী দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীম তাই তাঁহাকে সস্নেহে ডাকিয়া আনিয়া কাছে বসাইলেন। আর নানা রকম সান্ত্বনা দিতেছেন। ইতিপূর্বে তাঁহার স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিবার সময়ও মাঝে মাঝে জগবন্ধুকে বেলেঘাটা পাঠাইয়া তাঁহার অসুখের সংবাদ লইতেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, লক্ষ্য শুকলাল) — কত বড় শোক মনে কর। সারাজীবন এক সঙ্গে থাকা যাচ্ছে, ভালমন্দ শোকতাপ এক সঙ্গে ভোগ করা হচ্ছে, সারা জীবনের এই companion (সঙ্গিনী) চলে গেলে কত দুঃখ! গৃহ তো গৃহিণীকে নিয়েই কি না — 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'।

শুধু তো চলে গেল বলে দুঃখ নয়। আবার ছেলেপুলের জন্য কষ্ট। ছোট থাকলে এদের মানুষ করা। বড় হলেও বাপকেই মায়ের কাজ করতে হয়। তাদের খাওয়া পরা সবের খবর নিতে হয়। কম শোক!

তাই তো ঠাকুর আগে থেকেই ভক্তদের সাবধান করে দিতেন, পরিজনদের আপনার মনে করতে নেই — ভগবানের। কারণ, জানতেন কি না, চলে গেলে তখন দারুণ শোক হবে। বস্তুতঃ তো তাই। তিনিই তো সব হয়ে রয়েছেন।

ঈশ্বরবুদ্ধিতে সংসার করলে কিছু কম হয় শোক দুঃখ — এই যা। পিতামাতা ভ্রাতাভগিনী — সব তিনিই এইরূপে রয়েছেন। এই ভাব আরোপ করলে ক্রমে দুটি সম্পর্ক হয়ে যায় — একটি স্নেহের, অপরটি শ্রদ্ধার। ক্রমে স্নেহের সম্পর্কটি কমবে, শ্রদ্ধারটি বাড়বে। কাশীর দিকে যত এগুবে, হাওড়া থেকে তত দূরে যাবে — ঠাকুর বলতেন। তা হলেই গৃহ অনেকটা আশ্রম হয়ে গেল।

যদি মনে করা যায়, আমরা আশ্রমে আছি, ঈশ্বরই এখানকার মালিক, আমরা সকলে তাঁর সেবকমাত্র, তা' হলে উহা আশ্রমই হয়ে যায়। ঠাকুর ভক্তদের এই সঙ্কেতটি শিখিয়ে দিছলেন। কেউ কেউ সংসারে থেকেও আশ্রমে আছি মনে করে, তাঁর ভক্তরা। জানতেন কি না, পরে অনেক ভক্ত আসবে। তাই তাদের শান্তির জন্য আগে থেকেই কতকগুলিকে ঐ ভাবে তৈরী করে গেছেন। এদের দেখে পরে যারা আসবে তারা শিখবে।

আমরা সংসারে কত ঝঞ্ঝাট নিয়ে রয়েছি। দেখুন না, ষোল আনা

মন দিয়ে সব সংসার করছি। বাপ মা পুত্র কন্যা, সব দিয়ে একেবারে ভুলিয়ে রেখেছেন। কি অবস্থায় আমাদের রেখেছেন ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। বস্তুতঃ এরা কেউ আপনার নয়। অথচ ঐ রকম সব আপনার করে রেখে দিয়েছেন। এক একবার একটু জ্ঞান হয়, আবার অমনি ভুলিয়ে দেন। কাউকে একেবারেই ঐ জ্ঞান দেন না। একেবারে ভুলিয়ে রাখেন।

আবার কতকগুলিকে সংসার ছাড়িয়ে নিয়েছেন। কেন? তবে যদি এদের দেখে ওদের একটু চৈতন্য হয়। এ সবই তাঁর planned programme (সুকল্পিত কার্যক্রম)।

কতকগুলিকে একেবারে ভুলিয়ে রেখেছেন। কতকগুলিকে সংসারে রেখেছেন বটে, কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছেন এসব কেউ আপনার নয়। কেবল ঈশ্বরই আপনার আর কতকগুলিকে সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই সত্য — এই জ্ঞান দিয়ে ঘরের বার করে নিয়েছেন। কেন করেছেন এরূপ? তবে চৈতন্য হবে, একজনকে দেখে অপরের। মা ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙ্গেন, ঠাকুর বলতেন।

শ্রীম কিছু দীর্ঘ সময় নীরব। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই কলকাতা শহর। কত লোক রয়েছে। কতজনে কত কথা বলছে এটা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এখানে দিনরাত কথা হচ্ছে। এ সবই এদিককার কথা, বিষয়ের কথা। কত রকমের কথা। এর দাম শূন্য — zero, nothing — সব হাব্‌জা গোব্‌জা কথা।

দুটি জিনিস মূলে। একটি ঈশ্বর, আর একটি জগৎ। এই জগৎ থেকেই তৃতীয় একটি পদার্থ বের হয়েছে। সেটি 'আমি'। এই 'আমি'ই জগৎ। এই 'আমি'টা projected (প্রসারিত) হয়ে আরও অনেকগুলির সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়েছে। আমার মা-বাপ, ভাই-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, স্বজন আবার আমার দেহ-মন-বুদ্ধি, গৃহ-ধন-ঐশ্বর্যাদিরূপে সম্মুখে প্রসারিত। এই সবের ভালতে আমার ভাল, মন্দে আমার মন্দ। দিনরাত, জন্মজন্ম, অনন্তকাল আমার সঙ্গে এরা জড়িত থাকায় — 'আমি' জীব, কখনও দুঃখী, কখনও সুখী। এইরূপে জন্মজন্ম সুখ ও দুঃখের আবর্তে পড়ে যখন জীব অশান্ত হয়, তখনই সত্যিকার 'আমি'র খোঁজ হয়। তখনই প্রশ্ন হয় এমন কোন স্থান আছে কি যেখানে সুখদুঃখের আবর্তন নাই? ভগবান

গুরুমুখে, বেদমুখে উত্তর দেন। হাঁ, আছে এমন স্থান। সেখানে চির সুখশান্তি পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে 'আমি' — ঈশ্বর। আমায় ধরলে আর আবর্তনে পড়বে না। দিনরাত সংসারে আবর্তনের ভিতর থেকেও মনের শান্তি-সুখ অব্যাহত থাকবে।

এই মূল 'আমি'র, ঈশ্বরেরই — মানুষ সংস্করণ ঠাকুর। তিনি বলেছেন, আমি মায়ের কৃপায় সংসার জয় করেছি। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য এঁরা সকলেই সংসার জয় করেছেন।

ঠাকুরের ভিতর দুটি রূপ, একটি মানুষ, ভক্ত — অপরটি ভগবান। ভক্তরূপে তিনি মায়ের ছেলে। এইরূপেই তাঁর নরলীলা। বলেছেন, আমায় ধর। আমি এই মায়ার বেড়াজাল থেকে বের করে নিয়ে যাব তোমায় চির শান্তিসুখময় আনন্দধামে।

বলেছেন, তোমার 'আমি'টা আমার সঙ্গে বেঁধে দাও. আমার দাস হয়ে থাক যেমন বড় ঘরের দাসী থাকে। তা হলে অবিদ্যা-মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে — আর পথ নাই।

ঈশ্বর জগৎ জীব অর্থাৎ 'আমি' — এর মধ্যে 'ঈশ্বর' সত্য, বাকী দুটো 'জগৎ, জীব' অনিত্য। বলেছেন, এক হাতে আমায় ধর, আর এক হাতে সংসার কর। সময় হলে দু' হাতেই আমায় ধরবে — ঈশ্বরকে। 'আমাকে ধর' মানে, আমার বিদ্যামায়ার আশ্রয় নাও। আমার ধ্যান জপ পূজা পাঠ কর। সাধুসঙ্গ কর, অর্থাৎ যারা আমাকে জেনেছে তাদের সঙ্গ কর। অথবা জানার জন্য যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে দাঁড়িয়েছে, তাদের সঙ্গ কর। তা' হলে অবিদ্যামায়ার ভিতরে থেকেও বিদ্যামায়ার কৃপায় পথভ্রষ্ট হবে না।

কথাটা হচ্ছে এই, ঈশ্বর জগৎ জীব — এই তিনটে জিনিস। জীবকে অবিদ্যামায়া টানছে তার অধীন হতে। বিদ্যামায়ার অর্থাৎ অবতারের আশ্রয় নিলেই জীব বেঁচে গেল। ক্রমে শিব হয়ে যাবে।

অসত্য জগতে অপেক্ষাকৃত সত্য অবতার। তাঁকে ধর। তা হলে মূল সত্যে পৌঁছে যাবে। 'আমি'টার অপপ্রয়োগে জীব। সুপ্রয়োগে শিব। একেই বলে মুক্তি।

ঠাকুর তাই বলেছিলেন, অনেক কথা ছেড়ে এক কথা নিয়ে থাক

— অবতারের কথা। এতে অবতারে ভালবাসা হয়। তাতেই মুক্তি।

দুটোই তিনি করে রেখেছেন — বন্ধন ও মুক্তি। যদি বল কেন করলেন এ দুটো — একটা করলেই তো হতো? তা হলে এই দুঃখ শোক অশান্তি থাকতো না। তার উত্তর, তা হলে লীলা, অর্থাৎ খেলা হয় কিরূপে? তাঁর খেলা তিনি খেলুন। তুমি তা দেখতে যেয়ো না। মাথা গুলিয়ে যাবে। অর্জুন একটু দেখে একেবারে 'বেপথুঃ' হয়ে গেলেন। তোমার কর্তব্য — তাঁকে ধরে, তাঁর ব্যবস্থাকে আশ্রয় করে, ঠাকুরকে ধরে, এই খেলার বাইরে চলে আসা — যেখানে খালি সুখ শান্তি আনন্দ। এটাই মুক্তি।

যিনি বেঁধেছেন তিনিই আবার মুক্তির উপায় বলে দিয়েছেন। বলেছেন, আমার চিন্তা কর। আমার কথা কও দিবানিশি। তা হলে তুমি সকল দুঃখের পারে যেতে পারবে আমার সঙ্গে। তখন চির শান্তিময় ধামে বিরাজ করবে।

আমাদের এমন হয়ে গেছে, এক রকম ছেলেবেলা থেকেই, তাঁর কথা ভেবে ভেবে অন্য কথা মনে থাকে না। কেবল তাঁর কথাই মনে থাকে। বেদ তাই সাধককে বলেছেন, 'অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ'। (মুন্ডক ২:২:৫)

ঠাকুর বলেছিলেন আমাকে, এক জানার নাম জ্ঞান, আর অনেক জানার নাম অজ্ঞান। অর্থাৎ, এক ভগবান সত্য, জগৎ অনিত্য।

আপনারা তাঁর এই সব মহাবাক্য ভাবতে ভাবতে ঘরে যান।

রাত্রি দশটা।

মর্টন স্কুল কলিকাতা,
১০ই জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীঃ। ২৬শে পৌষ, ১৩৩১ সাল।
শনিবার। পূর্ণিমা, ৪ দণ্ড। ৪ পল, পরে প্রতিপদ।

নবম অধ্যায়

মানুষ তো ষোল আনা মানুষ

১

মর্টন স্কুল। আফিস ঘর। শীত কাল। বেলা পৌনে এগারটা। শ্রীম অধ্যক্ষের চেয়ারে বসিয়া আছেন। কথামৃতের প্রুফ দেখিতেছেন। কপি পড়িতেছে গদাধর।

একজন যুবক ও ছোট নলিনী আসিয়া শ্রীম-র কাছে অনুমতি লইতেছেন। যুবক শ্রীম-র কাছে থাকেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — আপনারা কতদূর যাবেন?

যুবক — এখন গিয়ে খাব। তারপর বেলেঘাটা যাব। ওখানে এইগুলো একজনকে দেব। তারপর যাব ইটালীতে (ইন্টালীতে) অর্চনালয়ে উৎসব দেখতে।

শ্রীম — এইগুলো কি?

যুবক — ঠাকুরদের আরতির পঞ্চপ্রদীপ আদি।

শ্রীম — কোথাকার জন্য?

যুবক — দেশের বাড়ির জন্য। সেখানে নিত্যপূজা হয়।

শ্রীম — আচ্ছা, আসুন তা হলে।

হ্যারিসন রোডে বান্ধব বোর্ডিং-এ খাইয়া যুবক বেলেঘাটা গেলেন। উড়িষ্যার পাণ্ডা মানগোবিন্দের হাতে এইগুলি দিয়া তিনি অর্চনালয়ে গেলেন। মানগোবিন্দ ময়মনসিংহ যাইতেছে।

অর্চনালয়ে ঠাকুরের নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদি হয়। ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ইহা স্থাপন করিয়াছেন। মজুমদার মহাশয় মহাপ্রয়াণ করিলেও তাঁহার হাতেগড়া ভক্তগণ আজও অতি সযতনে তাঁহার নির্ধারিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিতেছেন।

আজ এখানে ঠাকুরের বিশেষ উৎসব। বেলুড় মঠ ও তাহার শাখাকেন্দ্র হইতে সাধুগণ আসিয়াছেন। গদাধর আশ্রম হইতে আসিয়াছেন স্বামী

গিরিজানন্দ, নীলকণ্ঠ মহারাজ ও ব্রহ্মচারী মনু। স্বামী গোপালানন্দ, সুরেন মহারাজ প্রভৃতি পাঁচ ছয়জন সাধু ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন বেলুড় মঠ হইতে।

বিরাট ভোগের পর ভক্তগণের সঙ্গে সাধুরা প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন পাশের বাড়ির ছাদে। খিচুড়ি, কয়েক রকম তরকারী, দই মিষ্টি ভোগে লাগিয়াছে। এখন বেলা দুইটা।

মর্টন স্কুল হইতে শ্রীম আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রায় তিনটায় ডাক্তার বক্সীর মোটরে। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন বিনয়, ছোট অমূল্য ও মনোরঞ্জন। তাঁহাদের পূর্বে আসিয়াছেন জগবন্ধু, ছোট নলিনী ও সত্যবান। ইহারও পরে আসিলেন সুখেন্দু, বলাই প্রভৃতি।

এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় খ্রীস্টান ভক্তগণও ইহাতে যোগদান করেন এবং সকলের সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পান।

প্রসাদ পাইবার পূর্ব পর্যন্ত ভক্ত কৃষ্ণ মনপ্রাণ ঢালিয়া সঙ্গীতের পর সঙ্গীত গাহিয়াছেন। সকলই মজুমদার মহাশয়ের রচিত।

শ্রীম সাধু ও ভক্তদের ভোজন দর্শন করিয়া ছাদ হইতে নামিলেন। আর ঠাকুরঘরের সম্মুখে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। অল্পকাল মধ্যে সেখানে ভীড় লাগিয়া গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া শ্রীমকে দর্শন ও প্রণাম করিবার জন্য সাধু ও ভক্তগণ সব একত্রিত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র স্থান, ভিড়ে শ্রীম-র কষ্ট হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ আসিয়া শ্রীমকে লইয়া গেলেন উৎসবমণ্ডপে। বেশ প্রশস্ত স্থান। প্রথমে শ্রীম ঠাকুরকে ছাড়িয়া যাইতে চান নাই। কৃষ্ণ বলিলেন, আজ আসরেই ঠাকুরের পূজা হইয়াছে। ঠাকুরের উৎসব-বিগ্রহ ওখানে আছে।

এ স্থান উন্মুক্ত। শ্রীম উত্তরাস্য বসিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখেও খোলা দরজা, পশ্চাতেও দরজা আড়াই হাত দূরে। বায়ুর অবাধ গতি এখানে। তাই শ্রীম স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময়।

কৃষ্ণ পুনরায় দলবলসঙ্গে ভজন গাহিয়া শ্রীমকে আপ্যায়িত করিতেছেন। তাঁহার হাতে করতাল। ফ্লুট, হারমোনিয়াম ও খোল সঙ্গে সঙ্গে বাজিতেছে। কৃষ্ণের উচ্চকণ্ঠের সুমধুর উদ্দীপনাময় ভজন-সঙ্গীতে স্থানটি যেন শান্তি ও আনন্দধামে পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণ, মজুমদার

মহাশয়ের কৃপায় সঙ্গীতসিদ্ধ। সুমধুর সঙ্গীতের মধুময় রাগিণীকে আশ্রয় করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী কিছুকালের জন্য ভাবসাগরে নিমগ্ন। শ্রীম স্তিমিত লোচন, নিস্পন্দ দেহ। গান মাত্র দুইটি হইল কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া হইল।

গান। কে তোমারে চিনতে পারে, তুমি না জানালে পরে।
বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত, খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে॥
যাগযজ্ঞ তপোযোগ, সকলই হয় কর্মভোগ,
কর্ম তোমার মর্ম কি পায়, তুমি সর্ব কর্ম পারে॥
সৃষ্টিজোড়া তোমার মায়া, কায়া নাই কেবলি ছায়া,
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা, ঘুরে সারা চারিধারে॥
তুমি প্রভু ইচ্ছাময়, যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
অসাধ্য সুসাধ্য তার, তুমি কৃপা কর যারে॥
তব কৃপা আশা করি, রয়েছি জীবন ধরি,
কৃপানাথ কৃপা করি, এস বস হৃদ্‌মাঝারে॥

গান। ভবভয়ভঞ্জন, পুরুষ নিরঞ্জন, রতি পতিগঞ্জনকারী।
যতিজনরঞ্জন, মনোমদখণ্ডন, জয় ভববন্ধনহারী॥
জয় জনপালক, সুরদলনায়ক, জয় জয় বিশ্ববিধাতা।
চির শুভসাধক, মতিমল-পাবক, জয় চিত-সংশয়ত্রাতা॥
সুরনরবন্দন, বিজর বিবন্ধন, চিতমন-নন্দনকারী।
রিপুচয়-মন্থন, জয়ভবতারণ, স্থলজলভূধরধারী।।
শমদম-মণ্ডল, অভয়নিকেতন, জয় জয় মঙ্গলদাতা।
জয় সুখসাগর, নটবর নাগর, জয় শরণাগত-পাতা॥
ভ্রম-তম-ভাস্কর, জয় পরমেশ্বর, সুখকর-সুন্দর-ভাষী।
অচল সনাতন, জয় ভবপাবন, জয় বিজয়ী অবিনাশী॥
ভকত-বিমোহন বরতনুধারণ, জয় হরিকীর্তনভোলা।
গদগদ ভাষণ, চিতমনতোষণ, ঢলঢল নর্তনলীলা
মতিগতি বর্ধন, কলিবলমর্দন, বিষয়বিরাগ-প্রসারী।
জড় চিত-চেতক, ভবজলভেলক, জয় নরমানসচারী॥
জয় পুরুষোত্তম, অনুপম সংযম, জয় জয় অন্তরযামী।
খরতর সাধন, নরদুঃখবারণ, জয় রামকৃষ্ণ নমামি॥

এই দুইটি অমর সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা যেন শ্রীম-র মানসনয়নে পুনরায় জীবন্ত হইয়া উঠিল। শ্রীম পুনরায় ঐ দিব্য লীলামৃত পানে নিমগ্ন। বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়। মুখমণ্ডলে আনন্দের স্নিগ্ধ ছটা। গায়ক যখন গাহিলেন — 'জয় পুরুষোত্তম, অনুপম সংযম, জয় জয় অন্তরযামী।' — তখন গম্ভীরাত্মা শ্রীম-র সুগভীর ভাবের বাঁধ ভঙ্গ হইয়া গেল আর শ্রীরামকৃষ্ণ যাহাতে বিশ্ব প্রতিবিম্বিত দেখিতেন, শালগ্রামসদৃশ উজ্জ্বল ও উন্নত অর্ধনিমীলিত প্রেমানুরঞ্জিত নয়নকমলের কোণ বাহিয়া সুমধুর ভাবামৃত নির্ঝরের ন্যায় মুক্তাপ্রভায় অবিরত বিগলিত হইতে লাগিল। এই দেবদৃশ্য ভক্তগণেরও হৃদয় স্পর্শ করিল। ভজন সমাপ্ত হইল। কিন্তু শ্রীম নিশ্চল। ভক্তগণ নিশ্চল হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর শ্রীম সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন।

এখন অপরাহ্ন পাঁচটা। শ্রীম ঠাকুর প্রণাম করিয়া ডাক্তারের মোটরে গিয়া বসিলেন। কৃষ্ণ প্রমুখ ভক্তগণ আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিয়া এক চ্যাঙ্গারি প্রসাদ দিলেন। কুঞ্জবাবু উপহার দিলেন, ঠাকুরের প্রসাদী একটি সুগন্ধ ফুলের তোড়া। মোটরে শ্রীম-র সঙ্গী হইলেন ডাক্তার, ছোট অমূল্য ও গদাধর। আর পদব্রজে চলিলেন জগবন্ধু, বিনয় ও মনোরঞ্জন এবং বলাই, সুখেন্দু ও ছোট নলিনী। পথিমধ্যে হ্যারিসন রোড ও মির্জাপুরের মোড়ে ভক্তগণ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন বিনয়ের অপেক্ষায়। বিনয় গিয়াছেন বৃদ্ধ ভক্ত ইঞ্জিনিয়ার গগন বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করিতে।

মর্টন স্কুল। রাত্রি এখন সাতটা। ভক্তসভা বসিয়াছে দ্বিতলের বারান্দায়। সকলেই বেঞ্চে উপবিষ্ট। শ্রীম আজের উৎসব দর্শনের কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি সুন্দর লাগলো আজ! যেন ঠাকুর বসে আছেন ওখানে। উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আর কৃষ্ণের কি গান! মহাপুরুষদের শোনালে শক্তি বাড়ে। তাই অতি মিষ্টি। সর্বদা মজুমদার মশায়কে শোনাতো কিনা। আবার মঠে ঠাকুরের সন্তানদেরও শোনায়।

আহা, রচনা কি মনমুগ্ধকর! যার ভেতর যে গুণটি আছে সেটি ধরে ঠাকুরের ভাব প্রকাশ হচ্ছে। ঠাকুরই তো অন্তর্যামীরূপে সকলেরই ভিতর রয়েছেন। কিন্তু যার মন শুদ্ধ হয়েছে সেই শুদ্ধ মনের ভিতর দিয়ে তাঁর স্বরূপের আনন্দ প্রকাশ হয়।

নানারূপে স্বরূপানন্দ প্রকাশ হয়। গানে হয়, বাজনায় হয়। পেইন্টিং-এ হয়, কবিতায় হয়। গদ্যেও হয়, কথায়ও হয়। আর ভাস্কর্যে হয়, নৃত্যেও হয়।

এঁদের গানের ভিতর দিয়ে হয়েছে — গিরিশবাবু, মজুমদার মশায়।

বলেছিলেন, একই জল ছাদে পড়ছে। নানা প্রণালী দিয়ে নিচে আসছে। প্রণালীগুলি ভিন্ন। কোনটা মানুষ কোনটা দেবতা, কোনটা বাঘেরমুখ, ইত্যাদি। নানা প্রকৃতি। জল কিন্তু এক।

গানেও তাঁর পুজো হয়। রামপ্রসাদ পুজো করতেন এই উপকরণে। মজুমদার মশায়ও তাই।

দেখ না কি ভাব! একেবারে ভিতর বাড়িতে নিয়ে যায়। শুধু কবির কবিতাতে তা হয় না। মন প্রশান্ত হয় না। অনুভব থাকলে সেই গানের ঢং-ই আলাদা। সরস ভাব। কানে প্রবেশ করলে মনকে টেনে একেবারে তাঁর কাছে নিয়ে যায়।

২

মর্টন স্কুল। পৌষের শেষ। শ্রীম-র চারতলার কক্ষ। সকাল আটটা। শ্রীম বিছানায়, দক্ষিণ-পশ্চিমাস্য। বাম হাতে বেঞ্চে বসা অন্তেবাসী ও গদাধর। শ্রীম-র হাতে উপনিষদ্ সংগ্রহ — 'ব্রাহ্মধর্ম'।

শ্রীম বৈদিক গুরুগম্ভীর সুরে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন —

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ (ঈশ ১)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঈশ্বরই বিশ্বরূপ ধরে আছেন। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সৃষ্ট, তিনিই আবার অন্তর্যামীরূপে পরিচালক। ঠাকুর এই সত্য দেখেছিলেন নিজ চোখে। বলতেন, 'আমি কি বিচার করবো? দেখছি সব তিনিই হয়ে রয়েছেন।'

যদি প্রশ্ন হয়, তা যদি হয় তিনিই সব, তবে আমরা দেখছি না কেন? এর উত্তরও ঠাকুর দিলেন — মন অশুদ্ধ, কামিনীকাঞ্চনে ডুবে আছে। একে যদি শুদ্ধ করতে পার তবে ঐ তত্ত্ব দর্শন হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরই সব।

বলেছিলেন, বিদ্যা ও অবিদ্যামায়ার সহায়তায় ঈশ্বর এই জগৎ

পরিচালনা করছেন। অবিদ্যামায়ায় দৃষ্টি জগতে টেনে রেখেছে কামিনীকাঞ্চনে। তাই তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। একেই বলে বদ্ধাবস্থা। আবার বিদ্যামায়ার সহায়ে এই অবিদ্যামায়া দূর হলে তখন মোক্ষ।

একজন সাধক দেখেন তিনটি জিনিস — ঈশ্বর, জগৎ আর জীব, অর্থাৎ 'আমি'। অবিদ্যামায়া এই 'আমি'-টাকে টেনে নিয়ে নিজের কাজে লাগায়। তাই লোকে বলে, আমার বাপ-মা, আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আমার বাড়িঘর, ধন, ঐশ্বর্য ইত্যাদি। এই 'আমি'-টাকে শত স্থানে mortgage (বন্ধক) দিয়েছে। এটাই বদ্ধাবস্থা। বেদ বলেছেন, মানুষের নিজের স্বরূপ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', ভগবানের সন্তান।

এই 'আমি'টাকে যদি ঈশ্বরের সঙ্গে মণ্ডিত করা যায়, তা হলে এই শত বন্ধন ছিন্ন হয়, তখন মুক্ত হয় জীব। বিদ্যা দিয়ে অবিদ্যাকে প্রতিরোধ করা। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে। তখন আর একটা কাঁটা দিয়ে এটাকে তুলে শেষে দুটোই ফেলে দেয়, ঠাকুর বলতেন। এ দুটোই নাশ হয়ে যায় — বিদ্যা অবিদ্যা। তখন মূল সত্যবস্তু, অর্থাৎ তাঁর দর্শন হয়।

'ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা', — অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা আত্মরক্ষা কর। মানে 'আমি' জীব যে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাংশ, এটা জানার নামই 'আত্মরক্ষা' করা। 'বড় ঘরের দাসীর মত সংসারে থাক', ঠাকুর বলতেন। সংসারের ভোগ না নেওয়া। শরীর ধারণের জন্য অবস্থানুসারে minimum (ন্যূনতম) ভোগ নেওয়া, যেমন বড় ঘরের দাসী নেয়। দিনরাত দাসী কাজ করে, কিন্তু গৃহিণী যা দেয় — আহার, বস্ত্রাদি তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। তেমনি থাক সংসারে।

এই শরীর ভোগ্য দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না। তাই ব্যবস্থা, কম ভোগ নেও। Enjoy to live, not live to enjoy, যাতে প্রাণ বাঁচে ততটা নেও। আর বাকী সময় শক্তি, চেষ্টা, ব্যয় কর — ঈশ্বরই সব হয়ে আছেন এটা জানতে। যে 'আমি'-টা সংসারে বদ্ধ করে, সেটার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া ঈশ্বরে — বেদবাক্য, অবতারের বাক্য শুনে।

'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'— এর মানে, অপরের কোনও প্রকার দ্রব্য নেবে না। অর্থাৎ, সত্যপথে থেকে নিজের উপার্জিত ধনের সামান্য মাত্র গ্রহণ করবে, বাকিটা ঈশ্বরার্থ সমর্পণ করবে। তা হলেই হলো — নিজের

ধনই যখন ভোগ করবে না তখন অপরের ধনের ভোগের কথা আসেই না।

মানুষের স্বাভাবিক ভাব, যত পার ভোগ কর। নিজের, আবার অপরের। এটা মানুষের নিম্ন অবস্থায় হয়, পশুর ন্যায় অবস্থা যখন থাকে। তিনটা অবস্থা মানুষের আছে কিনা — পশু, মানুষ ও দেবতা। দেবাবস্থায় যখন আরোহণ করতে চায় মানুষ তখন নিজের ধনে লোভ পরিহার করে। অপরের ধনেও যে তাই করবে তাতে আর কি সন্দেহ?

ধর্মজীবন, মানে এই misplaced (অপাত্রে ন্যস্ত) 'আমি'টাকে replaced (পুনরায় পূর্ব স্থানে রাখা) করা। এই সংগ্রামটাকে বলে ধর্মজীবন, ভাগবত জীবন, life divine, 'আমি'টা সংসারবন্ধন থেকে উঠিয়ে নিয়ে ঈশ্বরে বন্ধন। এরই পরিণতি মুক্তি। অর্থাৎ জীবের শিবত্ব লাভ।

৩

বিনয় ও ছোট অমূল্যের প্রবেশ। ছোট অমূল্যকে দেখিয়াই শ্রীম অতি আদরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বসাইলেন। বলিলেন, আসুন, আসুন। আপনার কথা মনে হচ্ছিল। বড়ই ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন।

ছোট অমূল্য হগ্ মার্কেটে অয়েলম্যান স্টোরে কর্ম করিতেন। ঐ কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন ধর্মানুশীলনের অবসর হইবে বলিয়া। আর কলিকাতায় একটি ছোট বাড়ি ছিল। ইহাও বিক্রয় করিয়াছেন টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া তাহার সুদে জীবিকা নির্বাহ করেন। ঘরে মা, স্ত্রী ও একটি কুমারী কন্যা। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ও আত্মীয় কুটুম্ব তাঁহাকে পাগল বলিতেও ছাড়ে নাই। শ্রীম তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। তাঁহার ভক্তি বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও বিনয়ে সকলে মুগ্ধ। সত্ত্বগুণী লোক নির্দোষ, শ্রীম বলেন। তিনি তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম (ছোট অমূল্যর প্রতি) — আপনি না হয় আর কত দিন যেমন কাজ করতেন তেমনি কাজ করুন। তবে ওরা জব্দ থাকবে। সত্তর টাকা মাইনে পাওয়া যেতো — তা ছেড়েছেন। ওরা এতে আপনাকে পাগল বলবে না তো কি! পাড়াগাঁয়ে দশ টাকা হলে একটা পরিবার চলে যায়।

এ মনে কর সত্তর টাকা। তাতে সাতটা পরিবার চলতে পারে। সংসারী লোকেরা চায় কী? চায় টাকাকড়ি, মান। এসব যাদের আছে তাদের ভয় করে।

(সহাস্যে) আপনি দিনকতক খুব ভাল কাপড় পরুন না! ঘড়ি টাঙ্গান। কি নাম বলে আজকাল? (একটু চিন্তা করিয়া) হাঁ, রিস্ট ওয়াচ।

কর্ম করলে ওরা ভয় পাবে। আর বলবে — বাবা, ও পাকা লোক! সংসারী লোক সংসারীদের ভয় করে।

তা না হলে — টাকা পয়সা এমন জিনিস যে উহা প্রাণ নিয়ে টানাটানি করে।

আর ওরা আপনার reversioner (উত্তরাধিকারী) কিনা, ভাইপোরা। ওদের interest (স্বার্থ) হচ্ছে, আপনাকে পার্টিশান করতে না দেওয়া। করতে গেলেই এইসব গোলমাল — যা এখন হচ্ছে। হয়তো ভাববে, রোজগার করতো, তাও গেল। এখন এগুলিও (অস্থাবর সম্পত্তি) যাবে। লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে।

ওরা তো (লক্ষ্মীছাড়া) বলবেই, এতে ওদের দোষ কি? ওদের কি সাধুসঙ্গ হয়েছে? আপনার মত কি শান্ত হয়েছে ওরা? তাই ওদের ওপর রাগ করতে নেই। মনে করতে হয়, ঈশ্বরই ঐরূপ করেছেন। এখন নিজের প্রাণটা কি করে বাঁচে তার চেষ্টা করা।

এই বরানগরে কি কাণ্ড হয়ে গেল। Adopted son (পোষ্যপুত্র) পিতাকে খুন করে দিলে। কি একটু বাধা দিছলেন বাপ, অমনি একেবারে খুন!

Interest (স্বার্থ) এমনি কাণ্ড! এতে হাত পড়লে মানুষ পশু হয়ে যায়। তখন হিতাহিত জ্ঞান চলে যায়।

তাই এখন আপনাকে সব দিক দেখে চলতে হবে tactfully (কৌশলপূর্বক)। আর প্রার্থনা করতে হবে, ওদের মন শান্ত করে দাও।

Tact (কৌশল) চাই সংসারে থাকতে গেলে, ঠাকুর বলতেন। তাই তো বললাম, না হয় আবার দিনকতক চাকরী করুন। আর বেশ ফিটফাট হয়ে চলনু।

তাই বলে, 'অর্থমনর্থং'। এই অর্থের জন্য, টাকার জন্য, কত কি হচ্ছে

সংসারে।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, 'আগে তোর বাড়ি ঠিক করে আয়'। শরিকদের সঙ্গে বিবাদ হচ্ছিল কিনা পার্টিশানের। তিনি জানতেন কিনা, বাড়ি ঠিক না থাকলে মন স্থির হবে না। তা হলে আর ধর্ম হয় কি করে? তাই তো ঠাকুর চলে গেলে গুরুর আজ্ঞাতে কত মামলা হলো। হাইকোর্টে পার্টিশানের suit (মোকদ্দমা) হলো।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এই সেদিন যোগেনবাবুকে বললাম, আপনি যাদের (উকীলদের) সাহায্য নিয়েছেন, আগে ওদের reformed (ঠিক) করে আসুন দেখি। তারপর এখানে (দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে) করুন।

ইনি খাজাঞ্চী কিনা দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর! কর্মচারীরা একটু এদিক সেদিক করে। ইনি তাতে বাধা দেন ভীষণভাবে। এ নিয়ে আবার উকীলদের সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করে থাকেন। তাই আমরা বললাম, আগে উকীলদের শুধরিয়ে আসুন, তারপর কর্মচারীদের শুধরাবেন।

উকীলগুলো কি নিয়ে রয়েছে। মিথ্যা মোকদ্দমা করা, মিথ্যা সাক্ষী তৈরী করা — এসব কাজ তাদের। আগাগোড়া মিথ্যা। জজেরা তা জানে। অবশ্য ভাল লোক নেই তা নয় — তবে তারা অত্যন্ত rare (বিরল)।

সারদাবাবু (হাইকোর্টের জজ) আমাকে বলেছিলেন, তুমি এখানে কেন? যত মিথ্যার আড্ডা এখানে। আমি হাইকোর্টে ডিফেন্স শুনতে গিছলাম। মাঝে মাঝে যেতাম। তাই বললেন ঐ কথা। উনি আমাদের পড়াতেন। তারপর উকীল হলেন হাইকোর্টে। তাই সব তাঁর জানা আছে।

কোনও উকীল হয়তো একজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে জিতিয়ে দিলে। আর নিজে সম্পত্তির চার আনা হিস্যা নিয়ে নিলে। এটর্নিরা যত সব মিথ্যা সাক্ষী জুটিয়ে দেয়। জজেরা কি জানে না এসব? কিন্তু কি করবে, law-এর (আইনের) technicality-র (কৌশল) ভিতর হয়তো ফেলতে পারছে না evidence (সাক্ষ্য)। তাই জেনে শুনে নিরপরাধকে সাজা দেয়, আর অপরাধী পুরস্কৃত হয়।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) — এইজন্যই তো আমি ইস্কুল রেখেছি।

আমাদের old friend-দের (পুরোনো বন্ধুদের) সঙ্গে দেখা হলে তারা জিজ্ঞাসা করে, ইস্কুলটা আছে তো? আমি বলি, হাঁ আছে। তবে এদের ভাল লাগে। ওরা ঐ নিয়ে আছে কিনা।

ইস্কুল থেকে একটা আয় হয়, আর একটা position-ও (সম্মানও) আছে। তার জন্যই তো আমি এসব নিয়ে আছি। এরা ভাবে তা হলে ঠিক আছে। ওরা সব মনে করে কিনা, যারা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল তারা পাগল। তাই ও-টি (ইস্কুল) আছে শুনলে ওদের বেশ লাগে।

শ্রীম (ছোট্ট অমূল্যের প্রতি) আপনি না হয় দিনকতক গিয়ে ঐ করুন, চাকরী নিন। কি করা যায়? তা বলে কি সারা জীবন করতে হবে? তা নয়।

জগবন্ধু — চৈতন্যদেবের গৃহস্থ পার্ষদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আর রায় রামানন্দ, এঁরা বুঝি এই জন্য বাবুগিরি রেখেছিলেন?

শ্রীম — বোধহয় তাই।

ভক্তরা বিদায় নিলেন।

বেলা দশটা। শ্রীম একটি ভক্ত শিক্ষকের সঙ্গে নানারূপ কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (শিক্ষকের প্রতি) — আপনি এইটে পড়ে রাখুন তো, এই ডায়েরীর রিপোর্ট, জগত্তারণ ও মাখনবাবু (শিক্ষকগণের) সম্বন্ধে। এসব confidential report (গোপন বিবরণ)। আপনি যদি কখনও administration-এ (কর্মপরিচালনায়) থাকেন, তাই এখন এইসব দেখে নিন্। শিখে রাখুন কি করে রিপোর্ট লিখতে হয়, আর inspection (পরিদর্শন) করতে হয়। স্কটিস্ চার্চ কলেজে একজন লোক শুধু এ নিয়েই আছে। ছয়শ' টাকা তার মাইনে। Administration (পরিচালনা) খুব clean (নির্দোষ) আর efficient (দক্ষ) করতে হলে এসবের বড্ড দরকার।

কতকগুলি মানুষের স্বভাবই ফাঁকি দেওয়া। কতকগুলি আলস্য-পরায়ণ। আর কতকগুলি কাজে বেশ ভাল, কিন্তু বুদ্ধি খারাপ। খালি গোলমাল সৃষ্টি করে। সেইজন্য প্রধান emphasis (জোর) হওয়া উচিত duty-র (দায়িত্বের) উপর। সর্বদা duty (দায়িত্ব) স্মরণ করিয়ে দিলে

তখন alert (সতর্ক) থাকে। নয়তো দায়সারা কাজের মত হয়। প্রভাসবাবু এবার ফিরে এলে, তাকে এই কাজ দিয়ে দেওয়া যাবে। এটা খুব important (জরুরী) কাজ।

৪

রাত্রি সাতটা। শ্রীম ভক্তসঙ্গে চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন, চেয়ারে দক্ষিণাস্য। নিত্যকার ভক্তগণ সব বসা বেঞ্চে। 'কথামৃত' পাঠ হইতেছে। ডাক্তার কার্তিক বক্সী পড়িতেছেন, চতুর্থ ভাগ ত্রয়োদশ খণ্ড — দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুরের জন্মোৎসব। শ্রীম নিজেই বাহির করিয়া দিয়াছেন এবং ধ্যানমগ্ন হইয়া পাঠ শুনিতেছেন। এইবার তিনি কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কেন তিনি তাঁর জন্মোৎসবের অনুমতি দিলেন? সে কি লোকে যা ভালবাসে — নিজের পূজা হোক, তার জন্য? তা নয়। ভক্তরা সব আসবে। ঈশ্বরের নাম গুণকীর্তন হবে, ঈশ্বরকে নিয়ে আনন্দ হবে, তাই। মা-বৈ যিনি কিছু জানতেন না তাঁর আবার লোকমান্য হবার ইচ্ছা কোথায়? তিনি কখনও লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে বলতেন, 'ঝাঁটা মারি লোকমান্যে'।

তাঁ'তে যে লোকমান্য হবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না, তিনি যে মা-বৈ কিছুই জানতেন না, এ কথা তাঁর নিজের আচরণে সুস্পষ্ট। জন্মোৎসব বাসরে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। ব্যুত্থিত হলে, তখনও মন সচ্চিদানন্দে নিমগ্ন, বাহ্যজ্ঞান পূর্ণভাবে ফিরে আসে নি, সেই অবস্থায় তিনি আধ আধ স্বরে বলছেন, '(মা) জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সবই তুমি। মন বুদ্ধি সবই তুমি।' আবার বলছেন, 'তুমিই অখণ্ড, তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছো।'

যাঁর এই অবস্থা, এই কথা, তাঁর কি লোকমান্য হবার ইচ্ছা থাকে? তিনি তিনবার সমাধিস্থ হলেন, একেবারে বেহুঁস এই এক ঘন্টার মধ্যে — যেন ভূতে পেয়েছে।

ঈশ্বরচিন্তা হবে এই জন্মোৎসবে, তাই অনুমতি দিলেন। আর এইজন্যও অনুমতি দিলেন, পরেও এইরূপ জন্মোৎসব করবে সকলে। তাতে ভক্তদের পরম কল্যাণ হবে।

ভাগবতে আছে, ভক্তগণের ওপর ভগবানের সকলের চাইতে বড় কৃপা, বড় অবদান তাঁর অবতার। ভক্তগণ অবতারের জন্ম, লীলা ও মহাবাণী চিন্তা করে, ক্রমে চিত্তশুদ্ধ করে ঈশ্বরপ্রাপ্তির চেষ্টা করবে।

নিরাকারকে সকলে ভাবতে পারে না — নিরাকার নির্গুণকে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে। নিরাকার সগুণকে ভাবাও কঠিন। সাকার সগুণকে ভাবা সহজ। আবার মানুষ হয়ে যখন তিনি আসেন, অবতার হয়ে, যেমন ঠাকুর, তখন তাঁকে ভাবা, তাঁকে চিন্তা করা সব চাইতে সহজ।

ঠাকুরের ভালবাসা, তাঁর কাজ, তাঁর গান, তাঁর নৃত্য, তাঁর নিজের হাতে ভক্তদের খাওয়ান, ঈশ্বরের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা ও শিশুর মত ক্রন্দন, তাঁর মুহুর্মুহুঃ সমাধি — এই সব চিন্তা করবে ভক্তরা। তাই তিনি জন্মোৎসবের অনুমতি দিলেন।

জীবের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর অবতার শরীর ধারণ। সেই সুদুর্লভ পুরুষোত্তমের, অবতারের, জন্মোৎসব স্বয়ং অবতারই আরম্ভ করিয়ে দিয়ে গেলেন।

ঈশ্বরলাভের সহজ পথ অবতার দেখিয়ে গেলেন। ভক্তরা এখন দাগা বুলাক।

ঠাকুর বলতেন, 'আমাকেই চিন্তা করলেই হবে'। আবার প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন — 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞানভক্তি বিবেক-বৈরাগ্য শান্তিসুখ প্রেমসমাধি, এই সব আমার ঐশ্বর্য'।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভগবান নিজের পূজা নিজেই করেন। তবেই ভক্তরা দেখে উহা করবে। ঠাকুরের এই ছবিকে, যা সর্বত্র এখন পূজিত হয়, ঠাকুর নিজেই পূজা করেছিলেন। বলেছিলেন, পরে ঘরে ঘরে এর পূজা হবে। তাই তো হচ্ছে, আরও হবে।

ভগবানের গুণকীর্তন ভবরোগের মহৌষধ। তাই মুমুক্ষুগণ সর্বদা এই গুনগান কীর্তন করে থাকে। আবার মুক্ত পুরুষেরা তাঁর নাম গুণকীর্তন করেন। এ সব কথা ভাগবতে আছে। আরও আছে, যে তাঁর নাম-গুণ শ্রবণ করে, উচ্চারণ করে, অপরকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং নিজেও

চিন্তা করে, তার আর পুনর্জন্ম হয় না (১০।২।৩৭)।

ঠাকুর তাই ভক্তদের অনুমতি দিলেন জন্মোৎসব করতে। এতে তাঁর নাম কীর্তন হয়েছে, লীলা কীর্তন হয়েছে, আর তাঁর শ্রীমুখ থেকে কথামৃতরূপী ভবরোগের মহৌষধ নির্গত হয়েছে।

অবতারের লীলাচিন্তা সব চাইতে সহজ সাধন। সেইজন্যই তো নিজে উহা recommend (অনুমোদন) করলেন।

একজন ভক্তকে বললেন, হরিতকীবাগানে অমুককে বলে এস, আমাকে চিন্তা করলেই হবে। এই কথা বলেই আবার বললেন, 'মা, আমি অন্যায় করলাম আমার চিন্তা করতে বলে'? নিজেই উত্তর দিলেন — 'মা, আমি তো দেখছি, তুমি সব হয়ে রয়েছ — মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার, সবই তুমি'।

কে বলতে পারে এই কথা — 'আমাকে চিন্তা করলেই হবে' — ঈশ্বর ছাড়া? কার এ সাহস আছে?

অবতার তাই নিজের পূজার আয়োজন নিজেই করেন। এই ক'রে তাতে ভক্তদের রুচি জন্মিয়ে দেন।

তাঁর মানুষরূপকে যে ভালবাসবে — শরীর মন আত্মা, যাকেই ভালবাসুক তার আর জন্ম হবে না।

কিন্তু অবতারকে চেনা কঠিন। ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া এটি হয় না। আমরা যে তাঁকে একটু চিনেছি একি আর আমাদের শক্তিতে হয়েছে? তিনি কৃপা করে শক্তি দিয়েছিলেন, তাতেই চিনেছি। যাকে যতটুকু শক্তি দেন সে ততটুকুই চিনবে। এই চেনার শেষ নাই — অনন্ত, অনন্ত। অবতার মানে, সান্তের ভিতর অনন্ত — সান্তানন্ত। তবে একটু জানলেই কাজ হয়ে গেল। বলেছিলেন, গঙ্গা একস্থানে ছুঁলেই গঙ্গাস্পর্শ হল। তাতেই কাজ হয়ে গেল ভক্তদের।

আবার বলেছিলেন, 'অবতার যেন গরুর বাঁট'। বাঁট দিয়ে দুধ আসে। সেই দুধে জীবন ধারণ হয়। অর্থাৎ অবতারের কথায় বিশ্বাস হলেই হয়ে গেল।

আবার বলেছিলেন, অবতার যেন দেয়ালের ভেতর বৃহৎ ছিদ্র। এই ছিদ্র দিয়ে ওপারের, অর্থাৎ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য দেখা যায়।

আবার বলেছিলেন, অবতার অচেনা গাছ। কেউ চিনতে পারে না, না চেনালে। আবার বলেছিলেন, অবতার যেন বাউল। দলবল নিয়ে এলো, গান গেয়ে চলে গেল।

কত রকমে নিজেকে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু চিনবার যো নেই, না চিনালে।

কি করে মানুষ চেনে বল না! শত আবরণে ঢেকে এসেছেন। দরিদ্র, ছয়টাকা মাইনের পূজারী, প্রায় নিরক্ষর, আবার উন্মাদ, কখনও উলঙ্গ। এর ভিতর দিয়ে কার সাধ্য তাঁকে চেনে, তিনি না চিনালে? ভক্তদের এক একবার স্বরূপ দেখাতেন। তারা স্তম্ভিত হয়ে ভাবতো, এ কি — দেব না মানব? তাই তো দেবেন মজুমদার মশায় গানে বলেছেন, 'কে তোমারে জানতে পারে তুমি না জানালে পরে।'

মানুষ তো একেবারে মানুষ, ষোল আনা মানুষ! শোক তাপ দুঃখ কাম ক্রোধ লোভাদি মানুষের সব নিয়ে এসেছেন। অবশ্য পয়েন্ট ওয়ানে এসব — মানুষ। আর নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন — ঈশ্বর।

আবার মানুষের মত স্নেহ ভালবাসা, রোগযন্ত্রণা, ক্রন্দন, এসব নিয়ে এসেছেন। কেন এ সব নিয়ে আসা? ভক্তরা তা হলে ভয় পাবে না। ভাববে, তিনি আমাদেরই একজন। কি আশ্চর্য, পাঁচ বছর তাঁর সঙ্গে রইলুম, কিন্তু একদিনের জন্যও জানতে দেন নাই তিনি আমাদের গুরু। Equal term-এ (সমভাবে) ব্যবহার করতেন। কেন এমন ব্যবহার করতেন? ভয়ে যদি পালিয়ে যায়, তাই এই সমব্যবহার।

এদিকে তো এই মানুষ। আবার মুহুর্মুহুঃ সমাধি, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। এ দু'টি বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় এক ভগবানেই সম্ভব — মানুষে নয়। তা যেরূপই হউক। এক আধ বার সমাধি হলেই হেউ ঢেউ হয়ে যায় মানুষ। দেশ জুড়ে নাম রটে যায়। আর, এ যেন সমাধির তুফান। যত রকমের সমাধির কথা শাস্ত্রে আছে এ সবই ঠাকুরে হয়েছে। সকল বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ অবতারের জীবন।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভক্তদের কি জ্ঞান আছে যে তারা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে তাঁকে ভালবাসবে? তাই তিনি নিজে করে সব শিখান।

তাই আপনার পূজা আপনি করলেন।

আহা, কি অবস্থা ঠাকুরের! নিরাকার নির্গুণ সচ্চিদানন্দ দর্শন করলেন। আবার বললেন, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। আমি নিজ চক্ষে দেখছি। এতে বিচার কি করবো? আবার বললেন, সেই সচ্চিদানন্দই কৃষ্ণ হয়েছেন। বললেন — প্রাণ কৃষ্ণ, মন কৃষ্ণ, বুদ্ধি কৃষ্ণ, আত্মা কৃষ্ণ। জীবজগৎ সব কৃষ্ণ। আবার বললেন — তুমিই আধার, তুমিই আধেয়।

ঠাকুরের সব কথা প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা — বইপড়া কথা নয়। সাক্ষাৎ দর্শন। যা দেখলেন তাই বললেন। শোনা কথা নয়। বিচারের কথা নয়। যখন দেখলেন, তখনই বললেন। তাঁর সব অপরোক্ষ। একেই বেদ বলে।

অপরের কেন এমন দর্শন হয় না? তারও কারণ বলছেন — কামিনীকাঞ্চনে মন, তাই দর্শন হয় না। তাই এ থেকে সাবধান হতে বললেন।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তিনি জন্মোৎসব করেছিলেন বলেই আজকাল ভক্তরা সব করছে। মানুষ যা ভালবাসে তা দিয়েই তাঁর পূজা করা — আহার, নৃত্যগীত-আদিতে পূজা।

দুটো পথ। একটা পথ সরে দাঁড়ান। যেমন সন্ন্যাসীরা করে। আর একটা পথ sublimation (ঈশ্বরভাব আরোপ করা)। হীন বস্তুকে উঁচু করে দেখা। জগৎকে ঈশ্বররূপে দেখা — তিনিই সব হয়ে আছেন। একটা পথ ধরে চল।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১২ই জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীঃ। ২৮শে পৌষ, ১৩৩১ সাল।
সোমবার, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া ১৩ দণ্ড। ৮ পল।

দশম অধ্যায়
অভিনব শিক্ষক শ্রীম

১

মর্টন স্কুলের ছাদ। পৌষ মাস। সকাল আটটা। স্বামী সদ্ভাবানন্দ আসিয়াছেন 'Method of Teaching' (শিক্ষা-প্রণালী) দেখিতে। ইনি দেওঘরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা ও সঞ্চালক।

শ্রীম মর্টন স্কুলে শিক্ষার অভিনব প্রণালীর প্রবর্তন করিয়াছেন। জগবন্ধু তাঁহাকে উহা পড়িয়া শুনাইতেছেন আর ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইনি মর্টন স্কুলের শিক্ষক। উভয়ে ছাদে বসিয়াছেন বেঞ্চে।

শ্রীম-র প্রদর্শিত নূতন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে শিক্ষণীয় সকল বিষয় বাংলায় শিখাইতে হইতেছে। ছেলেদের মস্তিষ্কের উপর অযথা চাপ না পড়ে, তাহারা তোতাপাখীর মত মুখস্থ না করে, এই বিষয়েই প্রধান লক্ষ্য এই নব প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালীর।

শ্রীম স্বীয় কক্ষে অর্গলবদ্ধ হইয়া ধ্যান করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর বাহিরে আসিয়া ছাদের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রায় এক ঘন্টাকাল স্বামী সদ্ভাবানন্দকে এই শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। ইনি বিদ্যাপীঠে উহার প্রবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন।

শ্রীম (স্বামী সদ্ভাবানন্দের প্রতি) — মনে কর, তুমি ইংরেজীতে সাহিত্য পড়াবে। যাদের পড়াবে তারা সব কিশোর। তাদের ইংরেজীতে বললে তারা বুঝবে কি? এই বয়সে ভাষা শিখে তারপর বুঝা, এ হলে কাজ হয় না। তুমি বলছো একদিকে, অন্যদিকে ওরা শুনছে — দু চারটে কথা ওদের কানে যাচ্ছে, আর তাই মুখস্থ করছে। কিন্তু বিষয়বস্তু মোটেই বোধগম্য হচ্ছে না। শেষে পরীক্ষার পূর্বে কেবল নোটস্ মুখস্থ করে। এ ক'রে human energy-র (মানুষের শক্তির) অপব্যয় হচ্ছে। এই energy-কে (শক্তিকে) রক্ষা করা যায় যদি ভাবটা ওরা বুঝতে পারে। ভাবটা বুঝলে ভাষা আপনিই বের হবে। ভাবের বাহন ভাষা।

এই প্রথা জগতে কোথাও নাই — শিশু ও কিশোরদের মাতৃ ভাষায় না শিখিয়ে অপরের ভাষায় শেখান। ইংরেজরা তাদের নিজের সুবিধার জন্য এই system-এর (পদ্ধতির) সৃষ্টি করেছে। ওদের উদ্দেশ্য, কি করে ভারতের administration (রাজ্যশাসন) ভারতের লোকদ্বারা চালাতে পারে। ওদের উদ্দেশ্য কতকগুলি সাহেব তৈরী করা, কালা সাহেব (হাস্য)! উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এই শিক্ষা প্রণালীতে ওদের দুটি মহাস্ত্র তৈরী হয়েছে। একটি army (সৈন্যদল) আর অপরটি, সিভিল সার্ভিস্ ও অন্য সব সার্ভিস্ অর্থাৎ শাসকদল।

এ দেশের লোক যথার্থ শিক্ষা লাভ করে মানুষ হউক, চরিত্রবান হউক, দেশের উন্নতি করুক, এ উদ্দেশ্য নাই ইংরেজদের। ওদের উদ্দেশ্য কিসে তাদের নিজের দেশের উন্নতি হয়। ভারতবাসীদের utilise ক'রে (কাজে লাগিয়ে), ভারতকে শোষণ করে, ব্রিটেনকে বড় করা — এটা তাদের মূলমন্ত্র। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি ভারত। ভারতের unlimited resources (অফুরন্ত সম্পদ) রয়েছে — material and human (ধনবল ও জনবল)। আর ইংরেজরা numerically (সংখ্যায়) সামান্য লোক। তাই এই শিক্ষা দিয়ে এদেশের লোক দিয়েই এদেশ শাসন করা যায় কি করে তা নিয়ে তারা ব্যস্ত। করেছেও তাই। অমন শূন্য লতার মত শিক্ষাপ্রণালী জগতে আর কোথাও নাই।

আমরা সেটা বুঝে ফেলেছি। কিন্তু করবার যো নাই কিছু। তাই রয়ে সয়ে যতটা হয় তাই করা হচ্ছে। আশুবাবুও এটা বুঝেছেন। কিন্তু হাত পা বাঁধা। ইংরেজেরা কর্তা। তাদের ছাড়িয়ে কিছু করা অসম্ভব।

দেশের জনসাধারণের উন্নতি হউক, শিক্ষা লাভ করে তারা মানুষ হউক, এ দেশ উন্নত হউক, এ দেশের লোক স্বচ্ছন্দে খেতে পরতে সমর্থ হউক, এ উদ্দেশ্য মোটেই নাই এদের এই শিক্ষার planning-এর (পরিকল্পনা) পেছনে। এতে লোক denationalised (জাতীয় বৈশিষ্ট্যহীন) হয়ে যাচ্ছে। Hybrid (মিশ্রজাতীয় লোক) সব তৈরী হচ্ছে, আধা ইংরেজ, আধা দেশী। এদের এই দুষ্ট মূল নীতিটা চোখের সামনে সর্বদা ধরা থাকলে আপনিই বুদ্ধি বের হয়ে আসে কিসে ছেলেদের মানুষ করা যায়।

ছেলেদের চরিত্রসংগঠন হয়, শরীর পুষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটি বলিষ্ঠ হয় — শিক্ষার পরিকল্পনার পেছনে এই ভাবনাটি চাই-ই। চরিত্রসংগঠনে ঈশ্বরবিশ্বাস একান্ত আবশ্যক। এটা তোমাদের সঙ্গে থেকে থেকে ছেলেরা এমনি লাভ করবে।

মানুষের শরীর তো একটা নয়, তিনটা — physical, intellectual আর spiritual (স্থূল সূক্ষ্ম আর কারণ)। এই তিনটাতে মিলে সম্পূর্ণ মানুষ হয় — perfect man। শিক্ষালয়ে প্রথম দুটো শুরু হবে। আর, তৃতীয় শরীরেরও বীজরোপণ করতে হবে তখনই।

Physical body-র (স্থূল শরীরের) আহার — খেলাধুলো। Intellectual body-র development (সূক্ষ্ম শরীরের বৃদ্ধি) হয় thoughts and ideas (চিন্তা ও ভাবনার) দ্বারা। এগুলি এ শরীরের আহার। শিক্ষালয়ে এগুলি মিলে। এগুলিকে systematically (শৃঙ্খলার সহিত) মনের স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখতে হবে। আর যাতে ছেলেরা independent thinking (স্বাধীনভাবে চিন্তা) করতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে।

এই যে নোট মুখস্থ করে, এতে power of reasoning and judgement-এর (যুক্তি ও বিচারশক্তির) মোটেই development (উন্নতি) হয় না। Monstrous growth (অস্বাভাবিক বিকাশ) হয়ে যায়। হয়তো ইংরেজী ভাষাটি খুব শিখলো, কিন্তু মনুষ্যত্বহীন। নিজের দেশের, নিজের জাতীয় ভাবের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, অপর দেশের যা ভাল তা না নিলে, না হয় পুরো দেশী, না বিদেশী। একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব সৃষ্টি হয়ে পড়ে।

এজন্য খুব খাটতে হয়। খাটা যায় যদি দেশপ্রীতি, জনসেবা অথবা নারায়ণ দৃষ্টি চোখের সামনে থাকে। এসবের খুবই অভাব। শিক্ষকরা খাটতে চায় না। আমরা যা শিক্ষাপদ্ধতি চালিয়েছি তাতে শিক্ষকদের অনেকেরই সমর্থন নাই। নিজেরা যেভাবে প্রাণহীন, লক্ষ্যহীন শিক্ষা পেয়েছে, তাই চালাতে চায়। আলস্য ও আদর্শহীনতায় দেশ ছেয়ে আছে। এই তমোকে দূর করতে হবে। দেশের কল্যাণের অমোঘ বীজ মনের ভেতর স্থাপন করতে হবে। অলসতা ও তার সকল সুখের বিধ্বংসকারী

প্রিয় সন্তান, স্বার্থপরতাকে ছাড়তে হবে। তবেই এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হবে।

এই যা শুনলে এঁর কাছে, আর যা পড়ে দেখলে, এসব কথা আপনিই বের হবে তোমার ভেতর থেকে যদি ঐ কথা মনে রাখ, কি করে ছেলেকে যথার্থ মনুষ্যত্বের পথে দাঁড় করাতে পারি। স্বামীজীর উচ্চ আদর্শ তো তোমাদের সামনে রয়েছে, তবে আর কি? লেগে যাও।

তোমাদের তো facilities (সুযোগসুবিধা) খুব বেশী। জনবল যথেষ্ট, আবার সকলেই ত্যাগব্রতে ব্রতী। দেশী ভাবের শিক্ষাপ্রবর্তন করা খুব সহজ। তা ছাড়া বিদ্যাপীঠ অনেকটা স্বাধীন।

তোমাদের responsibility-ও (দায়িত্ব) খুব বেশী। ছেলেরা একাধারে বাড়ি, স্কুল ও বাইরের শিক্ষা সব লাভ করে residential (আবাসিক) স্কুলে।

অনেক handicaps-এর (বাধাবিঘ্নের) ভিতর দিয়ে চলতে হয়। নূতন কিছু করতে যাও, কল্যাণকর হলে বাধা আসবেই। কারণ কি? Lower level-এ (নিম্নস্তরে) মানুষের মন static (নিশ্চেষ্ট) থাকে। পশুর মত আহার শয়ন মৈথুন ভয় নিয়ে থাকে, নিশ্চল ও আলস্যপরায়ণ হয়। তার ভিতরে রজের সঞ্চালন করতে যাও সে বাধা দিবে। এসব আপদ আছে। তুমি যার কল্যাণ করতে যাবে সে-ই বাধা দিবে। যদি এই কল্যাণকামনা সত্যিকার হয় তবে সব বাধা সরে যায়। এতে কারো দোষ নাই। মানুষের প্রকৃতিই বানিয়েছেন ঈশ্বর এইরূপ। এসব জেনে করলে সব সহজ হয়ে যায়।

আবার চরিত্রগঠনে কেবল দৃষ্টি রাখলে চলবে না। ছেলেকে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় পাশ করাতে হবে। তা নইলে কাজ পাবে না। Conform (অনুরূপ উপযোগী) করতে গিয়ে অনেক শক্তির misuse (অপব্যয়) হয়। আর extra curricular activities-এর (পাঠ্যবহির্ভূত কাজকর্মের) দিকে বেশী ঝোঁক দিলে University result suffer করে (বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল খারাপ হয়)। এই সব দিক রেখে চলতে হবে।

Cramming (অর্থ না বুঝে মুখস্থ করা) যত কম হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। শিক্ষকরা যা লেকচার দিয়ে যায় তা ছেলেরা বুঝতে পারে না।

শিক্ষকরাও বোঝে না। খালি ইংরেজী বলে। Ideas and ideals clear (চিন্তা ও আদর্শ) সুস্পষ্ট নেই নিজের মনে। কি করে যথাসম্ভব demonstrative (হাতে কলমে প্রদর্শনযোগ্য) হয় পড়া তা দেখবে। অর্থাৎ চোখে দেখে বা হাতে ছুঁয়ে যাতে শেখে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। শুধু কানের ওপর জোর না দেওয়া হয়। যতগুলি ইন্দ্রিয় কাজে লাগাতে পারা যাবে ততই personality deep ও wide (ব্যক্তিত্ব সুগভীর ও সুবিস্তীর্ণ) হবে। অথচ mental energy-র (মানসিক শক্তির) অপব্যয় হবে না। আর তার কুফলে শরীর খারাপ হবে না — balanced development (মন সুসমভাবে উন্নত) হবে।

সব বিষয়ে map-pointing করাবে (মানচিত্র দেখাবে)। History ও Geography-তে (ইতিহাসে ও ভূগোলে) তো করাতেই হবে। Literature এও (সাহিত্যশিক্ষাতেও) তা করাতে হবে। ছেলের সুপ্ত শক্তিটাকে টেনে বের করে আনতে হবে, প্রবুদ্ধ করতে হবে। তারপর তার মনের স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখতে হবে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ।

আমরা ইংরেজী সাহিত্য পড়াতে হলে এইরকম করে থাকি। যে প্রবন্ধটা পড়ান হবে আগে শিক্ষক বাংলায় সেটা সংক্ষেপে বলে দেবেন। তারপর চার পাঁচজন ছেলেকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করবেন সে ধরতে পারছে কিনা। মূল গল্পটা যেই জানা হলো তারপর দেখতে হবে ক'টা question (প্রশ্ন) হতে পারে তা থেকে। সেই প্রশ্নগুলি ও তাদের উত্তর, দুই-ই ছেলেকে বলে দিতে হবে। এই দুটোই ছেলেদের সামান্যভাবে জিজ্ঞাসা করে তারপর পাঠ আরম্ভ করা।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের খাটুনী খুব বেশী। তাই তাঁরা এর অনুসরণ করতে চান না। যদি জোর supervision (পরিদর্শন) থাকে তবে কতকটা হবে।

২

আজ পৌষ সংক্রান্তি। এখন বেলা সাড়ে নয়টা। শ্রীম তিনতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। জগবন্ধু অনুমতি লইয়া ৺দক্ষিণেশ্বর রওনা হইলেন। ছোট নলিনী ও ছোট অমূল্য ইতিপূর্বেই রওনা হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীম আজ সকালে বলিয়া ছিলেন, আজ সংক্রান্তি, পর্বদিন — দক্ষিণেশ্বর গেলে হয়। কপালে থাকলে হবে।

তাই ভক্তরা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাইতেছেন। শ্রীম-র সঙ্গে গেলে ঠাকুরের সময়কার কথামৃতবর্ণিত প্রাচীন ঘটনাবলী সজীব হইয়া উঠে ভক্তহৃদয়ে। তাহা ছাড়া কত নূতন কথা ও নূতন লীলাকাহিনী শ্রীম-র মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাই ভক্তরা শ্রীম-র সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাইতে সর্বদা উৎসুক।

ভক্তরা শিবতলার ঘাটে জাহাজ হইতে নামিয়া এঁড়েদহে গদাধরের পাটবাড়ি দর্শন করিলেন। গঙ্গাতটে এই পবিত্রস্থলে নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য গদাধর দাস ভগবদ্‌সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং এইস্থানেই তাঁহার পূত দেহ ভূগর্ভে সমাধিস্থ করা হয়। তাই এই স্থান ভক্তগণের, বিশেষতঃ বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট অতি পবিত্র। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার এইস্থানে পদার্পণ করিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ভক্তগণকে প্রায়ই ওখানে লইয়া যাইতেন। ঠাকুরঘরের দরজার উপর একখানা বৃহৎ চৈতন্য-সংকীর্তনের ছবি আছে। চৈতন্যদেব সংকীর্তনে বিভোর হইয়া চলিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া গাভীগণ আহার ছাড়িয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। কুলবধূগণ গঙ্গাস্নান করিতেছে। এই দেবদৃশ্য দেখিয়া স্নান ছাড়িয়া অপলক দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য-চরণগঙ্গার অমিয় সলিলে মনকে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছে। তাহাদের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত। আর কলসী গঙ্গাজলে ভাসিয়া যাইতেছে। পথিক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নাবিকের বৈঠা হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে। উজানপথগামী নৌকা, তাই ভাটার দিকে বিধ্বস্তভাবে গঙ্গার স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়া যাইতেছে। উড্ডীয়মান বিহগকুল বৃক্ষশীর্ষে বসিয়া পড়িয়াছে আর এই অপরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া আহার অন্বেষণ ছাড়িয়া দিয়াছে।

এই ছবিটি দেখাইবার জন্যই ঠাকুর ভক্তগণকে লইয়া ঐ স্থানে যাইতেন। শ্রীমও বহু ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া বহুবার ঐ স্থান দর্শন করিতে গিয়াছেন। সর্বদাই দক্ষিণেশ্বরযাত্রী ভক্তগণকে ঐ ছবিটি দর্শন করিতে বলেন। তাই আজও ভক্তগণ ঐ স্থান দর্শন করিয়াছেন। অন্নদা ঠাকুর নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের আবেশ অবতার বলিয়া প্রচার করেন।

কৌতূহলবশতঃ ভক্তগণ ঐ আশ্রমও উঁকি দিয়া দেখিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বর তপোবন। ভক্তগণ গঙ্গাস্নান করিয়া মা ভবতারিণীকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া ঠাকুরের ঘরে ও পঞ্চবটিতে সারাদিন অতিবাহিত করিলেন জপ ধ্যান পাঠ ও ঠাকুরের কথামৃত আলোচনায় পরম আনন্দে। অধিকন্তু পূজনীয় রামলালদাদার উপস্থিতিতে ও তাঁহার মুখে ঠাকুরের অনেকগুলি প্রিয় সঙ্গীত, 'যশোদা নাচাত গো মা—', 'মজলো আমার মনভ্রমরা', 'গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি—', 'কখনও কি রঙ্গে থাক মা—', প্রভৃতি শুনিয়া ভক্তদের আনন্দের সীমা রহিল না।

আজ পৌষ-সংক্রান্তি বলিয়া ভহু ভক্তসমাগম হইয়াছে। কিছু কিছু দোকানপাটও বসিয়াছে। গঙ্গার ঘাটে ও ভবতারিণীর মন্দিরে আজ অতিরিক্ত ভীড়। যাত্রীবাহী নৌকাতে গঙ্গার ঘাট পরিপূর্ণ।

শ্রীম আসিবেন বলিয়া অনেক ভক্ত অপেক্ষা করিতেছেন। শীতকাল। বেলা পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া শ্রীম-র দর্শন না পাইয়া ভক্তগণ নিরাশ হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু মর্টন স্কুলের ভক্তগণ ছয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন।

ভক্তগণ আজ প্রায় উপবাসী। বেলা তিনটার সময় ন'বত ও ঠাকুরের ঘরে মধ্যস্থলে পুষ্পকাননে বসিয়া মায়ের প্রসাদী মিষ্টি, মুড়ি, মূলা, ইত্যাদি দিয়া জলযোগ করিলেন। সুখেন্দু আসিয়া যোগদান করিলেন।

শ্রীম আসিলেন না। ভক্তরা এইবার প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। পদব্রজে প্রথমে আলমবাজার আসিলেন, তারপর বরানগর। এখানে তাঁহারা দুইদলে বিভক্ত হইলেন। ছোট নলিনী প্রমুখ একদল পদব্রজেই শ্যামবাজার রওনা হইলেন। পথে ৺কাশীপুর উদ্যান বাহির হইতে দর্শন করিবেন আর মা সর্বমঙ্গলাকে। জগবন্ধু, সুখেন্দু, ছোট অমূল্য প্রমুখ অন্য দল কুঠিঘাটায় জাহাজে চড়িয়া বড়বাজার ঘাটে অবতরণ করিলেন। ছোট অমূল্য গেলেন হগমার্কেটে, সুখেন্দু বড়বাজারের বাসায়, আর জগবন্ধু, প্রভৃতি মর্টন স্কুলে। পথে বড় জিতেন ভক্তদের পৌষপার্বণের পিষ্টক পরিতোষপূর্বক আহার করাইয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

রাত্রি প্রায় নয়টা। মর্টন স্কুল, সিঁড়ির ঘর। শ্রীম দোরগোড়ায় উপবিষ্ট

চেয়ারে দক্ষিণাস্য। সম্মুখে ও বাম পাশে বেঞ্চে বসা ভক্তগণ — শুকলাল ও মনোরঞ্জন, ডাক্তার ও বিনয়, ছোট জিতেন ও বড় নলিনী, বলাই রমণী ও ছোট রমেশ, জগবন্ধু গদাধর ও বড় জিতেন প্রভৃতি। গৃহস্থ ভক্তগণ বেলুড় মঠে গেলে কিরূপ আচরণ করিবেন এইসব কথা হইতেছে। ভক্তগণ অতি নিবিষ্ট মনে শুনিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — প্রথমেই সংকল্প করতে হয় মঠে যাচ্ছি কৃতার্থ হতে, কৃতার্থ করতে নয়। ঠাকুরের অমৃতবাণী মূর্তিধারণ করেছে — সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের দর্শন করতে, দর্শন দিতে নয়। মঠে প্রবেশ করার আগেই ফটকে ঠাকুরকে স্মরণ করে প্রার্থনা করতে হয় — 'আমি যেন কায় মন বাক্যে কোনও প্রকারে আশ্রমপীড়া না করি। মনে করতে হয় ঠাকুরই এখানে নানা ত্যাগমূর্তিতে বিরাজমান। আমি এইসব ত্যাগমূর্তিদের দর্শন, প্রণাম ও পূজা করতে এসেছি।

কেন করা এ পূজা? তাতে আমাদের চৈতন্য হবে। ওঁদের দর্শন করলেই মনে হবে ওঁরা যা কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করেছেন আমরা তাই নিয়ে রয়েছি। এইটি মনে হলেই কাজ আরম্ভ হলো। তাঁদের দেখে মনে হবে, ঈশ্বরদর্শনই মানুষ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। এঁরা সব ছেড়ে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন মরণ পণ করে। আমরা গৃহে থেকে যে ভুল রাস্তা ধরেছি একথা মনে হবে। তখন চেষ্টা হবে কি করে ওঁদের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শনে আমিও ভাগী হতে পারি, সহযাত্রী হতে পারি। তখন হবে রুচি ঠাকুরের মহাবাক্যে, যা গৃহস্থ ভক্তগণের জন্য উইল করে রেখে গেছেন। যেমন পিতা রেখে যায় পুত্রের জন্য। তখনই 'বড়ঘরের দাসী হয়ে থাক নিজগৃহে' এই মহাবাণীর অর্থ উপলব্ধি হবে। সর্বত্যাগীর সঙ্গ ছাড়া একথা স্মরণ হয় না — এই ঈশ্বরদর্শন উদ্দেশ্যের কথা। কেবল বলেন-ই নয়, সাধু সর্বত্যাগী তৈরী করে দিয়ে গেছেন।

যেমন সাধুরা একসঙ্গে ওখানে থেকে ঈশ্বরদর্শনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তেমনি ভক্তরাও ঐ সাধুদের দর্শন করে ঐ উদ্দেশ্যসাধনে অর্থাৎ গৃহে থেকে প্রযত্নশীল হবে। সাধুসঙ্গ সাধুসেবা ছাড়া উপায় নাই আর। তাই মঠে যেতে হয় এই উদ্দেশ্য নিয়ে। শিখতে — শেখাতে নয়। পূজা

করতে — পূজা নিতে নয়, সেবা করতে — সেবা নিতে নয়!

৩

অন্তেবাসী আসিয়া এক কোণে বসিয়া কথামৃতপানে পরিতৃপ্ত। শ্রীম-র দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িতেই হঠাৎ যেমন গ্রামোফোন বন্ধ হইয়া যায় তেমনি শ্রীম-র কথামৃত-বর্ষণ যন্ত্রটি বন্ধ হইয়া গেল। বালকের ন্যায় ঔৎসুক্যে দক্ষিণেশ্বরের সংবাদ শুনিতে চাহিলেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — বলুন, Holy Land এর (পুণ্য-তীর্থের) সংবাদ বলুন, যেখানে ভগবান মানুষ হয়ে ত্রিশ বৎসর কাটিয়ে গেলেন। বলুন বলুন, তর সইছে না! তাকিয়ে আছি পথের দিকে কখন আপনারা ফিরবেন আর আমরা শুনবো সব।

ভাবলে অবাক হতে হয় — ধরাধামে বৈকুণ্ঠ! অত কাছে পেলে কে যায় দূরে। অত সহজ ও স্বাভাবিক এখানে যখন ভগবান অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা তো তাই প্রার্থনা করলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে, আমি এখানে বৃন্দাবনে মানুষ-শরীর নিয়ে আসতে চাই। কৃপা করে অনুমতি দিন। এখানকার রজঃ ব্রহ্মময়, ব্রজবাসী ব্রহ্মময়, গো, গোপাল সব ব্রহ্মময়, বৃক্ষলতা সব ব্রহ্মময়। পরম ব্রহ্মের নরলীলারসের ছড়াছড়ি এখানে। তাই মানুষ হয়ে এই লীলারস উপভোগ করতে চাই।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি স্থান দক্ষিণেশ্বর যেখানে ভগবান ত্রিশ বৎসর লীলা করেছেন! সারা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ এখন। যেমন বৃন্দাবন অযোধ্যা, তেমনি এটি। কিম্বা যেমন বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধগয়া, আর মুসলমান ভক্তদের কাছে মক্কা মদিনা। অথবা ইহুদীদের কাছে যেমন জেরুজালেম, তেমনি এই স্থান।

শাস্ত্রে আছে একবার ঈশ্বরের দর্শন হলে জীব জীবন্মুক্ত হয়ে যায়। তাঁর পদধূলিতে অভিশপ্ত পাষাণী অহল্যা শাপমুক্ত হয়ে পাষাণদেহ ছেড়ে পুনরায় নরদেহ লাভ করেন। ভগবানের চরণ সংস্পৃষ্ট অগণিত রজোময় এই স্থান দক্ষিণেশ্বর। এখানকার প্রতিটি ধূলিকণা surcharged with spirituality (জীবন্ত ও ব্রহ্মময়)।

ভাগবতের কথায় আছে, যেখানে ভগবান লীলা করেন সেখানকার

বৃক্ষলতা সব — দেবতা আর ঋষি। লীলাসম্ভোগের জন্য তাঁরা সেখানে থাকেন। দক্ষিণেশ্বরের বৃক্ষলতা তাঁর গায়ের হাওয়া হাতের স্পর্শ ও চরণরেণুর আলিঙ্গনে ধন্য।

তারপর সেখানে মা ভবতারিণী রয়েছেন, যাঁর সঙ্গে দিবানিশি ঠাকুর কথা কইতেন, যাঁকে নিজ হাতে খাওয়াতেন পরাতেন, যাঁর নব নব রূপবিলাস দেখে সমাধিমগ্ন হতেন, যাঁর সঙ্গে কত কথা হতো — হাসি ঠাট্টা, কতরূপে বিলাস হতো। কি আশ্চর্য, পাথরমূর্তি কথা কন, খান, স্নেহ করেন, রঙ্গরস করেন সব মানুষের মত! অপরের কাছে প্রস্তর-মূর্তি — ঠাকুরের কাছে তো চিন্ময়ী হাস্যবদনা, ব্রহ্মশক্তি স্বয়ং!

হিন্দুদের মূর্তিপূজার যে অপবাদ দেয় কোনও কোনও ধর্মমত, ঠাকুরের এই প্রত্যক্ষ জীবন্ত আচরণ দ্বারা ও তাঁর মহাবাক্য দ্বারা তা খণ্ডিত হয়ে গেছে।

রাধাকান্ত, বাণলিঙ্গ শিব, রামলালা — এঁরা সব ভগবানের বিগ্রহ। এঁরা জীবন্ত রূপ ধরে ঠাকুরের সঙ্গে লীলা করেছেন। এঁরাও রয়েছেন ওখানে।

যৌবন থাকলে দেখিয়ে দিতাম কি করে ওখানে যেতে হয়। অমন অমূল্য স্থান, বিমুক্ত ক্ষেত্র, বৈকুণ্ঠ on earth (ধরাধামে)। কিন্তু ভক্তদের যেতে ইচ্ছা হয় না! সপ্তাহে অন্ততঃ একবার যাওয়া উচিত দক্ষিণেশ্বরে, if not oftener — যদি আরও ঘন ঘন যাওয়া না হয়।

ঠাকুরের জাগ্রত অবস্থান ওখানে। তাঁর অবস্থানে সকল দেব-দেবী, ঋষি-মুনি, গন্ধর্ব সকলের আবির্ভাব ওখানে।

ঠাকুরের ঘর, পঞ্চবটী, বেলতলা, নাটমন্দির, মা কালীর বারান্দা — এসব জীবন্ত জাগ্রত স্থান। প্রতি অণু-পরমাণু জীবন্ত ও পবিত্র। ওখানকার বায়ুমণ্ডলে মুক্তির ছড়াছড়ি। এসব স্থানে ধ্যান জপ করলে ফস্ করে মন উপরে চড়ে যায়। যেন বারুদখানা, একটুতেই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে — সর্বদা জ্বলছে।

অন্তেবাসীর আর আজিকার দক্ষিণেশ্বর যাত্রার রিপোর্ট বলা হইল না। শ্রীম-র প্রাণবন্ত মাহাত্ম্য বর্ণনে ভক্তদের হৃদয়ে কিছুকালের জন্য নিত্য পবিত্র ধাম দক্ষিণেশ্বরের স্বরূপ জীবন্ত জাগ্রত হইয়া উঠিল।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তারপরই বেলুড় মঠ। ওখানে স্বামীজী ঠাকুরকে স্থাপন করেছেন। ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন, কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে তুই আমায় যেখানে রাখবি আমি সেখানে থাকবো। যেদিন বেলুড় মঠ স্থাপিত হয় এইটিন-নাইনটিএইটের শীতকালে, সেই দিনের কথা আজও মনে পড়ছে। স্বামীজী কাঁধে করে নিয়ে গেলেন 'আত্মারামকে' (ঠাকুরের পূত অস্থি-র কৌটা) নীলাম্বর মুখার্জীর বাড়ি থেকে। তখন সেখানে মঠ ছিল। স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন, এই দশ বছর ধরে আমার মাথার উপর পাহাড়-প্রমাণ একটা বোঝা ছিল। ভেবে ভেবে পাগল হয়েছি কোথায় রাখি তাঁকে। আজ সে বোঝা শির থেকে নামলো। আর একটা তাঁর মনের কথা পরে বলেছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠার দিন মনে মনে ভেবেছিলেন, আজ যদি কোনও রাজা এখানে আসেন তা হলে বুঝবো ঠাকুর তাঁর কথা রেখেছেন। অর্থাৎ 'কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে তুই আমায় যেখানে রাখবি আমি সেখানে থাকবো' — ঠাকুরের এই প্রতিজ্ঞা।

সারাদিন কোন রাজা আসেন নাই দেখে স্বামীজী একটু মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। বিকেলে তিনি দুঃখিত মনে কলকাতা যান। রাত্রে ফিরে এসে শুনলেন আলোয়ারের মহারাজা এসেছিলেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে।

ঠাকুর মঠে জাগ্রত। তাঁর ভাবধারা প্রচারের স্থান মঠ। সেখানে তাঁর অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী ভক্তগণ আজও কেউ কেউ থাকেন। তাঁরা তাঁর ভাবকে জাগিয়ে রেখেছেন সেখানে। কত বড় স্থান। ওখানে যে তাঁরা আমাদের যেতে দেন, তাঁদের দর্শন করতে দেন, এ কত বড় সৌভাগ্যের কথা! ওখানে খুব সাবধানে যেতে হয়। সাধুদের পীড়ার কারণ না হয়। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে মঠে প্রবেশ করা উচিত — 'আমি কায়মনোবাক্যে সাধুদের যেন পীড়া না দি'। তাঁরা যদি তিরস্কার করেন, এমন কি প্রহারও করেন, তথাপি আমি প্রতিবাদ করবো না, জোড় হাত করে থাকবো। তাঁদের পুজো করতে যাওয়া — পীড়া দিতে নয়। তাঁরা কত বড় লোক, সর্বস্ব ছেড়ে ওখানে রয়েছেন, ভগবানলাভে ব্রতী! তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সিদ্ধপুরুষও রয়েছেন। মুড়ি মিছরির এক দর করলে শূলে যেতে

হবে, ঠাকুর বলতেন। দেখতে ওঁরা আমাদেরই মত মানুষ, কিন্তু তাঁদের ভিতর সব ক্ষীরের পুর। অন্য মানুষ অন্য রকম।

৪

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একদিন ইনি (বড় অমূল্য) নিজের জামা খুলে জ্ঞান মহারাজের ঘরে ওটা রেখে দিছলেন আলনায়। একজন ওটা দেখে দূরে ফেলে দেন। এতে ইনি খুব রাগ করেন। তা কি করতে আছে? নিজে করলাম অন্যায়, আবার তার উপর রাগ করা!

ওঁরা সব ছেড়ে এসেছেন ওখানে, কিসে ঈশ্বরলাভ হয় এই এক চেষ্টা। গৃহস্থদের স্পর্শ তাঁদের হানিকর। আমরা কি নিয়ে রয়েছি সব। তাঁদের যে আমরা দর্শন করতে পারছি, এটাই কত বড় সৌভাগ্য তা ভাবে না!

কোথায় ছিল এ বাংলা দেশে সন্ন্যাসী? ঠাকুর আসায় তিনি সৃষ্টি করলেন এই নূতন সন্ন্যাসী। কত ত্যাগ এঁদের! কি না ছিল? সেই সব ছেড়ে এসেছেন। তাঁরা যাতে প্রসন্ন থাকেন তাই করা। আগে থেকেই তৈরী হয়ে যেতে হয়। যারা যথার্থ ঈশ্বর-লাভের প্রয়াসী তারা ওখানে প্রহার খেলেও হাত জোড় করে থাকবে। 'মুড়ি মিছরির এক দর করতে নেই। তা' করলে শূলে যেতে হয়', ঠাকুর বলেছিলেন।

জামাটা যে আলনা থেকে ফেলে দিয়েছেন এতে মনে করতে হয় ঠাকুরের কৃপা। নিজেরা ওঁদের থেকে কত দূরে তা বোঝা যায় এতে। তাঁরা কত কাণ্ড করে সব ছেড়ে এসেছেন। কত চিঠি লিখেছে ফিরে যেতে। বাপ মা আত্মীয় স্বজনের কত কান্না। তাঁরা কি জন্য এই সব ত্যাগ করেছেন 'নুকতা'র (লৌকিকতার) জন্য? সংসারীদের জিনিস কেন থাকবে তাঁদের জিনিসের সঙ্গে? ও দেখলে এঁদের যন্ত্রণা হয়। ওঁরা তো সব সিদ্ধ পুরুষ নন, সিদ্ধ হবার জন্য এসেছেন। তাই অত বাছবিচার করে চলতে হয়। সিদ্ধ পুরুষদের কথা আলাদা। এঁদের এতে কিছুই হয় না। কিন্তু এঁরা, নূতনরা মাত্র সিঁড়িতে উঠেছেন। এঁদের যন্ত্রণা হবে না? তাই আগে থেকে প্রার্থনা করে যেতে হয় যাতে সাধুদের কোনও রকম

মনোকষ্ট বা অসুবিধা না হয়। কেন রাখতে যাওয়া এঁদের জিনিসের সঙ্গে? মুড়ি মিছরির এক দর?

বিবেকানন্দ আমাকে বলেছিলেন, অমুকমশায়ের কথা। বলেছিলেন, — 'এই দেখুন, ইনি এসে আমার বিছানায় শুয়ে পড়েন। শেষে আমি সব ছাড়লুম এই জন্যে?' Old friendship-তে (পুরাতন মিত্রতায়) এ রকম করছেন। ওঁদের সমান চলা। নিজেকে কত বড় বলে দেখান, এঁদের সঙ্গে same footing-এ (একই চালে) থেকে।

নামটা বলে ফেললাম। কেউ যেন আর না বলেন কারুকে। মুখ দিয়ে কেমন করে বেরিয়ে পড়লো। অতি সাবধানতার দরকার, তবে উভয় পক্ষের কল্যাণ। এ আগুন নিয়ে খেলা, তামাসা নয় — life and death-এর (জীবন্মৃত্যুর) প্রশ্ন। জগৎকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন এঁরা ঈশ্বরের জন্য। যথার্থ ভক্ত এঁদের মান দিবে, পূজা করবে, করজোড়ে থাকবে এঁদের কাছে।

রাত্রি দশটা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১৩ই জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীঃ। ২৯শে পৌষ, ১৩৩১ সাল, সংক্রান্তি।
মঙ্গলবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া, ১৬ দণ্ড। ১৫ পল।

একাদশ অধ্যায়

বিপ্লবী বিপিন পাল — নববিধানে

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতল। উত্তর দিকের বড় ঘর। শীতকাল। এখন অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া আছেন। সন্ধ্যা হয় হয়।

তিনি ছোট নলিনীকে দিয়া অন্তেবাসীকে চারতলা হইতে ডাকাইয়া আনাইয়াছেন। অন্তেবাসী তাঁহার চারতলার ঘরে স্টোভ জ্বালাইতেছিলেন। নলিনী গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, শ্রীম আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন নিচে। অন্তেবাসী উত্তর করিলেন, স্টোভটা ধরুক্, যাচ্ছি। নলিনী গিয়া এই কথা বলিলে শ্রীম বলিলেন — না, এক্ষুনি আসতে বলুন স্টোভ বন্ধ করে, খুব জরুরী কাজ। অন্তেবাসী আসিলে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (কৈফিয়তের সুরে) — একটা urgent (জরুরী) কাজ রয়েছে, তার জন্যই ডেকেছি। কাল রাত্রে গদাধর এঘরে শুয়েছিল। দরজা জানালা সব বন্ধ ছিল। কিন্তু মধ্য রাত্রে কে যেন জানালার খড়খড়ি জোরে নাড়াচ্ছিল। এমনতর কয়েকবার হয়েছিল।

অন্তেবাসী — বিড়াল নয় তো? ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল হয়তো।

শ্রীম — না। অত উঁচুতে বিড়াল কি করে উঠবে বাইরে থেকে? অন্য কিছু হবে।

শোনা যায়, এ বাড়িতে নাকি একটি অপঘাত মৃত্যু হয়েছিল অনেক আগে। তাই ভূত হতে পারে। আরও কেউ কেউ অমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

ভয়ের কারণ নেই কিছু। সবার জানা থাকা ভাল। জানা থাকলে মন বিচলিত হবে না। এই জন্যই ডেকেছি।

ঠাকুরবাড়িতেও কত ভৌতিক কাণ্ড হয়ে গেছে। (ভাটপাড়ার) ললিতবাবু জানেন। একদিন উনি বসে আছেন ঠাকুরঘরের সামনে। কে

এসে একটা জামবাটি ধপাস্ করে রেখে দিল। অথচ কোনও মানুষ নেই সেখানে।

ঘরের জিনিসপত্র সব উল্টোপাল্টা হয়ে পড়ে থাকে। ঠাকুরঘরে শেকল দিয়ে এসেছে। ও মা, কে যেন শেকল খুলে ঘরে গেল। নানা উৎপাত করে।

আমরা ওখানে না থাকলেই এ সব হয়। যেই আমরা গিয়ে ওখানে রইলাম অমনি কোথাও কিছু নেই, সব ঠাণ্ডা। (সহাস্যে) ভগবানের সঙ্গে ভূত প্রেত থাকে। এরা সহচর। বেতালা লোক দেখলেই ভয় দেখায়।

যাই হোক, সবাইকে এটা জানিয়ে দেবেন যাঁরা এখানে থাকেন মাঝে মাঝে। জানা থাকলে ভয় হবে না।

আজকাল শ্রীম-র তর সহ্য হয় না। যখন যেটা মনে উঠে তখনই সেটা করিতে হয়। বলেন, তা নইলে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। আরও বলেন, যদি ভুলে যাই। আরও বলেন, সব কাজ শেষ করে সর্বদা তৈরী থাকতে হয় for the 'Great Go' (মহাপ্রস্থানের জন্য)। নিজ গৃহে ফিরে যাবার জন্য। এখানে থাকা মানে, বিদেশে থাকা। নিজ নিকেতন ঠাকুরের কাছে, ঈশ্বরের কাছে।

আজ ১৪ই জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, ১লা মাঘ ১৩৩১ সাল। বুধবার, কৃষ্ণা চতুর্থী ১৮।১০ পল।

আজ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। সপার্ষদ শ্রীমকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বৎসরের ন্যায়। সকালের উৎসবে শ্রীম যাইতে পারেন নাই। সন্ধ্যায় যাইবেন। সারা দিনব্যাপী উৎসব।

ব্রাহ্ম ভক্তগণ সব আনন্দময় আজ। সমাজমন্দির নানা প্রকার পত্রপুষ্পে সজ্জিত। বৈদ্যুতিক আলোর যেন বন্যা আসিয়াছে। মন্দিরের ধুলিকণাটিও দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

শ্রীম ভক্তগণকে পূর্বেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিজে আসিলেন একবার। সকালে ও মধ্যাহ্নে শ্রীম-র আদেশে ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। আজকার দিনের শ্রেষ্ঠ কার্যটি সন্ধ্যারতি।

কেশববাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র আচার্য প্রমথ সেন, নন্দলাল প্রভৃতির হাতে ক্ষুদ্র

এক একটি দীপদান। তাহাতে প্রজ্জ্বলিত ক্যাণ্ডেল। ভক্তগণ জগন্মাতার আরতির গান গাহিতেছেন বিভোর হইয়া। মুখে অবিরত বুলি, 'মা মা'। সাময়িক ভাবে জগৎ যেন ভুলিয়া গিয়াছেন। বেদীর তিন দিকে সকলে দাঁড়াইয়া হাতের দীপদান উচ্চে নিচে ও সমান্তরালভাবে আন্দোলিত করিতেছেন। বড়ই ভক্তিরসসিঞ্চিত ও মনোমুগ্ধকর এই দৃশ্যটি! শ্রীম করজোড়ে উত্তর-পশ্চিম দরজার কাছে দাঁড়াইয়া এই দেবদৃশ্য আনন্দে দর্শন করিতেছেন। শ্রীম-র মুখমণ্ডল দিব্যশ্রীমণ্ডিত। ভক্তগণের ডান হাতে দীপদান। তাহার পবিত্র উজ্জ্বল আভায় তাঁহাদের প্রেমরসসিক্ত মুখমণ্ডলে আজ অপূর্ব দিব্যশ্রী।

নববিধান ব্রাহ্মমন্দির। মাঘোৎসব। এখন রাত্রি সাড়ে ছয়টা। শ্রীম মন্দিরের সম্মুখে ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন পশ্চিমাস্য। সঙ্গে জগবন্ধু, গদাধর ও ছোট নলিনী। শুকলাল ও বলাই পূর্বমুখী হইয়া শ্রীম-র অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীম আসিতেই নতশির হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তর লোকে পরিপূর্ণ। অত ভীড়ে শ্রীম-র কষ্ট হয়। মর্টন স্কুলের ভক্তগণ অনেকেই পূর্বেই আসিয়া বসিয়াছেন — 'ব্রুকবণ্ড', সুখেন্দু ও বিনয়, ছোট অমূল্য ডাক্তার ও বিজয় আর মোটা সুধীর প্রভৃতি। একটু পর আসিলেন বড় জিতেন।

শ্রীমকে লইয়া জগবন্ধু ও ছোট নলিনী বসিলেন মন্দিরের পশ্চিম দিকের উত্তরের দরজার বরাবর পূর্বাস্য। শ্রীমকে দেখিয়া আচার্য প্রমথ সেন আসিয়া অনুরোধ করিলেন ভিতরে সম্মুখে গিয়া বসিতে। শ্রীম করজোড়ে বলিলেন, এখানে বেশ। ভীড় ও লোকচক্ষু তিনি সর্বদা পরিহার করিয়া থাকেন। অগোচরে সব দর্শন করেন।

আজ ভারতরত্ন স্বনামধন্য বিদ্রোহী নেতা স্বদেশপ্রেমিক অনলবাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা করিতেছেন। বিষয় — পরলোকতত্ত্ব।

আজও মন্দিরাভ্যন্তরে আলোর নিবিড় বন্যা। মেঝেতে ফরাসের উপর বসিয়াছেন বয়োবৃদ্ধগণ, বিপিনবাবু প্রভৃতি। প্রথমে বিপিনবাবু বসিয়াই বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। পরে প্রাণের আবেগে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন।

বিপিন পাল (জনতার প্রতি) — হিন্দু ঋষিগণ মৃত্যুর পরও জীবের অস্তিত্ব থাকে, একথা স্বীকার করেছেন। এটি একটি প্রধান স্বীকারোক্তি,

যার উপর হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস স্থাপিত। বৌদ্ধ ও জৈন আচার্যগণও তা স্বীকার করেছেন।

ইহুদী, খ্রীস্টান ও মুসলমান ধর্মমতে এর প্রকাশ্য স্বীকার না থাকলেও স্বর্গ ও নরক স্বীকৃত হয়েছে। স্বর্গে সকলে জেহোবা, ফাদার বা আল্লার সঙ্গে অনন্তকাল বাস করবে যদি সৎ কর্ম করে। অসৎ কর্মে অনন্ত নরক। এও এক রকম অস্তিত্বই স্বীকার করা হল।

হিন্দুদের সকল মতের আচার্যগণই উহা স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, এই জগতে আমাদের যে জীবন — তা' ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য। এর পর নিত্যধাম আছে। সেখানে সকল জীবই একদিন যাবে। কারণ, এই নিত্যমুক্ত জীবত্ব বা শিবত্ব জীবের স্বরূপ। সেখানে সকলে ভগবানের সান্নিধ্যে অবস্থান করে। অনন্ত নরক হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন আচার্যগণ স্বীকার করেন না। আমরা সকলে গিয়ে সেই নিত্যধামে পুনরায় মিলিত হব, এইখানে যেমন আছি ইত্যাদি।

পৌনে আটটায় বক্তৃতা শেষ হইল। বিপিনবাবু আসিয়া শ্রীমকে নমস্কার করিলেন এবং আনন্দে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। সহাস্যে শ্রীম বলিলেন, আপনার কথায় এখনও বেশ জোর আছে, অত বয়স, তবুও। বিপিনবাবু হাসিয়াই উত্তর করিলেন, ডক্টর আমেদের কৃপায় কথা কইছি। উভয়েই হাসিতে লাগিলেন। বিপিনবাবুর মুখে নকল দাঁত। উজ্জ্বল আলোর আভায় দন্তপংক্তি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে রৌপ্যবৎ।

২

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বারান্দা। রাত্রি সাড়ে আটটা। সিঁড়ির পাশেই শ্রীম বসিয়া আছেন বেঞ্চে দক্ষিণাস্য। বড় জিতেন বসা শ্রীম-র বাম পাশে। তাঁহার বামে বসা ভক্তগণ। সকলেই দক্ষিণাস্য।

শ্রীম-র মস্তকে জড়ান গরম কম্ফোর্টার, গায়ে ওয়ার ফ্ল্যানেলের অ্যাশ কলার পাঞ্জাবী। তাহার উপর ভাঁজ করা গরম আলোয়ান।

ব্রাহ্মসমাজের আনন্দোৎসবের কথাই হইতেছে। এ-কথা সে-কথার পর বড় জিতেন উত্থাপন করিলেন, বিপিনবাবুর বক্তৃতার বিষয় — পরলোকতত্ত্ব।

বড় জিতেন — বিপিনবাবু শেষে বললেন, আমরা সকলে গিয়ে সেই

নিত্যধামে পুনরায় মিলিত হব, এইখানে যেমন আছি।

শ্রীম — এ কথায় মনে হয়, এঁর খুব domestic affection (পারিবারিক সম্প্রীতি) আছে। সংসারীদের পক্ষে এ খুব ভাল। সন্ন্যাসীদের পক্ষে এ কিছুই নয়। সন্ন্যাসীদের পক্ষে পাষাণে বুক বাঁধা — তবে হয়।

The wish is the father to the thought — যেমনি বাসনা, তেমনি ভাবনা। বেদান্ত বলেন, প্রারব্ধানুগামিনী বুদ্ধি। ঠাকুর বলেছিলেন, যার যেমন কামনা তার তেমন ভাবনা, তার তেমন লাভ। যেমনি ভাব, তেমনি লাভ।

আবার আছে, Man proposes God disposes. যে যা চায় ভগবান তাকে তাই দেন। যেমনি আকাঙ্ক্ষা তেমনি প্রাপ্তি।

যারা সংসারে পুত্র কন্যা পাঁচজনকে নিয়ে রয়েছে তাদের খুব appeal (হৃদয় স্পর্শ) করবে বিপিনবাবুর ঐ কথা। তা বলে কি সাধুকেও করবে? তা নয়।

সাধু একটি ভিন্ন জীব। ঈশ্বরলাভের জন্য সাধু পিতামাতা, গৃহসুখ, সব বিসর্জন দিয়েছে। পাষাণে বুক বাঁধা তার। ছেলেখেলা নয়। সাধু যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক।

সংসারীদের এ হয় না। স্নেহ মমতা কত কি এসে পড়ে।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — অনূল্যবাবুকে সেদিন বলেছিলাম এই কথা — সাধু একটি স্বতন্ত্র জীব। দেখতে মনে হয় যেন আমাদেরই মত। কিন্তু তা নয়। তাঁর ভিতর জ্বলে যাচ্ছে volcano-র (আগ্নেয়গিরির) মত। কিসে ঈশ্বরলাভ হয় সদা এই জ্বালা।

পিতামাতা সব ভাসিয়ে আসা কি ছেলেখেলা! তাই ঠাকুর বলতেন, পুলি দেখতে সব এক রকম। কিন্তু কারো ভিতর ক্ষীরের পুর, কারো ভিতর কলাই ডালের।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এঁর জামা ফেলে দিয়েছিলেন একজন সাধু। ইনি গিয়ে ওঁদের আলনায় রেখেছিলেন। তাতে অমূল্যবাবু রাগ করেছেন।

তা ফেলবেন না? এতো সব কাণ্ড করে কি শেষে এই করতে ওখানে

গেছেন? ওটি করায় বরং বুঝতে পারা গেল ওঁ-তে তোমাতে কত তফাৎ — a gulf abyss (অসীম অতল সমুদ্র)! 'মুড়ি মিছরির একদর? তা হলে শূলে যেতে হবে' — ঠাকুর বলতেন।

এঁরা কত কাণ্ড করে সন্ন্যাস নিয়েছেন। বাড়িতে মা হয়তো দিনরাত কাঁদছেন। তার ভিতর চলে এসেছেন। তুমি তো তা কর নি। তা হলে কেমন করে বুঝবে তাঁকে?

কত struggle (সংগ্রাম)! স্নেহপাশ কচ্‌কচ্‌ করে কেটে বের হয়ে এসেছেন। বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে বলতে হয় — সাক্ষাৎ মৃত্যুকে বরণ করে এসেছেন অমৃতের আশায়।

কোথায় থাকবে, কোথায় যাবে, অসুখে কে দেখবে, বৃদ্ধ বয়সে কে সেবা করবে, কি খাবে, কি পরবে — তার কিছুই ঠিক নেই। একেবারে uncertain life (অনিশ্চিত জীবন)। Uncertain life-ই (অনিশ্চিত জীবনই) মৃত্যু। কিন্তু অন্তরে সুদৃঢ় নিশ্চয়, অমৃতত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা। এই মরণপণ বাসনা।

সংসারে যতরকম speculations (অনিশ্চিত বস্তু লাভের আশায় ঝুঁকি নেওয়া) আছে, তার মধ্যে ঈশ্বরলাভের জন্য ঝাঁপ মারা সকলের চাইতে বড়। এর তুলনা নেই।

Negative side-এর (নেতির, লোকসানের দিক) দিয়ে দেখতে হলে ভয় হয় সন্ন্যাসের কথা শুনে। Positive side-টা (নিশ্চিত দিকটা) দেখলে ভরসা হয়।

সন্ন্যাস মানে কি? না, অখণ্ডে ঈশ্বরে মন দিয়েছে, ক্ষুদ্র বস্তু বা খণ্ড বস্তু, অর্থাৎ জগৎ থেকে মন তুলে। 'সন্ন্যাস' শুনতে একটা প্রকাণ্ড শব্দ শোনায়। কিন্তু তার মানে অতি সহজ — কিনা, অমৃতকে, ঈশ্বরকে বরণ করেছে।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — তারপর বিবেচনা করা উচিত, তাঁরা সব সিদ্ধপুরুষ নন। সিঁড়িতে উঠতে চেষ্টা করছেন। কেউ হয়তো দু'চার করে একটু উপরে উঠেছেন। তাঁদের বাছবিচার করে চলতে হবে না? নইলে যে পড়ে যাবেন যেটুকু উঠেছেন!

সংসারীদের সঙ্গ তাঁদের হানিকারক। আমরা যে তাঁদের দর্শন করতে পারছি, তাঁরা যে দয়া করে দর্শন দিচ্ছেন, এটা কত বড় সৌভাগ্য আমাদের! এদিক দিয়ে কেউ নজর করে না। অহংকারে স্ফীত হয়ে আমরা মনে করি আমাতে আর সাধুতে কোন তফাৎ নেই, বরং অনেকে মনে করে, আমরা অত লেখাপড়া করেছি। ওঁদের মধ্যে অনেকে তা' করে নি। আমরা তাদের চাইতে বড়।

মহামায়ার এই ভেল্‌কি! সাধুসঙ্গ করা কি চারটিখানি কথা। কত আটঘাট বেঁধে তবে হয়। নইলে উল্টো উৎপত্তি হয়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঐ সাধুটি যে এমন করেছেন — জামাটা ফেলে দিয়েছেন, একথা শুনে আমার খুব আহ্লাদ হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, ওঁর ভেতর সন্ন্যাসের তেজ রয়েছে। ঐ কথা — কেন গৃহস্থ এখানে জামা রাখবে — কি আর ঐ সাধু বলেছেন? যাঁর কাছে ভক্ত গিছলো, সেই ভগবানই ঐ সাধুর মুখ দিয়ে বলেছেন। তবে ভক্তের কল্যাণ হবে। সাধুর কল্যাণ তাতে। ঈশ্বর ঢেলা দিয়ে ঢেলা ভাঙ্গেন, ঠাকুর বলতেন।

সিদ্ধ পুরুষের আলাদা কথা। তাঁদের কিছুতে দোষ নেই। সোনা পাকা হয়ে গেছে — 'জিতসঙ্গদোষা'। (ডাক্তার বক্সীর প্রতি) — কি শ্লোকটা?

ডাক্তার বক্সী —

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥

(গীতা ১৫:৫)

শ্রীম — তাই মহাপুরুষদের দোষ নাই, সিদ্ধপুরুষদের। যার জন্য বাছবিচার করা সেই বস্তু তাঁদের লাভ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, আত্মা-সাক্ষাৎকার হয়েছে। এখন শরীর যাক্ বা থাক্, অথবা হীনভাবে থাক বা উচ্চভাবে থাক, একই কথা। তবুও যাঁরা লোকশিক্ষা দিবেন তাঁরা অনৈতিক কাজ করবেন না। তাতে সমাজ বিগড়ে যায়।

ঠাকুর বলতেন, যতদিন না সোনা ঢালাই হয়েছে ততদিন ছাঁচটা সযত্নে রাখে। সোনা ঢালাই হয়ে গেলে, অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেলে তখন অত সব বাছবিচারের দরকার হয় না।

বলতেন, ছাদে উঠবার সময় সব ত্যাগ করে উঠতে হয় সিঁড়িটিড়ি। একবার উঠে গেলে আর দরকার নাই অত বিচারের।

তাই সিদ্ধ পুরুষরা পারেন সব রকম লোকের সঙ্গে থাকতে। কিন্তু যারা কাঁচা অবস্থায় আছে তারা তো এসব বিচার আচার করবেই। কোথায় ওঁদের সাহায্য করতে যাওয়া, পূজা করতে যাওয়া ভগবানলাভে, অমন ধনলাভে, তা না করে আবার বিঘ্ন করা। শুধু কি তাই? উল্টে আবার ক্রোধ করা, অভিমান করা — কি, আমার জামা ফেলে দিলে, বলে!

তাঁর মহামায়াতে কি স্মরণ রাখতে দেয়? গুরুবাক্য ভুলিয়ে দেয়। হয়তো অনেক পড়েছে নিজে, অপরকে এ বিষয়ে কত উপদেশ দেয়। কিন্তু নিজের কাজের বেলায় সব ভুল হয়ে গেল। এই beautiful position (সুন্দর অবস্থা) মানুষের। তাই সর্বদা প্রার্থনা — ভুলিও না প্রভো, ভুলিও না, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলিও না।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই যে কখনও ভুলিয়ে দেন, কখনও আবার একটু light (জ্ঞান) দেন, এটা কেন? না, এটা একটা necessary evil, unavoidable - life's fitful fever (আবশ্যকীয় ও অপরিহরণীয় আপদ — মনুষ্যজীবনের আকস্মিক বিকার)। কেন এটা? তা হলে struggle (সংগ্রাম) জমবে ভাল। Opposition (প্রতিবন্ধ) না থাকলে শক্তি বৃদ্ধি হয় না। In a calm sea every one is a pilot (প্রশান্ত সাগরে সকলেই কর্ণধার)। তাই ওটি রেখে দিয়েছেন। পাকা নাবিক তৈরী হবে বলে।

সমস্ত জগতে এই খেলা চলছে। একটা positive force (অনুকূল শক্তি) আর একটা nagative force (প্রতিকূল শক্তি)। এ দু'টোর action and reaction-এ (ঘাত প্রতিঘাতে) এ জগৎ চলছে, এই relativity work (পারস্পরিকতা কাজ) করছে। এ না থাকলে সব সাম্য (equilibrium, unity), অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যিনি বাক্য-মনের অতীত সেই চরম সত্য বস্তু পরমব্রহ্ম।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ঠাকুর তাই বলেছিলেন, রোগ সর্বদা লেগে আছে। বাস্তবিক সর্বদাই লেগে আছে। আবার এই রোগের প্রতিকারের

উপায়ও বলে দিছলেন। বলেছিলেন — সাধুসঙ্গ কর, নিত্য নিয়মিত সাধুসঙ্গ without fail (অনলসভাবে)। যেমন আহার নিদ্রা শৌচাদি, তেমন ভাবে সাধুসঙ্গ করা। Parenthetically (সুবিধামত) করলে হবে না। একদিন গেলুম বছরে, তাতে হয় না। যেমন স্ত্রীপুত্রের সেবায় মন আপনিই যায়, তেমনি সাধুসঙ্গ, সাধুসেবায় যেদিন মন যাবে সেদিন পাকা হল। প্রথম, গুরুবাক্য শুনে করতে হয়, জোর করে করতে হয়। তারপর সহজ হয়ে যায়।

সাধুসঙ্গ হলে সব তফাৎ বোঝা যায়। তা না হলে, নিজেদের মনমত শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের অর্থ করেনেয়। (সহাস্যে) কতকগুলি absurdity (অযৌক্তিক কল্পনা) ঢুকিয়ে দেয় to suit the agreeability (মনোরঞ্জনের অনুকূল)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — Truth-এর, সত্যের, criterion (মানদণ্ড) আছে নাকি (হাস্য)? শাস্ত্র, গুরুবাক্য — অবতারের যেসব truth, uncompromising truth (সত্য, অবিমিশ্র সত্য!) তার আবার criterion (মানদণ্ড) করবে কে?

যিনি truth-কে (সত্যস্বরূপকে) জেনেছেন তাঁর বাক্যে বিশ্বাস, বালকের মত বিশ্বাস চাই গুরুবাক্যে, তবে হবে।

Truth-এর criterion Truth (সত্যের মানদণ্ড সত্য) স্বয়ং। যিনি Truth-কে (সত্যস্বরূপকে) জানেন, তিনিও Truth (সত্যস্বরূপ) হয়ে যান। 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুন্ডক ৩:২:৯) — বেদের কথা। নুনের পুতুল সমুদ্রে গেলে সমুদ্র হয়ে যায়, ঠাকুরের কথা।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — কিন্তু ওদের (শুধু পণ্ডিতদের) ঐ, নিজের মনগড়া অর্থ করা। সংসারীদের পক্ষে এটা খুব ভাল লাগে — মনোরোচক, মুখরোচক। কিন্তু তারা জানে না কোন দিকে তাদের নৌকা চলছে মনগড়া অর্থে — to destruction to utter annihilation (ধ্বংসের দিকে, একেবারে নিশ্চিহ্ন বিনাশের দিকে) চলছে।

তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'broad is the way that leadeth to destruction and narrow is the way which leadeth unto life.'

'ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া', ক্ষুরধার পথ — বেদের কথা।

'দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।' (কঠো ১:৩:১৪)

একজন একটা অতি সুন্দর expression use (কথা ব্যবহার) করেছেন — 'Chattering for a set of gluttons!' 'Gluttons' মানে পেটুক অর্থাৎ অসংযমী। সংসারীদের সম্বন্ধে ঐ কথা বলেছেন। যে বক্‌বক্ করে আর যাদের জন্য করে, উভয়ই ঐ। মানে, যে যত বড়ই হোমরা চোমরা হোক, স্বরূপ ঐ কামিনীকাঞ্চনে মন পড়ে আছে। একদিন পঞ্চবটিতে বটতলায় বসে ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আদিকে বলেছিলেন এই কথা। এদেরই gluttons (কামিনীকাঞ্চনাসক্ত) বলা হয়েছে।

পাষাণে বুক বাঁধলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। 'Isaac must be sacrificed at the alter of Jehova' (জেহোবার কাছে অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য আইজাককে অর্থাৎ পুত্রকে বলিদান করলে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়)। নিজের পুত্র বলি দিয়ে তবে ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছিলেন। এব্রাহামের ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কওয়ার দক্ষিণা সর্বস্ব ত্যাগ।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, ঠাকুর কি এক একটা কথাই বলেছেন! বলেছিলেন — কুলোতে মুড়কি আর ঠেকে চাল। ইঁদুরগুলো চালের সন্ধান পাচ্ছে না। সামনে মুড়কি দেখে সারারাত ঐ নিয়ে কড়র মড়র করছে। অত কাছে চাল কিন্তু তার সন্ধান করছে না। আহা, কি চিত্রটি reveal (প্রকটিত) করে দিয়েছেন এই একটা example-এ (উদাহরণে)! এটি সারাজীবন ভাবলে একজন সিদ্ধ হয়ে যায়। তার আর কিছুরই দরকার হবে না।

৩

শ্রীম এবার একটু দীর্ঘকাল ধরিয়া নীরব রহিলেন। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই যে আমরা এতো উৎসবে যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি — এইমাত্র যা নববিধান ব্রাহ্মসমাজে দেখে আসা হলো? এর উত্তর তিনি ক্রাইস্টের মুখ দিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রাইস্ট বলেছিলেন, For where two or three are gathered together in my name,

there am I in the midst of them.' (যেখানে দু' তিন জন ভক্ত আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে উপস্থিত হই)। তাই তিনিই আমাদের নানা স্থানে, নানা উৎসবে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর আনন্দ উপভোগ করার জন্য। এতো সব নেমন্তন্ন তিনিই পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

আর একটা কি আছে ভাগবতে, 'তত্র তিষ্ঠামি নারদ'?

একজন ভক্ত — নাহং বৈকুণ্ঠে তিষ্ঠামি যোগীনাম্ হৃদয়ে ন চ।
যত্র মদ্ভক্তাঃ গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা কি কথা! সত্য-সত্য সত্য কথা। জীবন্ত জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞা।

শ্রীম পুনরায় নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আমরা এই চোখে দেখেছি না ঠাকুরকে। ঠাকুর ছিলেন নিত্যোৎসব — অষ্টপ্রহর উৎসব, সারা জীবন উৎসব! একবার তাঁকে দর্শন করলেই মন পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর এ মনে কর নিত্য উৎসব, দিনের পর দিন উৎসব, বছরের পর বছর উৎসব, দিবানিশি উৎসব। আহা, অমন জীবন্ত উৎসব কি আর হয় গা!

তাঁকে দর্শন করে যে আনন্দ হতো, হাজার তপস্যাতেও তা হয় না।

তিনি যখন কথা কইতেন, শুকদেব বা নারদ যেন কথা কইছেন — এ কথা বললেও সবটা বলা হলো না। আভাসমাত্র দেওয়া হলো। ঠাকুর তারও উপরে, অতি ঊর্ধ্বে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ। ঠাকুর সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিজ হাতে ব্রহ্মানন্দ বিতরণ করছেন।

শ্রীম — আর একটা কি কথা আছে, মনে পড়ছে না। যেখানে তাঁর কথা হয়, চিন্তা হয়, সেখানে সর্বতীর্থের সমাগম হয়। কি সেটি?

একজন ভক্ত — আচার্য সূত গোস্বামীর কথা।

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ ত্রিবেণী গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র, যত্রাচ্যুতোদার কথাপ্রসঙ্গঃ॥

শ্রীম — আহা কি কথা! যেখানে ভগবানের কথা হয় সেখানে গঙ্গাযমুনাদি সর্বতীর্থের সমাগম হয়। তাই তো উৎসবে যাওয়া। নেমন্তন্নের ছড়াছড়ি। কত আনন্দ হচ্ছে তাঁকে নিয়ে। যে চায় তার অফুরন্ত আনন্দ,

সর্বদা মিলে। নেমন্তন্ন মানে, যেখানে গেলে আপনিই অধিক আনন্দ লাভ হয়, সেই জমাটবাঁধা আনন্দলাভের স্থান।

উৎসবের নেমন্তন্ন চিঠি দিয়ে হয়, মুখেও হয়, আবার শুনেও হয়। ঠাকুর রামবাবুকে বলেছিলেন এই 'শুনে'-নেমন্তন্নের কথা। বলেছিলেন, যেখানে ভগবানের নাম-গুণকীর্তন হয়, উৎসব হয়, সেখানে শুনেই যেতে হয়, নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করে। অধরবাবুর বাড়িতে উৎসব, ঠাকুর আসবেন। নিমন্ত্রণের ভার ছিল রাখালের উপর। রামবাবুকে বলতে ভুলে গেছে। রামবাবু এসেছেন বটে কিন্তু মনে অভিমান। তখন ঠাকুর ঐ কথা বলেছিলেন, উৎসবে বিনা নিমন্ত্রণেও যাওয়া যায়।

বাড়িতে কড়াইয়ের ডাল তো আছেই। নেমন্তন্নে গেলে ভাল আহার মিলে। নিজের সাধন ভজনের আনন্দ তো আছেই। মাঝে মাঝে উৎসবে গেলে আরও আনন্দলাভ হয়। একেই নেমন্তন্ন বলা হচ্ছে।

বড় জিতেন — রবাহুত হলে?

শ্রীম — হাঁ। (প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের সুরে) অনেকে (বড় জিতেন) আবার যায় না। মনের জোর নেই। চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। ও কি ব্যবহার? ও কি রকম মনের জোর?

সি.আর. দাশ. — অত অসুখ। একটা স্ট্রেচারে করে কাউন্সিলে এলেন। সঙ্গে দু'জন ডাক্তার। উঃ, কি মনের জোর! তবে তো ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে হারিয়ে দিলেন।

কিসে যেন পড়েছিলাম। সৈন্যদের জ্বর হয়েছে। শত্রুরা তখন আক্রমণ করতে আসছে। কমাণ্ডিং অফিসার (সেনাপতি) বলছেন, সৈন্যগণ ওঠ। অগ্রসর হও। শত্রুর সম্মুখীন হও। তা না করলে তোমাদের পিতামাতা বন্দী হবে। স্ত্রী পুত্র কন্যার প্রাণ যাবে। ধন ঐশ্বর্য সব নষ্ট হবে। দেশ পরাধীন হবে। ওঠ ওঠ! এগিয়ে চল — March, march forward, march! এগিয়ে চল। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ কর। এইসব বলে সৈন্যদের উত্তেজিত করতে লাগলেন। তখন কোথায় গেল জ্বর! কোথায় গেল অসুখ! সব ভুলে গেল। দেশরক্ষার জন্য উঠে দাঁড়াল। একে বলে মনের জোর।

শ্রীম (ডাক্তার বক্সীর প্রতি) — কত তো বলে গেলেন তিনি। তা

শুনছে কে? চেয়ারে বসে খালি বক্‌বক্‌ করছে।

(সহাস্যে) তাই ঠাকুর বলতেন, বৈষ্ণবচরণ বলে নরলীলায় যদি বিশ্বাস হলো তবে হয়ে গেল। ইঙ্গিত করতেন, আমি ঈশ্বর। এখন মানুষ হয়ে এসেছি। আমার কথা শুনলে পরম সুখ পরম শান্তি লাভ হবে।

কিন্তু তাঁর একথা নেয় কে? বরং উল্টোটা নেয়। তাঁর এক একটা কথা এক একটা মহাবাক্য। বেদমন্ত্র সব। কিন্তু নেবার যো নেই। তাঁরই মহামায়ায় দৃষ্টি উলটিয়ে দেয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — তিনি একটু light (দৃষ্টিশক্তি) দিয়েছেন বলে আমরা এসব কথা বলছি। আবার টেনে নিলে থাকবে না।

তাঁর শক্তি ছাড়া লোকশিক্ষা হয় না। তিনিই শক্তি দিয়েছেন, তিনিই বলাচ্ছেন। টেনে নিলে সব স্থির। অর্জুন গাণ্ডীব উঠাতে পারলেন না।

রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইলেন। ভক্তরা কেহ কেহ নমস্কার করিয়া নিচে নামিতেছেন। একজন ভক্ত হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া সিঁড়ির নিচে আলো দেখাইতেছেন। ডাক্তার বক্সী সিঁড়ির নিচে প্রথম ধাপে দাঁড়াইয়া শ্রীম-র সহিত কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার বক্সী — আজ্ঞে, প্রতিগ্রহ মানে কি? পতঞ্জলি দেখছিলাম। বোঝা যাচ্ছে না।

শ্রীম — দান গ্রহণ করা। কে দান গ্রহণ করতে পারে, ঠাকুরের মুখে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, যিনি সৎ ব্রাহ্মণ, সর্বদা যিনি তাঁকে ডাকছেন, কেবল তিনিই গ্রহণ করতে পারেন দান। তাঁর কিছুতেই দোষ নেই। তিনি হাড়ীর বাড়ি হতে নিলেও দোষ নেই। অসৎ ব্রাহ্মণ হলেই দোষ।

প্রসাদের বেলা ঐ নয়। তখন মাথায় তুলে নিতে হয়, যে-ই দিক। বাপ মা কিছু দিচ্ছেন, গুরু কিছু দিচ্ছেন, সেও মাথায় করে নিতে হয়। তখন বুঝি বলবে — না, আমি প্রতিগ্রহ করবো না। এইসব কথা শুনেছিলাম তাঁর মুখে।

ভক্তগণ বিদায় লইতেছেন। শ্রীম উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, যান আপনারা বাড়ি। তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে যান। এই মহাবাক্যটি ভাবুন — 'নরলীলায় বিশ্বাস হলে হয়ে গেল।' স্পষ্ট করে বলে গেছেন, 'যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই আমি। এবার এই শ্রীরামকৃষ্ণশরীর ধারণ করে এসেছি।' বলেছেন,

'আমার কথায় বিশ্বাস কর। তা হলে মায়া অতিক্রম করতে পারবে। আর পরম শান্তি আর শাশ্বত সুখ লাভ করতে পারবে।'

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১৫ই জানুয়ারী ১৯২৫ খ্রীঃ। ২রা মাঘ ১৩৩১ সাল।
বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা পঞ্চমী, ১ দণ্ড। ৪৫ পল।

দ্বাদশ অধ্যায়
শান্ত হও আগে, শান্তি দাও পরে

১

মর্টন স্কুল। সকাল আটটা। শ্রীম ছাদে দাঁড়াইয়া আছেন, অন্তেবাসীকে ডাকিতেছেন। অন্তেবাসী তাঁহার টিনের ঘর হইতে বাহিরে আসিলে শ্রীম তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — আমেরিকার ব্যারোজ লেকচারার কোথায় বক্তৃতা দিবেন? এ্যালবার্ট হলেই হবে কি? যাই হোক, আপনারা গিয়ে শুনে এসে আমাদের রিপোর্ট দিবেন। সুবিধা হলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মাঘোৎসবও চুপি দিয়ে দেখে আসবেন। এসে আমাদের বলবেন।

অপরাহ্ন সাড়ে চারিটা। ডক্টর গিলকি (Dr. Gilkey) এ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা দিতেছেন। 'ডক্টার ব্যারোজ লেকচারশিপ' প্রতি পাঁচ বৎসর পর হয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। এবার ভারতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সাতটা বক্তৃতা হবে। সবগুলিই ক্রাইস্টের সম্বন্ধে। আজ আরম্ভ হইল। অন্তেবাসী বক্তৃতা শুনিয়া আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব দেখিয়া রাত্রি সাড়ে সাতটায় মর্টন স্কুলে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীম দ্বিতলের বৈঠকখানায় মেঝেতে বসিয়া ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। অন্তেবাসী আসিয়া প্রণাম করিয়া মাদুরে বসিতেই শ্রীম তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — হাঁ, কি কথা হলো? আপনার অপেক্ষায় আমরা বসে আছি।

অন্তেবাসী — পিসীমা যা যা বলেছিলেন তাই ঠিক, শেষে তাই হলো।*

*যুবক রাজেন ঘোষ নব্য শিক্ষিত। কয়েকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা বেলায় তুলসীতলায় পিসীমাকে প্রদীপ দিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'এসব কুসংস্কার ছাড়।' পিসীমা বলিয়াছিলেন, 'বাবা, আশীর্বাদ কর তুলসীতলায় যেন আমার মতি থাকে।' তারপর নানা

শ্রীম (কৌতুহলানন্দে) — কি, ভারতবর্ষের কথা কিছু বললেন?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে না। তবে মহাত্মা গান্ধীর নাম করলেন বললেন, মহাত্মা গান্ধী খ্রীস্টধর্মের প্রতিনিধিমণ্ডলীকে (Christian Deputation) আদেশ করেছিলেন, 'Go to the world of the Christ, and follow Him sincerely' (ক্রাইস্টের ধর্মজগতে যাও, আর অকপটে তাঁকে অনুসরণ কর।'

শ্রীম — আহা, মহাত্মা গান্ধীর জন্য সমস্ত জগৎ উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। অবতারবিশেষই বলতে হয়। স্বামীজীর নাম করলেন কি?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম — 'বিবেকানন্দ' বললেন, কি 'স্বামী বিবেকানন্দ'?

অন্তেবাসী — 'স্বামী বিবেকানন্দ'। এটাই ring (ধ্বনি) করছে আমার কানে।

শ্রীম — কি বললেন?

অন্তেবাসী — বললেন, 'The spiritual awakening in America has been inaugurated by the charming and impressive personality of Swami Vivekananda.'

আমেরিকাবাসীদের অধ্যাত্ম জীবনের জাগৃতির অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার সুমধুর ব্যক্তিত্ব যেমনি ছিল মনোহর, মানব-হৃদয়ে অজ্ঞাত সুগভীর প্রভাব বিস্তারে তেমনি ছিল সমর্থ।

শ্রীম — বক্তৃতার বিষয় কি ছিল? আর কি বললেন বলুন?

অন্তেবাসী — বিষয়, Christ and the present Christianity. (ক্রাইস্ট ও বর্তমান খ্রীস্টধর্ম)। প্রথমে বললেন — আমেরিকা, ইজিপ্ট ও পালেস্টাইনের ছাত্রসমাজ তাঁর মারফৎ ভারতীয় ছাত্রসমাজকে সপ্রেম

অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়া রাজেন হইলেন চরণদাস বাবাজী। দৈবাৎ শ্রীম-র সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা হয় জগন্নাথ মন্দিরে, পুরীতে। আনন্দে শ্রীমকে ধরিয়া লইয়া গেলেন তাঁহার জাজপেটার মঠে। তিনি এখন পুরীর বড় বাবাজী, বৈষ্ণব সাধু। কি করিয়া এই অবস্থা হইল কৌতুহলী শ্রীম-র এই প্রশ্নের উত্তরে বাবাজী এই কথা বলিয়াছিলেন — 'পিসীমা যা বলেছিলেন তাই ঠিক। শেষে তাই হলো।' শ্রীম ভক্ত মজ্‌লিশে বহুবার এই কথা বলিয়া আনন্দ করিতেন। আর নব্য শিক্ষিত পথভ্রান্ত যুবকদের, ঈশ্বরই শেষে একমাত্র অবলম্বনীয়, এইকথা বলিয়া সত্য পথ প্রদর্শন করিতেন।

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে। তারপর তাঁর নিজের বিষয়বস্তুর বিস্তার করেছেন।

ডক্টর গিল্‌কি বললেন, বর্তমান জগৎ এক মহা অশান্তির ভেতর দিয়ে চলছে। সকলে শান্তির জন্য ব্যাকুল। যুদ্ধবিগ্রহে মানবগণ ভীত। বিগত (প্রথম) বিশ্ব-মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াই এই অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ। সকলের প্রাণ চাইছে শান্তি, শান্তি, প্রশান্তি। কিন্তু কোথা থেকে শান্তি আসবে, কি করে মানব-সমাজ পরস্পর সখ্যসূত্রে বদ্ধ হবে তার সন্ধান কেউ জানে না।

শান্তির অবতার প্রশান্তমূর্তি ক্রাইস্টকে যদি আশ্রয় করে মানব-সমাজ, তবে অনায়াসেই এই প্রার্থিত শান্তি লাভ করতে সমর্থ হবে।

ক্রাইস্ট বিশ্ববাসীকে প্রশান্ত, গম্ভীরকণ্ঠে আহ্বান করেছেন, "Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest... ... For my yoke is easy, and my burden is light.' (St. Matt. 11:28-30)

যারা সংসারভারে নিপীড়িত, নিরাশার অন্ধকারে যাদের মন নিমজ্জিত, তোমরা সব আমার কাছে এস। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি তোমাদের শান্তি প্রদান করব। .. ... আমার বিধান অতি সহজ, তাই ভার অতি লঘু।

বার্নার্ড শ, উড্রো উইলসন, হার্ডিঞ্জ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি এই মত সমর্থন করেন। তাঁদের লেখা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে বক্তা দেখালেন, ক্রাইস্ট একমাত্র ভরসা বর্তমান জগতের। তারপর আমেরিকায় ধর্মের নবজাগরণ সম্পর্কে স্বামীজীর নাম উল্লেখ করে বললেন, স্বামী বিবেকানন্দের আগমনে আমেরিকায় ধর্ম জীবন্ত রূপ ধারণ করেছে।

শ্রীম — 'পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়ানস'-এর নাম করলেন কি?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে না।

শ্রীম — ঐ 'পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়ানস'-এর অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন ডক্টর ব্যারোজ, যাঁর নামে এই লেকচারশিপ। স্বামীজী আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে এলে ডক্টর ব্যারোজ ভারতে এসেছিলেন। বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। কিন্তু impress (হৃদয়ে রেখাপাত) করতে পারলেন না। শুনেছি, তিনি ফিরে গিয়ে স্বামীজীর সম্বন্ধে অপপ্রচার করেছিলেন।

ঠাকুরকে বাদ দিয়ে কেবল ক্রাইস্টের কথা বললে, শুনবে কি লোক এখন?

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মিশনারিরা প্রায়ই বড় গোঁড়া হয়। তাই কাজ হচ্ছে না অত কথা বলেও। লোক তো কেবল কথা শুনতে চায় না। দেখতে চায় যিনি কথা বলেছেন, তাঁর সে বস্তু লাভ হয়েছে কিনা।

শান্তি শান্তি করলেই কি শান্তি হয়? এই 'লিগ অব নেশানস্' চীৎকার করছে শান্তি শান্তি করে। কি করে হবে শান্তি? যাঁরা শান্তিবাণী প্রচার করছেন তাঁদের ভিতর কি ঐ শান্তি স্থাপিত হয়েছে? তবে অন্যকে দিবে কি? তাঁদের ভিতর সব কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষা দ্বেষে ভরপুর। এঁরা কি করে শান্তি দিবেন?

ক্রাইস্টের কথা, যে নিজে পালন করবে তার কথা অন্যে শুনবে। শুধু নাম করলে কেউ শুনে না। আর যে ক্রাইস্টকে প্রচার করবে তাকে সর্বত্যাগী হতে হবে। ক্রাইস্টের apostles (অন্তরঙ্গ প্রচারকগণ) সব সর্বত্যাগী ছিলেন।

ক্রাইস্ট নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the son of man hath not where to lay his head.' (St. Matt. 8:20 & St. Luke 9:58)

শৃগালদের থাকার গর্ত আছে। আকাশের পাখীদের বাসা আছে। কিন্তু মানুষের ছেলে আমার মাথা গুঁজবার স্থান নাই।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শান্তির আশ্রয় শ্রীভগবানের চরণকমল। আর অশান্তির আশ্রয় সংসার। ঈশ্বর শান্ত, জগৎ অশান্ত। এই অশান্ত জগতে বাস করে কি করে শান্তিলাভ হয় তা দেখাতেই ভগবান বারবার অবতার-শরীর নিয়ে আসেন। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণাদি অবতারগণের নর-শরীর ধারণ।

এঁরা সকলেই একই কথা বলেছেন। তা পালন করেছেন, যা বলেছেন।

এই সংসার অশান্ত। মানুষের মনকে টেনে নিয়ে ফেলে দেয় বিষয়ে — রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শে। বিচারের দিক দিয়ে বলতে হলে বলতে হয় এই সংসার শান্ত-অশান্ত। এর মানে, প্রার্থিত বস্তু লাভ হলে শান্তি। লাভ না হলে অশান্তি। অথবা লাভ করে শান্তি, লাভ করে আবার যখন

হাতছাড়া হয় তখন অশান্তি। আজ পুত্র হলো, ধন হলো, অমনি শান্তি। কাল পুত্র গেল, ধন গেল, অশান্তি। চিরশান্তি সংসারে নেই। ঐ-টি শ্রীভগবানের কাছে।

গীতায় এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। বলেছেন,

'ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্' (গীতা ২:৬৬)।

আর এক স্থানে বলেছেন এই কথাই,

'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্" (গীতা ১৮:৬২)। এর মানে, যার ভগবৎ ভাবনা নাই, যে ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত নয় চিন্তাদ্বারা, তাঁর শান্তি নাই। আর শান্তিহীনের সুখ কোথায়? এই কথাই ঠাকুর বলেছেন — এক হাতে তাঁকে ধর, আর এক হাতে সংসার কর। সময় হলে দু'হাতে তাঁকে ধরলেই ঠিক ঠিক শান্তি পাবে। কথাটা হচ্ছে, 'আমি কর্তা' এই বুদ্ধিকে 'ঈশ্বর কর্তা'-তে পরিবর্তন করা, তবে শান্তি। তাঁর সঙ্গে এক হতে পারলেই শান্তি।

এই এক হওয়া যায় সমাধিতে। আর তা না হলে দাসীভাবে থাকা। বড় ঘরের দাসীর মত নিজের ঘরে থাকা। এই শরীর মন আত্মা তাঁর জিনিস। তাঁকে ফিরিয়ে দিলে শান্তি। এই শরীর মন বুদ্ধি দ্বারা যা কাজ হয় তার ফল তুমি নিও না। তাঁকে ফিরিয়ে দাও। দেহধারণের জন্য যতটা না নিলে নয় ততটা নাও।

দাসীভাবে থাকা — সাধকভাবে ও সিদ্ধভাবে — দুই ভাবেই থাকতে হয় মানুষকে।

একজন ভক্ত — বিচারের দিক দিয়ে ফিলজফি তো বুঝা খুব সহজ। হাতে আনতেই তো অত কষ্ট।

শ্রীম — তাই তো তিনি নিজে মানুষ হয়ে এসেছেন এসব শিখাতে। নিজে আচরণ করেছেন মায়ের ছেলে হয়ে। আবার ভক্ত তৈরী করে গেছেন কি করে দাসীভাবে থাকতে হয় তার জীবন্ত মডেল বানিয়ে। তাঁদের পথ ধরলে সহজ হয়ে যায়।

দাগা বুলোতে বলেছেন। তাই আমাদের করা উচিত।

তিনি ভক্তদের শান্তিলাভ করিয়ে গেলেন। তাঁদের ঈশ্বরদর্শন করিয়েছেন। তাঁর কৃপায় শত ধাক্কাতেও তাঁরা তাঁকে ছাড়েন না তাই

সর্বাবস্থায় শান্ত।

নিজে শান্তির স্বরূপ। কতকগুলির ভিতরে এই শান্তি ঢুকিয়ে যান। তারা অপরকে শান্তি দেয়। যাদের নিজের শান্তি লাভ হয়েছে তারাই অপরকে ঐ পথ দেখিয়ে দিতে পারে। মানুষের কর্ম নয় ঈশ্বর সম্পর্ক ছাড়া শান্তি লাভ করা। যদি কাউকে শান্ত করতে চাও তবে নিজে শান্ত হও।

শ্রীম ভোজন করিতে তিনতলায় গেলেন ভক্তদের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠে নিরত রাখিয়া। যতীন ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ পাঠ করিতেছেন। শ্রীম ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, যিনি ভগবান তাঁর কেন এসব সংস্কার গ্রহণ? তার উত্তর নিজেই দিয়ে গেছেন — লোকশিক্ষার জন্য। অবতার সম্পূর্ণ মানুষ আর সম্পূর্ণ ঈশ্বর। মানুষভাবে মানুষের জন্য এসব সংস্কার নিয়েছেন। 'আমি সন্ন্যাসী', 'আমি ভক্ত' এসব অহংকার ভাল। এতে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়।

পরের দিন স্বামীজীর জন্মোৎসব মঠে। শ্রীম বেলা একটায় গৌরী, রমণী ও জগবন্ধুকে মঠে যাইতে বলিলেন। গৌরী ঠাকুরের ভক্ত মনোমোহনের একমাত্র সন্তান। ইঁহারা তিনজনেই মর্টনের শিক্ষক। শ্রীম গেলেন গদাধর আশ্রমে। ভক্তরা মঠ হইতে শ্রীম-র জন্য প্রসাদ আনিয়াছেন। শ্রীম কণিকামাত্র লইয়া ভক্তদের বসাইয়া প্রসাদ খাওয়াইলেন।

মর্টন স্কুল কলিকাতা।
১৬ই জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীঃ। ৩রা মাঘ, ১৩৩১ সাল।
শুক্রবার। কৃষ্ণা ষষ্ঠী। ১৮।৫ পল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পার্ষদ সন্ধানে — এজেণ্ট শ্রীম

১

মর্টন স্কুল। মাঘ মাস। সকাল সাতটা। ছাদে অন্তেবাসীর টিনের ঘরের সম্মুখে শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন পশ্চিমাস্য। অন্তেবাসী ঘরের ভিতর। তাঁহাকে বলিতেছেন, একবার নব বিভাকর প্রেসে গেলে হয়। কত দেরী হবে প্রুফ পাঠাতে জিজ্ঞাসা করা।

একটু পর নিচে নামিয়া গেলেন। অঙ্গনে মর্টন স্কুলের রবিবাসরিক ধর্মসভা — 'সৎপ্রসঙ্গ-সভা'র অধিবেশন হইতেছে। আজের আলোচনার বিষয়, 'স্বামী বিবেকানন্দ।' গতকাল তাঁহার জন্মতিথি ছিল।

শ্রীম এখানে অল্পক্ষণ মাত্র বসিয়া নববিধান ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব দর্শন করিতে গমন করিলেন। যাইবার সময় সভাপতিকে বলিয়া গেলেন, ইনি বলবেন আজ স্বামীজীর কথা। এঁরা তাঁর ভক্ত, অনেক কথা জানেন। অন্তেবাসী মর্টনের শিক্ষক। অগত্যা তিনি কিছু বলিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যে শ্রীম ফিরিয়া আসিলেন। সভা সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। অমৃতাদি ভক্তগণ এখনও বেঞ্চে বসিয়া আছেন। তাঁহারাও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীম ফটকে উপস্থিত হইলে ভক্তগণ উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শ্রীম অমৃতের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। এখন সকাল সাড়ে দশটা। অন্তেবাসী পাশে দাঁড়ানো।

শ্রীম হঠাৎ অন্তেবাসীকে কহিলেন, মনটা দক্ষিণেশ্বর যেতে চাইছে। কি করে যাওয়া যায়? অন্তেবাসী উত্তর করিলেন, তার ব্যবস্থা করছি। ছোট নলিনী এখানে আছেন। তাঁকে এখনই ডাক্তারবাবুর বাড়ি পাঠান হচ্ছে। ডাক্তার বক্সী মোটর লইয়া আসিলেন সাড়ে তিনটায়। সঙ্গে বিনয় ও ছোট নলিনী।

শ্রীম বসিলেন পিছনের সিটে ডান হাতে। তাঁহার বামে ডাক্তার।

তাঁহাদের সম্মুখে বেবী সিটে বসিলেন অন্তেবাসী। আর ড্রাইভারের পাশে বসিলেন বিনয় ও ছোট নলিনী।

আমহার্স্ট স্ট্রীট হইতে মোটর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। শ্রীম উদ্দেশ্যে যুক্ত করে ঠনঠনিয়ার মা কালীকে প্রণাম করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অল্প বয়সে যখন রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে ও অন্যত্র নিত্য দেবপূজা করিতেন তখন প্রত্যহ আসিয়া এই মা কালীকে গান শুনাইতেন। তাই শ্রীম-র অতি প্রিয় ও পবিত্র এই স্থান। তিনিও কখনও একাকী, কখনও ভক্তসঙ্গে এখানে সর্বদা আসিয়া থাকেন। এই কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা শঙ্কর ঘোষের পৌত্র খোকা মহারাজ ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত আর শ্রীম-র অতি প্রিয়জন।

বালক খোকা পনর ষোল বছর বয়সে ঠাকুরকে দর্শন করেন। এই বয়সে ইচ্ছা থাকিলেও সর্বদা দর্শন করা চলে না। হাতে পয়সা নাই। দক্ষিণেশ্বর পাঁচ মাইল দূর। আবার বাড়ির লোকের মত নাই। ঠাকুর খোকাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন আপনজন। কি করিয়া খোকা ঠাকুরের জীবনী ও বাণী অধিক করিয়া জানিতে পারেন সেই জন্য ঠাকুর ভাবিয়া ঠিক করিলেন একটি উপায়। ভাবিলেন, মহেন্দ্রের বাড়ি গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে। আর খোকার বাড়ি শঙ্কর ঘোষের লেনে। অতি সন্নিকটে একই পাড়ায় তাই মহেন্দ্রের কাছে গেলে 'এখানকার' কথা জানিতে পারিবে। আর তাহাতে বাড়ির লোকের আপত্তি হইবে না। কারণ মহেন্দ্র হেডমাস্টার, পাড়ার লোক। অধিকন্তু বালক খোকা মহেন্দ্রের সঙ্গে কখনও এখানে আসিতে পারিবে। অথবা আমি কলিকাতায় গেলে সে মহেন্দ্রের কাছে সংবাদ পাইবে। তখন মহেন্দ্রের সঙ্গে আসিতে পারিবে।

'অচিন গাছ' নররূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কত ভাবনা তাঁহার 'scattered sheep'-দের, নানাস্থানে জন্ম পরিগ্রহণকারী অন্তরঙ্গদের, একসূত্রে গ্রথিত করিতে। কেন এই ভাবনা? নইলে 'বাউলের দল' তৈরী হইবে কি করিয়া? কি প্রয়োজন এই দল তৈরী করার? নহিলে গান গাহিবে কে? অবতারের বার্তা বহন করিয়া সংসারতাপে ঝলসিত জনগণকে শান্তির শীতল বারি বিতরণ করিবে কে?

অত সব ভাবনার পর ঠাকুর একদিন খোকাকে বলিলেন, তোদের

পাড়া আমার জানা আছে। ওখানেই ঝামাপুকুরে বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে আমি প্রথমে ছিলাম। আমার দাদার চতুষ্পাঠিও ওখানে ছিল। তোদের বাড়ির পাশে মহেন্দ্রের বাড়ির সামনে 'ও-দেশের' নকুড় বোষ্টমের মুদিখানা দোকান ছিল। ওখানে গিয়ে বসতাম। গান গাইতাম। তুই বরং মহেন্দ্রের কাছে যাবি।

কত ভাবনা, কত চক্রান্ত — 'ছেলেধরা ঠাকুরের।' খ্রীস্টাবতারে শ্রীরামকৃষ্ণই পিটারাদি জেলেদের জালে মানুষ- মাছ ধরাইয়াছিলেন। এবারের লীলায় চাই একটা 'ছেলেধরা মাস্টার'।

ভগবানের যেমন জীবগণকে সংসারে বদ্ধ করার এজেন্সি আছে, অবিদ্যামায়া যাহার প্রধান নায়িকা, তেমনি মুক্তির এজেন্সিও আছে। বিদ্যামায়া এর প্রধান। 'খণ্ডন ভব বন্ধন' অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরূপ একটা মুক্তির এজেন্সি তৈরী করিলেন। ইহার অধ্যক্ষ বানাইলেন মহেন্দ্রকে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্ল্যানটি যে খুব সফল হইয়াছিল তাহার প্রমাণ কলিকাতাবাসীর নিকট মহেন্দ্রের 'ছেলেধরা মাস্টার' এই আতঙ্ক-প্রদায়ী উপাধিলাভ। 'ছেলেধরা ঠাকুরের' মুক্তিপ্রদান কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল তাঁহার সুযোগ্য এজেন্ট 'ছেলেধরা মাস্টারের' সুনিপুণ আনুকূল্যে ও কর্মতৎপরতায়।

কিন্তু খোকা মহেন্দ্রের কাছে আসেন না। ঠাকুর চিন্তিত। পরবর্তী মিলনে খোকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঠাকুর তুই মহেন্দ্রের কাছে যাস্ নি কেন? খোকা নীরব। বারবার জিজ্ঞাসা করায় ভয়ে কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে খোকা বলিলেন, উনি যে গৃহস্থ। তাই আমি এখানেই আসব। ঠাকুর বলিলেন, না রে এখানে যারা আসে তারা কেউ সংসারী নয়। এরা সব মায়ের চিহ্নিত। তাঁর কাজ করতে এদের জন্ম। তুই যাবি। গেলেই বুঝতে পারবি। মহেন্দ্র তোকে 'এখানকার' কথাই বলবে। সে অন্য কথা বলে না।

খোকা মহেন্দ্রের নিকট যাইতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরের উন্নত উদার বাণী শুনিতে আর গুরুবাক্য রক্ষা করিতে পরবর্তী সারা জীবন খোকা শ্রীম-র কাছে যাইতেন। বৃদ্ধ বয়সেও ভক্তগণ দেখিয়াছেন খোকা মহারাজ শ্রীম-র কাছে বসিয়া ঠাকুরের কথা আলোচনা করিতেছেন।

ঠনঠনিয়ায় কালীবাড়ি ছাড়াইয়া, মোটর আসিয়া দাঁড়াইল শ্রীমানি

মার্কেটে, 'আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের' সম্মুখে। শ্রীম-র নির্দেশ মত ডাক্তার এক টাকার উত্তম সন্দেশ খরিদ করিলেন দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর সেবার জন্য।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়া মোটর উত্তর দিকে চলিতে লাগিল। অন্নদা গুহদের ঠাকুরবাড়ির সামনে আসিলে শ্রীম যুক্তকরে মা কালীকে প্রণাম করিলেন। অন্নদা গুহ স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম জীবনের বন্ধু।

গাড়ী গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে আসিলে শ্রীম একটি বাড়ি দেখাইয়া বলিলেন, এখানেও ঠাকুর এসেছিলেন। অন্তেবাসী বলিলেন, আপনার অসুখে দেখতে এসেছিলেন বুঝি? শ্রীম উত্তর করিলেন, হাঁ।

শ্যামবাজারের মোড়ের কাছে পশ্চিম ফুটে সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার কালীর বাড়ি দেখাইয়া শ্রীম বলিলেন, এ বাড়িতেও ঠাকুর এসেছিলেন। তখন বাড়িতে এতো রং ছিল না।

টালার পুল পার হইয়া বারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোড দিয়া গাড়ী চলিতেছে উত্তর দিকে। দক্ষিণমুখী আর একখানা মোটর আসিতেছে, ধূলার পাহাড় মাথায় করিয়া। শ্রীম রঙ্গ করিয়া বলিলেন, ঐ দেখুন আর একটি জাহাজ আসছে ওদিকে থেকে।

গাড়ী বনস্থলীতে প্রবেশ করিল। ডান হাতে একটি বড় বাড়ির সম্মুখে পাঁচ বছরের একটি বালক দাঁড়াইয়া আছে। দিগম্বর। অবাক হইয়া মোটর দেখিতেছে। গাড়ী আর একটু অগ্রসর হইল। বাম হাতের একটি গলির মোড়ে, একটি তিন বছরের ঘাগরাপরা মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। সেও গাড়ী দেখিতেছে অবাক হইয়া। চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত, বিস্ময়ে। গাড়ীর ভিতরের বৃদ্ধ বালকটিরও আনন্দের সীমা নাই। এঁরও চোখে মুখে আনন্দ বিগলিত। শিশুর ন্যায় আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, দেখুন দেখুন, ঐ একটি, আর এই একটি। আর একটি দেখুন ঐ বেরুচ্ছে গাড়ীর হর্ণ শুনে।

বাম হাতে আলামবাজারের মঠ। শ্রীম-র মনে প্রাচীন স্মৃতিপুঞ্জ জাগ্রত হইয়াছে। বলিতেছেন, প্রথম মঠ বরানগরে। এখানে সেকেণ্ড শিফ্‌ট। স্বামীজী আমেরিকা থেকে এসে দেখেন মঠ এইখানে। কত personalities (বিশিষ্ট লোকজন) ছিল। হায়, কোথায় সব গেল!

গাড়ী আসিয়া দক্ষিণেশ্বর সদর ফটকে থামিল। শ্রীম অবতরণ করিয়া

পঞ্চবটির দিকে রওনা হইলেন। কারণ ঠাকুরের ঘর বন্ধ। শ্রীম-র মুখমণ্ডল গম্ভীর। বালকের ন্যায় চাপল্য আর নাই মুখে। নয়ন মন অন্তর্মুখীন।

ঠাকুরের ঘরের চাবির জন্য অন্তেবাসী প্রথমে কালীঘরে যান। তারপর যান বিষ্ণুঘরে। শিবরামদাদা এই মন্দিরের পূজারী। তিনি চাবি দিলেন।

২

শ্রীম ঠাকুরের স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটীর অশ্বত্থপত্র যুক্তকরে ধারণ করিয়া সেই পবিত্র হস্তদ্বয় ঠাকুরের প্রসাদরূপে স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলেন।

তারপর প্রাচীন বটতলায়, ঠাকুরের কঠোর সাধনপীঠে। বেদীর পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন! ঐ কোণের সংলগ্ন পশ্চিম দিকের তৃতীয় টাইলে ললাট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম-র পশ্চাতে মা গঙ্গা।

এবার বটবেদিকার উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া পূর্বাস্য হইয়া সাধনস্থলটি সসম্ভ্রম বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আর সপ্রেমে দেখিতেছেন ভগ্ন শাখাটা যাহা ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের আশ্বিনের ঝড়ে ভাঙ্গিয়া গিয়া ঠাকুরের সিদ্ধাসনের উপর আজও পড়িয়া আছে। কতবার তিনি বলিয়াছেন, আজও আবার বলিলেন, ঠাকুর থাকতেই এটি ভেঙ্গে যায়। আজও সেই অবস্থায় আছে। এর অর্থ এই কি যে ঐ আসনে বসবার উপযুক্ত লোক কেহ নাই? তাই ঐ পবিত্র আসনপীঠ কি ঐ ভগ্ন শাখাটি রক্ষা করিতেছে?

উত্তর-পশ্চিম কোণের প্রথম কোর্টের দ্বিতীয় টাইলে মস্তক রাখিয়া পশ্চিমাস্য প্রণাম করিতেছেন ঐ সিদ্ধাসনকে। তারপর ভগ্ন শাখাটি দুই হস্তে সশ্রদ্ধ আলিঙ্গন করিলেন। আর উত্তর দিকের দ্বিতীয় কোর্ট হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত মস্তকে ধারণ করিলেন।

এবার প্রদক্ষিণ করিতেছেন। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কোণের পূর্বদিকের টাইলটি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত শিরে ও বক্ষে ধারণ করিলেন!

এবার ধ্যানকুটীরের পূর্বদিকের আম্রবৃক্ষকে ডানহাতে রাখিয়া ঘুরিয়া গিয়া পূর্ব জানালাতে উঁকি দিয়া কুটীরাভ্যন্তর দর্শন করিলেন। মহাদেবের একটি বিরাট মূর্তি ঘরে। জানালার নিচে লোকের ভীড়। বলিলেন, এসব

পরে হয়েছে। ঠাকুরের সময় এটা একটা মাটির কুটীর ছিল। এর ভিতরেই তোতাপুরী সন্ন্যাস দেন। এর ভিতর ঐ নির্বিকল্প অবস্থায় ঠাকুর তিনদিন বসে ছিলেন, ঠাকুর বলতেন। ধ্যানকুটীরের সম্মুখের সিঁড়িতে প্রণাম করিয়া বেলতলার দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

এতক্ষণে শ্রীম-র সঙ্গে অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছে। শ্রীম উত্তর দিকে চলিতেছেন। রাস্তার ডান দিকে ক্রোটনকুঞ্জে ভক্তদের রন্ধনস্থলীতে আসিয়া শ্রীম দাঁড়াইলেন। এখানে ঠাকুরের সময় ভক্তরা কয়েকবার পিকনিক করিয়াছেন। একবার মাত্র দুই টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল। ইহাতেই নরেন্দ্রাদির কত আনন্দ! ঠাকুরও ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া খিচুড়ি আদি প্রসাদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ইদানীং শ্রীমও ভক্তসঙ্গে কয়েকবার পিকনিকে যোগদান করিয়াছিলেন। তাই এই স্থান অতি পবিত্র। ভগবান ভক্তসঙ্গে এখানে আসিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিতেন। এখানে ভাই ভূপতি, মহারাজের একজন ভক্ত আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন।

বিল্বতল। ঠাকুরের তন্ত্র-সাধনপীঠ। এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সাহায্যে ঠাকুর এখানে তন্ত্রোক্ত অতি কঠিন সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীম বিল্ববৃক্ষ-বেদিকার দক্ষিণদিকে দাঁড়াইয়া যুক্ত করে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। হাত অঞ্জলিবদ্ধ। মন অতীতের সুখময় স্মৃতিতে নিমগ্ন।

শ্রীম-র এই অপার্থিব স্মৃতিসুখ ভঙ্গ করিয়া একদল বালক আসিয়া চারিদিক হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি পায়ে হাত দিতে কাউকে বড় একটা দেন না। কিন্তু ছেলেরা কোন বাধা না মানিয়া হরিলুটের প্রসাদের মত চারিদিক হইতে পায়ে হাত দিতে লাগিল। শ্রীম বিব্রত। অন্তেবাসী বলিলেন, এরা সব বেলুড় মঠের ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুলের ছাত্র। শ্রীম আনন্দে আদর করিয়া বালকদের আশীর্বাদ করিতেছেন। বলিলেন, তোমরা ধন্য। এই বয়সেই সাধুসঙ্গে রয়েছ।

শ্রীম দক্ষিণদিকে বেদীতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া বিল্ববৃক্ষের চারিদিকে পরিক্রমা করিতেছেন। বেদিকার পূর্বদিকে আসিয়া শ্রীম ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেছেন। এখানে একদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া শ্রীম-র ধ্যান দর্শন করিতেছিলেন অজ্ঞাতে। শ্রীম ছিলেন বেদীর উপর গভীর ধ্যানমগ্ন। শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে শ্রীম-র ধ্যান ভঙ্গ হইল। অন্তরে

যাঁহাকে ধ্যান করিতেছিলেন সম্মুখে আঁখি মেলিয়া তাঁহাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া শ্রীম আনন্দে গদগদ হইয়া ঠাকুরের চরণতলে নিপতিত হইলেন দণ্ডবৎ। অদ্যাবধি যখনই এখানে শ্রীম আসেন সেই পূর্বেকার স্মৃতিআপ্লুত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া থাকেন। কখনও বৃষ্টির জলে ভূমি আবৃত থাকে। তথাপি পূর্ববৎ দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। ভক্তের নিকট এই স্থল তাই সিদ্ধপীঠ। শ্রীম-র কাছে তো বটেই। বৃন্দাবনে মধুবনে ধ্যানমগ্ন বালকতপস্বী ধ্রুবর নিকটও ভগবান এইরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। অন্তরে যাঁহাকে ধ্যান করিতেছেন সেই নারায়ণ সম্মুখে দাঁড়ান। এই দৃশ্য ধর্মজীবনে অতি দুর্লভ। যে ক্ষণে যে স্থানে ভগবানদর্শন হয় সেই ক্ষণ সেই স্থান ভক্তের অমূল্য ধন।

তিনবার প্রদক্ষিণান্তে বেদীতে আরোহণ করিয়া শ্রীম কিছুকাল ধ্যান করিতেছেন পূর্বাস্য। সঙ্গের ভক্তদলও যে যেখানে পারেন বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ঝাউতলা যাইবার রাস্তার মোড়ে শ্রীম চটিজুতা ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। এখন উহা পরিতেছেন। একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টি বিল্বতলে নিক্ষেপ করিয়া শ্রীম হাঁসপুকুরের পূর্ব তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। আসিবার সময় একটি লিচুগাছের পাতায় মস্তক ঠেকাইয়া প্রণাম, স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিলেন।

গদাধর আসিয়া এই স্থানে মিলিত হইলেন ও প্রণাম করিলেন। ইনি এখানে থাকিয়া ভজন করেন। এইস্থানে কয়েকজন যুবক হাততালি দিয়া গৌর-সংকীর্তন করিতেছে। আজ রবিবার — অবসর, তাই তাহারা আসিয়াছে। ঝাউতলার দিকে একটি সাধুর আসন। সেখানে ধুনি জ্বলিতেছে। শ্রীম ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া সেই সাধু ও ধুনি দর্শন করিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে গঙ্গা প্রবাহিতা।

হাঁসপুকুরের দক্ষিণ তট। শ্রীম চত্বরে দাঁড়াইয়া আছেন উত্তরাস্য। ঘাট ও পবিত্র সলিল দর্শন করিতেছেন। আর পূর্বের পবিত্রস্মৃতি জাগ্রত করিতেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্য কয়েকবার এই ঘাটে পদার্পণ করিতেন কখনও একাকী, কখনও ভক্তসঙ্গে। এই পুকুরের জল তিনি শৌচের জন্য ব্যবহার করিতেন। গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি, তাই শৌচাদিতে

ব্যবহার করিতেন না। নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তগণ যে যখন সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহারা গাড়ু করিয়া জল উঠাইতেন। একবার নরেন্দ্র, ঐরূপ গাড়ু করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, নূতন পীরিতে প্রেমিক প্রেমিকার ঘনঘন মিলন দরকার। আর একটু বেশি বেশি আসবি। আজ চাতালে ও ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া যাত্রীগণ আহার করিতেছেন। শ্রীম উহা আনন্দে দেখিতেছেন। আর ভাবিতেছেন, এখনই তীর্থযাত্রীরা এখানে আসতে আরম্ভ করেছে। ভবিষ্যতে আরও ভীড় হবে — যেমন নবদ্বীপে, অযোধ্যায় ও বৃন্দাবনে হয়।

এখান হইতে শ্রীম পশ্চিমে গঙ্গার দিকে চলিতেছেন। শ্রীম-র বাম হাতে কুঠী, ডানহাতে পঞ্চবটী। এবার বাম হাতে ঘুরিয়া ঠাকুরের ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। শ্রীম-র ডান হাতে মায়ের বাসস্থান ন'বত আর বাম হাতে কুঠী। ঠাকুরের ঘরের পাশে মোটর। শ্রীম চটিজুতা মোটরে রাখিয়া উত্তরের ফটক দিয়া মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে ভক্তদল।

সুবৃহৎ অঙ্গনের পূর্ব দিকে প্রথমে বিষ্ণুঘর, পরে কালীঘর। আর পশ্চিম দিকে দ্বাদশ-শিবমন্দির। শ্রীম বিষ্ণুঘরের বারান্দায় উঠিয়া শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সম্মুখে পূর্বাস্য গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। পূজারী শিবরামদাদা আসিয়া শ্রীম-র হাতে তুলসী ও চরণামৃত দিলেন। ইনি ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র।

৩

মা কালীর মন্দির। শীতকালের সন্ধ্যা। সূর্য ডুবিতেছেন। শ্রীম মন্দিরে আরোহন করিতেছেন ভক্তগণ সঙ্গে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে বাহিরে পশ্চিম দরজার সম্মুখে দারোয়ান আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিল। তারপর মায়ের সম্মুখে লইয়া গেল অভ্যর্থনা করিয়া। এখানকার সকল সেবকই শ্রীম-র পূজনীয় ও পরমাত্মীয়।

শ্রীম যুক্ত করে মাকে দর্শন করিতেছেন বারান্দায় দরজার পশ্চিম দিকে দাঁড়াইয়া। তারপর প্রণাম। মন অন্তর্মুখ। মুখমণ্ডল প্রসন্ন গম্ভীর। যেন বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে মায়ের সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। সপ্রেম আনন্দময়

অভয় ভাবের ছাপ শ্রীম-র মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া বারবার প্রণাম করিতেছেন। উঠিলে পূজারী নকুল, 'জ্যাঠামহাশয় প্রসাদ নিন', বলিয়া সশ্রদ্ধ ভাবে শ্রীম-র ললাটে মায়ের প্রসাদী সিন্দুরের তিলক দিলেন। তারপর চরণামৃত। তারপর প্রসাদী মিষ্টি। নকুল ঠাকুরের সেবক ও ভ্রাতুষ্পুত্র, রামলালদাদার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

এখন শ্রীম নাটমন্দিরের প্রবেশ করিলেন। ঠিক মধ্য পথে দক্ষিণ দিকে চলিতেছেন, পশ্চাতে ও দুই পাশে ভক্তবৃন্দ। বলির স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। বলিস্থল যুক্ত করে প্রণাম করিয়া পুনরায় যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথেই ফিরিতেছেন।

নাটমন্দিরের উত্তর প্রান্তে এক সারি পিলার। তাহার দক্ষিণে আর এক সারি পিলার। এই দ্বিতীয় সারির বাম হাতের পিলারের কাছে আসিয়া শ্রীম দাঁড়াইলেন। সম্মুখে মা ভবতারিণী। তারপর এই পিলারকে সপ্রেম আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্ষণকাল রহিলেন। বলিলেন, এটিতে ঠাকুরের পবিত্র স্পর্শ রহিয়াছে। নীলকণ্ঠের যাত্রা গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবেশে এই পিলারটি ভগবৎ বুদ্ধিতে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

অদ্যাবধি শ্রীম ঠাকুরের সেই ভাবলীলার অনুসরণ ও অনুকরণ করেন যখনই দক্ষিণেশ্বর আসেন। অবতারের স্পর্শে বুঝি জড় স্তম্ভ চৈতন্যময় হইয়া গিয়াছে। পরমব্রহ্মের নররূপ শ্রীরামকৃষ্ণ। এই নররূপী নারায়ণের কত বড় জাগ্রত ও জীবন্ত স্পর্শ রহিয়াছে এই পিলারে। রামের চরণস্পর্শে জড় প্রস্তর অহল্যা রূপধারণ করিয়াছিল। কাঠের নৌকা সোনা হইয়া গিয়াছিল। পুরীর জগন্নাথের নাটমন্দিরে গরুড় স্তম্ভে এইরূপ অবতারের আলিঙ্গনের কথা শোনা যায়। শ্রীচৈতন্য ভাবাবেশে উহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। চারিশত বৎসর অতীত, তবুও আজও ভক্তগণ ঐ স্তম্ভ সপ্রেমে আলিঙ্গন করেন।

নাটমন্দির ও মায়ের মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ি। তাহার মধ্যস্থলে চাতাল। শ্রীম এই চাতাল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর এখানে বসিতেন কখনও একাকী, কখনও ভক্তসঙ্গে। ঠিক সম্মুখে মা ভবতারিণী। পিছনে নাটমন্দির। ঠাকুর বসিতেন নাটমন্দিরের ভিত্তির অদূরে। একদিন

ঠাকুর শ্রীমকে লইয়া আসিয়া এইস্থানে বসিয়াছিলেন। ঠাকুর মায়ের সম্মুখে বসা, আর শ্রীম ঠাকুরের বাম হাতে। 'ভবদারা ভয়হরা নাম নিয়েছি তোমার। এবার তার তার না তার তারিণী।।' — ঠাকুরের প্রিয় গানটি গাহিয়া শ্রীমকে মায়ের চরণে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই পবিত্র স্মৃতি শ্রীম-র হৃদয়ে আজও জাগ্রত। তাই যখনই আসেন, এই স্থানটিতে প্রণাম করেন। কখন ভক্তসঙ্গে এখানে বসিয়া পূর্ব লীলার অভিনয় করেন। এই উৎসর্গ-সঙ্গীতটি গান। একবার একটি ভক্ত ঠাকুরের বসার স্থানটিতে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না। শ্রীম তাঁহাকে উঠিয়া পূর্ব দিকে সরিয়া বসিতে বলিলেন। বলিলেন, এখানে ঠাকুর বসতেন। আপনি উঠে একটু ওদিকে বসুন।

শ্রীম মাকে গিয়া পুনরায় প্রণাম করিলেন। এবার অঙ্গনে নামিয়া আসিয়া মন্দিরে উঠিবার ছয়টি সিঁড়ির নিচে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন উত্তরাস্য।

শ্রীম কালীবাড়ির অঙ্গন পার হইতেছেন। পাশে ও পিছনে বিনয়, জগবন্ধু, ডাক্তার, ছোট নলিনী, গঙ্গাধর ও বহু দর্শক ভক্তগণ চাঁদনী অতিক্রম করিয়া ঘাটের চাতালে দাঁড়াইয়া ঘাট গঙ্গা নৌকা ও যাত্রী দর্শন করিতেছেন। গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী।

আশে পাশে ভিখারীগণ গান গাহিতেছে। শ্রীম অন্তেবাসীকে কহিলেন, আমাকে গোটা দুই পয়সা দাও তো। ভিখারীকে পয়সা দিয়া ঘাটে নামিতেছেন দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া। ভাঁটা, তাই অনেক নিচে নামিলেন। বহু যাত্রী ও বহু নৌকা ঘাটে। হৈ হৈ শব্দ হইতেছে। কেহ বলিতেছে, 'মাণিক চলে আয় নৌকো ছেড়ে দিচ্ছে।' কেহ বলিতেছে, 'তোমার নৌকোটা একটু সরাও। তা হলে আমাদের নৌকো ঘাটে ভিড়তে পারে।' দারুণ কোলাহল, আবার কোঁদল।

শ্রীম দক্ষিণদিকের শেষ সিঁড়িতে বসিয়া আচমন, প্রণাম ও গণ্ডুষ করিয়া দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া তর্পণ করিতেছেন। পাঁচবার অঞ্জলিবদ্ধ জল গঙ্গায় প্রদান করিলেন। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। শ্রীম-র ওয়ার ফ্লানেলের পাঞ্জাবী পাছে ভিজিয়া যায় তাই ডাক্তার পিছনে থাকিয়া উহা ধারণ করিয়া আছেন।

এবার শ্রীম উপরে উঠিতেছেন। তাঁহার আগে পিছনে ও দুই পাশে ভক্তগণ — যাহাতে লোক আসিয়া উপরে না পড়ে। অসম্ভব ভীড়। উপরে উঠিয়া উত্তর দিকে চলিতেছেন। এবার গঙ্গার দীর্ঘ পোস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর উত্তর-দক্ষিণ সমগ্র পোস্তার উপর দিয়া চলিয়া দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। মন ভিতরে টানা। ঠাকুর গভীর রজনীতে এই পোস্তায় বিচরণ করিতেন। কখনও স্থানুবৎ দাঁড়াইয়া থাকিতেন, অনাহত শব্দ শ্রবণ করিতেন। শ্রীম হয়তো তাই মনোমধ্যে দর্শন করিতেছেন সেই দেবলীলা। অনাহত শব্দই শব্দব্রহ্ম (the cosmic sound)। আর বাকী যত শব্দ সব আহত হইয়া উত্থিত হয়, সব পঞ্চভূতাত্মক। তাই বিনাশশীল। অবিনাশী কেবল অনাহত শব্দ।

ঠাকুরের ঘরের গোল বারান্দা। শ্রীম নিচে দাঁড়াইয়া, দক্ষিণ হস্তে সিঁড়ি স্পর্শ করিয়া সেই রজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া উপরে উঠিতেছেন। গোল বারান্দায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এখানে ঠাকুর প্রায়ই বসিয়া থাকিতেন। কখনও দাঁড়াইয়া মা গঙ্গাকে দর্শন ও প্রণাম করিতেন। একদিন ভাবে পূর্ণ হইয়া গদগদ ভাবে বলিয়াছিলেন, 'মা আমায় সীতার মত করে দাও'। রাখাল ও মাস্টার তখন কাছে বসা।

অশোক বনে লঙ্কায় সীতা কারারুদ্ধা। হনুমান আসিয়া রামকে সংবাদ দিলেন। সীতা বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। মন প্রাণ রামচিন্তায় নিমগ্ন। দেহ উলঙ্গপ্রায়। আর যম আনাগোনা করিতেছে। যম জীবের সূক্ষ্ম শরীর লইয়া যায়। সেই সূক্ষ্ম শরীর রামের পায়ে বাঁধা পড়িয়াছে। সেখানে যমের অধিকার নাই। তাই অপেক্ষায় আছে কখন মন বিলগ্ন হয়। মন আর বিলগ্ন হইতেছে না, যমও সূক্ষ্ম শরীর লইতে পারিতেছে না।

৪

ঠাকুরের ঘর। বড় ও ছোট দুই খাটের মধ্যস্থলে মেঝেতে শ্রীম দক্ষিণাস্য হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া যুক্ত করে উভয় খাট স্পর্শ করিলেন। ঠাকুর ছোট খাটে বসিয়া সর্বদা ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কহিতেন। দিনে কখনও বিশ্রাম করিতেন। বড় খাটে রাত্রে শয়ন করিতেন। সবিকল্প, নির্বিকল্প কত সমাধি এই খাটে বসিয়া হইয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই।

এই বড় খাটেই ঠাকুর মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে দীর্ঘ আট মাস শয়ন করিয়া এক সুকঠিন সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 'রমণীর সঙ্গে থেকে না করে রমণ' — অবতারাদির দৈব চরিত্রের এইটি একটি নিদর্শন ও পরীক্ষা। ঠাকুর লোকশিক্ষার জন্য এই পরীক্ষায়ও অনায়াসে উত্তীর্ণ। তবেই তো ঠাকুর, 'আমি তোমার কে? — মায়ের এ প্রশ্নে সগর্বে উত্তর দিতে সমর্থন হইয়াছেন, 'যে মা মন্দিরে, যে মার গর্ভ থেকে এই শরীর এসেছে, সেই মা-ই এখন আমার পায়ে হাত বুলাচ্ছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের মন যে সীতার মত রামচিন্তায় সদা মগ্ন ছিল! তিনি যে জগদম্বার হাতে একটি চিন্ময় পুতুল! কামিনীকাঞ্চনাসক্ত জীবগণের কাছে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের মূর্ত বিগ্রহ ঠাকুর ও মায়ের এই দিব্য শয়নলীলা তাহাই সূচিত করিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, সাবধান! যুবতীর সঙ্গে পরমহংসের পতন হয়। কিন্তু তিনি স্বয়ং এ নিয়মের অতি ঊর্ধ্বে। ইনি বুঝি পরমহংসের সৃষ্টিকর্তা? যে মায়াশক্তি বিশ্বকে বিমোহিত করে, অঘটনঘটনপটীয়সী সে মায়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হীনবল। ঐ দিব্য শয়নলীলা ইহাও সূচিত করিতেছে।

অগ্নির উত্তাপে মাখন গলে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্ময় মনোমাখন গলিল না। যৌবনাগ্নি হীনপ্রভ, নিস্তেজ। অগ্নি জলে পরিণত।

পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতির প্রজা জীব, ঈশ্বর নহে। ঈশ্বর তাহার অধিপতি। জমিদারের কাছে নায়েব ক্ষুদ্র কর্মচারী মাত্র — শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের মুখের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ কি শিব, ঈশ্বর? তবে জীবের মত ভয়ভীত কেন? কেন এই দুর্বলের কাতর প্রার্থনা — মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না?

ইহার উত্তর স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই দিয়াছেন — এখানে দুটি — একটি ভক্ত, আর একটি ভগবান, জগদম্বা। ভক্তেরই অসুখ হয়েছে।

বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পূজারী ডক্টর মহেন্দ্র সরকার এই ধাঁধায় পড়িয়াছিলেন। ক্যানসারের রোগী ছয় সাত ঘন্টা কি করিয়া ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্তন করে আবার মাঝে মাঝে সমাধিস্থ? মুখমণ্ডল যেন প্রস্ফুটিত কমল! ডাক্তারী

যন্ত্রপাতি হার মানিয়াছে। ডক্টর ধাঁধায় পড়িয়াছেন। বাহিরে তো সব মৃতের লক্ষণ, হৃদয় স্পন্দনহীন। কিন্তু এই সজীব উজ্জ্বল মুখমণ্ডল মৃতে কি করিয়া সম্ভবে? — এই ধাঁধা দূর করিলেন সমাধি হইতে ব্যুত্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। — কি ডাক্তার, তোমার সায়েন্সে বুঝি এ কথা নাই? কি কথা?

মানুষের তিনটি শরীর — স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ। তাহার ঊর্ধ্বে মহাকারণ, ঈশ্বর অন্তর্যামী। মানুষ নিচের তিনটা শরীর ছাড়িয়া চতুর্থতে মহাকারণে অবস্থান করিতে পারে! মহেন্দ্র সরকার নির্বাক। সমাধিস্থ বাহ্য-মৃতবৎ দারুণ রোগগ্রস্ত রামকৃষ্ণের এ কি প্রভাব? কোথা হইতে আসিল এই মৃতে সঞ্জীবনী শক্তি? আমার মন যে ইহাতে প্রভাবিত হইয়া পড়িতেছে! মনের দুশ্চিন্তা বিদূরিত — আনন্দময় এক দৈবী আকর্ষণ কোথা হইতে আসিল? আমি যে উঠিতে পারিতেছি না। এ কি মায়াজাল? বিমুগ্ধ ডক্টর হতভম্ব হইয়া নিত্য কখনও ছয়-সাত ঘন্টা এই রোগী-যাদুকরের কাছে বসিয়া আছেন। শুধু কি তাই? প্রায়-নিরক্ষর অসহায় ক্যানসার রোগী বিনোদ করিয়া বলিতেছেন — কি ডাক্তার, তোমার সায়েন্সে বুঝি একথা নাই — জীবের ভিতর শিব লুক্কায়িত, জীব শিব?

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবত্বগ্রহণ বাহ্য, লীলার জন্য। দুইটি না হইলে খেলা চলে না। নাইনটিনাইন পয়েন্ট নাইন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং শিব, ঈশ্বর। এখন মানুষ-শরীরে আসিয়াছেন। তাই মানুষের ভাব — ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগশোকাদি গ্রহণ। এ সবই লোকশিক্ষার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র পয়েন্ট ওয়ানে।

ঈশ্বর ঈশ্বরই থাকেন মানুষ-শরীর গ্রহণ করিলেও। জীবের স্বরূপ শিব হইলেও নুনের পুতুল সমুদ্র হইয়া গেলেও, তাহার ঈশ্বরত্ব থাকে না — জগতের সৃষ্টি স্থিতি-বিনাশশক্তি থাকে না। জীবকে মোক্ষ দিতে পারে না। যদি কেহ মোক্ষ দেয়, ঈশ্বরদর্শন করায় তবে বুঝিতে হইবে ইনি ঈশ্বর, মানুষের ছদ্মবেশে আসিয়াছেন। ইনি অবতার।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের সকল বিরুদ্ধ ভাব, বাণী, আচরণ সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত হয় যদি তাঁহাকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ ছদ্মবেশী ঈশ্বর। ভক্তগণের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন। তাহাতে জগতেরও কল্যাণ। ভক্তগণের জীবনে সকল দুঃখকষ্টের সহনশক্তি লাভ হয়, অথচ মন ঈশ্বরে অবস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহলীলা, স্ত্রীসঙ্গে শয়নলীলা, এসবই লোক-সমাজের ঊর্ধ্বগতি লাভের জন্য। সমাজের দৃষ্টি দেহ ছাড়াইয়া ঈশ্বরে সংযুক্ত করার জন্য। অবতারের আগমন প্রধানতঃ ভক্তের ভালর জন্য হইলেও প্রকারান্তরে ভক্তের ভিতর দিয়া জগতের কল্যাণের জন্যও।

রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু — ইঁহাদের জীবন এই উপরোক্ত সত্যই প্রমাণ করিতেছে। ভক্ত ও সমাজ উভয়ই লাভবান হয় অবতার আবির্ভূত হইলে। তাঁহার প্রভাবে জগতে সত্য, প্রেম ও সেবার বন্যা আসে।

শ্রীম এইসব উপরোক্ত লীলাকথা ভাবিতেছেন, যে লীলা তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত নিবাস করিয়া নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন, নিজ কর্ণে শুনিয়াছেন, নিজ বুদ্ধিতে, অবতারের দ্বিবিধ ভাব — ঈশ্বর ও জীব — বুঝিয়াছেন। ছোট খাটের পূর্বদিকে পাপোষের উপর বসিয়া ঠাকুর তাঁহাকে এই পদবীতে জগতে পরিচয় দিয়াছেন — নিজ গৃহে দাসী, শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলের দাস, যেমন হনুমান শ্রীরামের দাস। যখনই ইনি এখানে আসেন ঠাকুরের প্রদত্ত এই পাপোষাসনেই উপবেশন করেন। আজও তাই করিয়াছেন, বীরাসনে পাপোষ আসনে উপবিষ্ট।

ঠাকুরের ঘর লোকে পরিপূর্ণ। কথামৃতকার, শ্রীরামকৃষ্ণাবতারের বেদব্যাস শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন।

শ্রীম উঠিয়া গিয়া বড় খাটের বিছানা উঠাইয়া কাঠে ডান হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া সেই হাত মস্তকে স্থাপন করিলেন। তারপর পূর্ব-দক্ষিণ বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। এই স্থানে শিবরামদাদা আসিয়া শ্রীম-র হাতে প্রসাদ দিলেন। ছোট নলিনী শ্রীম-র হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন। প্রথম বারের জলে হাত ধুইলেন ও আচমন করিলেন। পুনর্বার জল দিতে বলিলেন। এবার ভাল করিয়া ধুইলেন।

শ্রীম পুনরায় ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। এবার উত্তরের দরজা দিয়া উত্তরের বারান্দায় উপনীত হইলেন। ঠাকুরের সময় এই বারান্দায় ভক্তগণ রাত্রিবাস করিতেন। দরমার বেড়া দিয়া বারান্দা আবৃত ছিল, এখন উন্মুক্ত।

এই বারান্দার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মেঝেতে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। এই স্থানে ঠাকুর একদিন দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। নরেন্দ্র তখন গান গাহিতেছেন — 'চিন্তয় মন মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন'। ঠাকুর

দাঁড়াইয়া আছেন। বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, যেন প্রস্তরবৎ। কিন্তু, তাঁহার মুখকমলে কি দিব্য আনন্দের ছটা! শ্রীম অবাক। একজন বলিলেন, এরই নাম সমাধি। সমাধি শ্রীম-র এই প্রথম দর্শন।

এইবার নিচে নামিলেন। সম্মুখে মোটর। কিন্তু তাহাতে আরোহণ না করিয়া পদব্রজে সদর ফটকের দিকে চলিলেন। যাইবার সময় সতৃষ্ণ নয়নে ঠাকুরের ঘরের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আর বারান্দায় উত্তর-পূর্ব কোণের শেষ টাইলটি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। এইস্থানে দাঁড়াইয়া ঠাকুর ভক্তদের বিদায় দিতেন।

শ্রীম সদর ফটকে দাঁড়াইয়া পশ্চিমাস্য কালীবাড়ি দর্শন করিতেছেন। তারপর ফটকের রজঃ লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। আর দক্ষিণ দিকের পিলারটি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন।

এই তপোবনের সকল দ্রব্য জীবন্ত, শ্রীম বলেন। রজঃ পর্যন্ত জীবন্ত ও চিন্ময়। ঘরবাড়ি সব চিন্ময়। বৃক্ষলতা সব চিন্ময়। দেবঋষি এইরূপে দিব্য অবতারলীলা দর্শন করিতেছেন। চিন্ময় পশুপক্ষী, চিন্ময় জনগণ। সব চিন্ময়। চিন্ময় মন্দির, চিন্ময় মূর্তি, চিন্ময় সেবকগণ। চিন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্ময় পার্ষদগণ। চিন্ময় ভক্ত, চিন্ময় ভগবান, চিন্ময় অবতারের লীলাস্থলী — দক্ষিণেশ্বরের তপোবন। সকলই চিন্ময়।

৫

মোটরে শ্রীম ভক্তসঙ্গে। গদাধর বিদায় লইল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মোটর বাঁ হাতে আড়িয়াদহের রাস্তায় প্রবেশ করিল। অদূরে অন্নদা ঠাকুরের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। শ্রীম-র ইচ্ছায় মোটর এইস্থানে দাঁড়াইল। আজ উৎসব হইতেছে। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ঠাকুরঘরে গেলেন। মা কালী ও শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি মন্দিরাভ্যন্তরে বেদীর উপর। শ্রীম ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আর একটি বেদানা প্রণামী দিলেন।

মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ চন্দ্রাতপ। তাহার নিচে সভা চলিতেছে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই সভার সভাপতি। আলোচনার বিষয় — রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা।

মন্দিরের উত্তরে একটি বুকস্টল। শ্রীম দাঁড়াইয়া বই দেখিতেছেন।

তারপর চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া পুস্তকবিক্রেতা বলিল, আপনি কিছু বই নিলেন না? শ্রীম হাসিয়া বলিলেন, এ যে সব ট্র্যানস্লেশান? (অন্তেবাসীর প্রতি) আচ্ছা, একখানা অমৃতবাজার পত্রিকা নিয়ে নাও।

বাৎসরিক উৎসব আজ। অনেক লোকজন প্রসাদ পাইতেছে। ধরবাবুদের বাগানে বিরাট রন্ধনশালা। তাহার সামনে পুকুরের উত্তর ধারে বসিয়া জনগণ খিচুড়ি ইত্যাদি পরিতোষপূর্বক ভোজন করিতেছে। এখন প্রায় উৎসবের শেষ। সন্ধ্যা সমাগতা।

পশুপতি বসুর বংশধর কালিদাস। শ্রীমকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে সব স্থান দেখাইতেছেন। কালিদাস বলিলেন, বাবুদের গুরু একজন সন্ন্যাসী। ইনি কিছুকাল যাবৎ এখানে বাস করিতেছেন। দ্রব্যাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। একজন লোক হাতে করিয়া প্রায় পঁচিশ দানা বুঁদে লইয়া আসিল। শ্রীম অতি আগ্রহে অগ্রসর হইয়া জোড় হাতে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। আর বলিলেন, এখানে বুঝি এমন (হাতে প্রসাদ দেওয়া) হতো? পুকুর ধার দিয়া বাহির হইয়া পুনরায় আশ্রমবাড়িতে শ্রীম আসিলেন। মণীন্দ্র নন্দী বক্তৃতা দিতেছেন।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে মোটরে উঠিলেন। বলিতেছেন, মণীন্দ্রবাবুর খাটুনী কত! সব ভাল কাজে, ধর্মেকর্মে তাঁকে সকলে ডাকে। এই তো বুড়ো মানুষ। এতক্ষণ ধরে বসে আছেন এইখানে।

মোটর কোন্ রাস্তায় যাইবে এই বিষয়ে ভক্তদের কথা হইতেছে। কেহ কহিলেন, এই দিক দিয়ে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে গেলে হয়। একজন বলিলেন, ওটা ঘোরা হবে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই বিবাদ শুনিয়া শ্রীম বলিলেন, experiment-এর (পরীক্ষার) কাজ নাই। যে রাস্তাতে আসা হলো সেখান দিয়েই যেতে বল।

গাড়ী আলামবাজারের রাস্তায় আসিয়া পড়িল। শীতকাল, রাত্রি হইয়াছে। ঠাণ্ডা হাওয়া জোরে গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেছে। শ্রীম-র বৃদ্ধ শরীর। অন্তেবাসী গাড়ীর পিছনের দরজায় কাপড় টাঙ্গাইয়া দিলেন। আর সম্মুখের পরদাও সব টানিয়ে দিলেন। পুরানো গাড়ী। শ্রীম রহস্য করিয়া বলিলেন, গাড়ীর সামনে ও পেছনে শতরঞ্জি টাঙ্গিয়ে দিলেও হয়। বেশ decent (সুন্দর) হবে, কি বলেন ডাক্তারবাবু?

কাশীপুর সদাগরপট্টীতে ডাক্তারের বাসা। এখানে পশ্চিমী আহিরগণ দুধের ব্যবসা করে। তাই খুব বড় বড় পশুশালা। ডাক্তার নামিয়া গেলেন। আর সকলে শ্রীম-র সঙ্গে রহিলেন। গাড়ী সারকুলার রোড দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটে মর্টন স্কুলে। এটি শ্রীম-র নিবাসস্থল।

নিত্যকার ভক্তগণ অনেকক্ষণ দ্বিতলে বসিয়া আছেন শ্রীম-র অপেক্ষায়। এখন আটটা। শ্রীম অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। তাই আজ আর বিশেষ কথা হয় নাই। ভক্তগণ বিদায় লইতেছেন। শ্রীম বলিলেন, আমরা আজ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থে গিছলাম। কপালে থাকলে হয়। যাদের যৌবন আছে তাদের যাওয়া উচিত। আলস্য ছেড়ে। উঠে পড়ে না লাগলে ধর্ম হয় না। সেখানকার সব চিন্ময়। ত্রিশ বছর ছিলেন ওখানে ভগবান। চিন্ময় ধাম, চিন্ময় রাম। চিন্ময় কৃষ্ণ। চিন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণ। এইটে ভাবতে ভাবতে ঘরে যান আপনারা।

পুনরায় বলিলেন, সেখানকার সব ধূলিকণা জীবন্ত ধর্ম, সব চেতন। এর সংস্পর্শে ভিতরের চৈতন্য জাগ্রত হয়। এত সুবিধা! তবুও লোক যায় কই? প্রকৃতি টেনে রাখে পেছনে। সিদ্ধভূমি, মহাতীর্থ, মুক্তিক্ষেত্র। কালে চিনবে লোক।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১৮ই জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীঃ। ৫ মাঘ, ১৩৩১ সাল।
রবিবার, কৃষ্ণা অষ্টমী ১৩ দণ্ড। ১০ পল।

চতুর্দশ অধ্যায়

আমেরিকার ধর্ম-জাগরণের অগ্রদূত বিবেকানন্দ — গিলকী

১

মর্টন স্কুলের ছাদ। মাঘ মাস। অপরাহ্ন তিনটা। একটি টিয়া পাখি উড়িতে অসমর্থ হইয়া টিনের ঘরে প্রবেশ করিল। অন্তেবাসী থাকেন এই ঘরে। ইনি শ্রীমকে সংবাদ দিলে উনি আসিলেন। বিকলপক্ষ পক্ষীটিকে দেখিয়া বলিলেন, বিড়াল না খেয়ে ফেলে, তাই খাঁচাতে রেখে দাও। আহার আর জল দাও।

শ্রীম অনেকক্ষণ ধরিয়া পাখীটিকে দেখিতেছেন। তাহার পর পাখীর সহিত কথা কহিতেছেন, তোমার মা কোথায় তুমি তা জান না। আমিও জানি না। কোথায় ছিলে, এখন কি হবে কিছুই তুমি জান না। আমিও জানি না। তোমার যে দশা আমারও সেই দশা। কিছুই জান না — কিছুই না। আবার কোথা থেকে জ্বালাতে এলে তুমি?

যেন একজন মানুষ-অতিথি ঘরে আসিয়াছে। শ্রীম-র এই পাখীর প্রতিও ঠিক সেই ভাব। একজন ভক্ত শ্রীম-র এই ভাব দেখিয়া ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য! মহাপুরুষদের সব ব্যবহারই স্বতন্ত্র। সব শাস্ত্র যেন সজীব হয়ে ওঠে এঁদের আচরণের ভেতর দিয়ে। তাই বুঝি এঁদের আচার্য বলে। মানুষ কেবল বাইরের শরীরটা দেখে। তাই বলে এটা মানুষ এটা পাখী। কিন্তু মহাপুরুষ, যিনি আত্মদ্রষ্টা, তাঁর দৃষ্টি — স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই তিন শরীরে। শ্রীম দেখছি এই পাখীটির স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। তাই বলছেন, 'তোমার যে দশা আমারও সেই দশা'। কিন্তু একই মহাকারণ, অন্তর্যামী সকলের ভিতর।

বেদে আছে 'অতিথি দেবো ভব'। শ্রীমকে দেখছি, ভগবানই এই পক্ষীর রূপ ধারণ করে এসেছেন — এই দৃষ্টিতে তাকে দেখছেন। তাই তার যত্ন ও সেবা করতে অন্তেবাসীকে বললেন। দয়াতেও সেবা হয়।

কিন্তু এ ব্যাপারে তা বলে মনে হয় না। তাই কি গীতায় আছে — 'শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ' (গীতা ৫:১৮)।

এখন অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম এ্যালবার্ট হলে বসিয়া আছেন দক্ষিণ দিকের বেঞ্চে। ডক্টর মরিনো (Dr. Moreno) দেখিতে পাইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়াছেন। আর ঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। বলিলেন, "জগতে এরূপ ত্যাগের দৃষ্টান্ত নাই। এক টুকরো মাটি পর্যন্ত হাতে নিয়ে রাখতে পারছেন না। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ধন সম্পদ স্পর্শ করতে পারছেন না অজ্ঞাতেও। বস্ত্র দেহে রাখতে পারছেন না, খসে পড়ে যাচ্ছে। Sense of possession (অধিকার জ্ঞান) একেবারে উন্মুলিত। লোম, চর্ম মাংস, রক্ত, অস্থি সব চেতন হয়ে গিছলো। অমন ত্যাগ দেখা যায় না, শোনাও যায় না। আবার অন্য দিকে সদা 'মা মা' বলে একেবারে বাহ্যশূন্য। বাইরে দৃষ্টি এলে তখন যেন মাতাল। এরূপ অপূর্ব ত্যাগ ও ঈশ্বরতন্ময়তা (His great renunciation and God intoxication) জগতে হয় না। এ সময়ে এটির দরকার জগতে।

শ্রীম ডক্টর মরিনোর মধ্যে ঠাকুরের সম্বন্ধে এই উচ্চ ভাব দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন।

ডক্টর মরিনো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। পণ্ডিত লোক ও ভক্ত। কখনও সেণ্ট্রাল কলেজ ও অন্য কোনও কলেজে পার্ট টাইম অধ্যাপনা করিতেন। ক্লাসে ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা উদ্ধৃত করেন। কখনও বেলুড় মঠে যান। আজকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের মেম্বর।

আজ ১৯শে জানুয়ারী ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, ৬ই মাঘ, ১৩৩১ সাল। সোমবার, কৃষ্ণা নবমী ৯ দণ্ড। ১৩ পল।

এখন ছয়টা বাজে। ডক্টর গিলকীর বক্তৃতা আরম্ভ হইল। ইনি আমেরিকানিবাসী পাদ্রী, ডি.ডি. পাশ। আজ তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা। চারি দিন পূর্বে ১৬ই জানুয়ারী তাঁহার প্রথম বক্তৃতা হইয়াছে। ইনি 'ব্যারোজ লেকচারার'। শ্রীম তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। দশ মিনিট বক্তৃতা শুনিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আজকের বক্তৃতার বিষয় — 'Jesus, life with God.'

ডক্টর গিলকী বলেন — যীশু সর্বদা ভগবানে ডুবিয়া থাকিতেন —

'Plunged in God'. বাহ্য জগতে যখন নামিয়া আসিতেন তখন সর্বদা প্রার্থনা করিতেন। নিরন্তর ভগবানকে ডাক, 'Pray incessantly' — এই উপদেশ তাঁহার জীবের জন্য। তিনি নিজে করিয়া তবে অপরকে বলিতেন।

ঈশ্বরসম্বন্ধে যীশুর কথা কেন শুনিতে হইবে? এই জন্য — প্রথমে তিনি নিজে ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন, তারপর অপরকে বলিয়াছেন। কথায় বলে, যে রোমে গিয়াছে তাহার কাছে রোম দেশের কথা শুনিতে হয় — Hear from him about Rome, who has visited Rome. যীশুখ্রীস্টের সব জ্ঞান অপরোক্ষ, direct knowledge. তাই তিনি বলেন, আমি ঈশ-পুত্র। পুত্র জানে পিতাকে। আমি ও আমার পিতা এক। 'I am the son of God'. 'The son knoweth the Father.' 'I and my Father are one.'

যখনই যীশু কোন উপদেশ দিতেন, কিম্বা কাহাকেও কিছু করিতে বলিতেন সে উপদেশ বা কার্য ছিল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের সম্বন্ধে — With reference to the highest ideal.

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ঈশ্বরদর্শন — The highest ideal of man is to see God face to face. ক্রাইস্টের সব কথা ঈশ্বরকে লইয়া।

ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু — God is beyond sense perception. মানুষ কি করিয়া তাঁহাকে জানিবে? তাঁহার কৃপায় তাঁহাতে সুগভীর বিশ্বাস হইলে হয়। অসম্ভব তাঁহাকে জানা। তাঁহার কৃপায় কেবল তাঁহাকে জানা যায়।

মনোরম বাক্‌বিলাস, অতি সুন্দর যুক্তিজাল, অপূর্ব ব্যাখ্যা, অথবা সুগভীর দার্শনিক তত্ত্ববিচার — এর একটাও তাঁহার সন্ধান দিতে পারে না।

অন্ধের নিকট যেমন বিচিত্র রূপ ও সৌন্দর্যমাধুরী বর্ণনা, আর বধিরের নিকট যেমন মনোমুগ্ধকর বাক্‌বিলাস নিষ্ফল, তেমনি অবিশ্বাসীর নিকট ভগবানের মহিমা বর্ণনা নিষ্ফল। শ্রীভগবান স্বয়ং আসিয়া ইহাদের কাছে কথা বলিলেও কাজ হয় না। তাহারা তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে

পারে না। তাঁহার কথা কর্ণে প্রবেশ করিলেও তাহারা তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না।

ভগবানকে জানিতে হইলে প্রথমে চাই তাঁহার উপর বিশ্বাস। তারপর তাঁহার বাণী শ্রবণ করা, আর সেই বাণী নিজের জীবনে মূর্ত করা চাই তপস্যা দ্বারা। তখনই কেবল ঈশ্বরতত্ত্বের প্রথম শ্রেণীর জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয় — নিজের অনুভূতি ও সুগভীর তত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় দ্বারা। আর অন্য পথ নাই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সাক্ষাৎ জ্ঞানার্জনের।

চরিত্রই মানুষের যথার্থ সুহৃদ। বিদ্যা ঐশ্বর্য সুযশ, ইহাদের কোনটাই শাশ্বত সুহৃদ নয়। যীশুর শিষ্যগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহার সুনিপুণ তত্ত্ববিচার, মনোরঞ্জক বাক্-বিলাস অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ পদবীলাভ দ্বারা নয়। পরন্তু তাঁহার অতি শক্তিশালী চরিত্র, প্রশান্ত ও সুমহৎ আচরণ আর মানুষ ও ঈশ্বরে কূলপ্লাবী প্রেমই এই আকর্ষণের কারণ।

ক্রাইস্ট ছিলেন নরকলেবরধারী শ্রীভগবান, অবতার। ক্রাইস্টকে নরদেব বলিয়া স্বীকার করা আমেরিকাবাসীদের পক্ষে কঠিন ও বিস্ময়কর। কিন্তু ভারতের পক্ষে অতি সহজ। কারণ অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসীদের নিকট অবতারত্ব সুস্বীকৃত।

খ্রীস্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদগণ গুণবর্ণনা ও যুক্তিতর্কাদি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া একটা প্রচণ্ড ভুল করিয়া থাকেন।

ঈশ্বরতত্ত্ব নিজে বুঝিতে হইলে কিংবা অপরকে বুঝাইতে হইলে বিশ্বাসই একমাত্র সহায়। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় আজকাল এই বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়া ধর্মপ্রচারকগণ যুক্তিতর্ক, বিদ্যা ও ব্যাখ্যানের আশ্রয় লইয়া আছেন। ফলে যে ঈশ্বরতত্ত্ব ক্রাইস্টের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের নিকট ছিল স্বতঃসিদ্ধ, স্বাভাবিক ও অতি সহজ, আজ উহা তাহার ঠিক বিপরীত স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

তাই খ্রীস্টীয় ধর্মব্যাখ্যান আজকাল নিষ্ফল। তত্ত্ববিচার কথঞ্চিৎ সহায়ক হইলেও, বিশ্বাসই একমাত্র অবলম্বন ঈশ্বরতত্ত্বকে জানার। আর তত্ত্ববিচারের দিক দিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, জগতের নানা দেশের নানা অধিবাসীর তুলনায় ভারত অগ্রদূত। তথাপি ভারতবাসীর নিকটও

ঈশ্বরদর্শনে বিশ্বাসই একমাত্র অবলম্বন, তাই অবতারতত্ত্ব বুঝা ভারতবাসীর কাছে অপরের অপেক্ষা সহজ।

অন্তেবাসী বক্তৃতা শুনিয়া সাড়ে সাতটায় মর্টন স্কুলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভক্তগণও কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছেন। চারতলার সিঁড়ির ঘরে শ্রীম ভক্তসঙ্গে অপেক্ষা করিতেছিলেন। অন্তেবাসীর নিকট উপরোক্ত রিপোর্ট শুনিয়া শ্রীম ভোজন করিতে তিনতলায় গেলেন। ভক্তগণও বিদায় হইলেন নয়টায়।

২

মর্টন স্কুল। সকাল সাতটা। চারতলার শ্রীম-র কক্ষ। ছোট জিতেন ও জগবন্ধু শ্রীম-র পাশে বেঞ্চে বসিয়া আছেন। শ্রীম বিছানায় দক্ষিণাস্য বসা। ডক্টর গিলকীর সম্বন্ধে কথা হইতেছে। গতকালের তাঁহার বক্তৃতার নোট পুনরায় পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন।

ইতিমধ্যে ওরিয়েণ্টাল প্রেসের প্রিণ্টার আসিয়া পড়িলেন। 'কথামৃত' ওখানে ছাপা হইতেছে। শ্রীম তাঁহার সঙ্গে ঐ পুস্তক ছাপার সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতেছেন। কাজেই গতকালের ডক্টর গিলকীর বক্তৃতার নোট আর পড়া হইল না। প্রিন্টার চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীম পুস্তক ছাপানোর অসুবিধার কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — বুঝতে পারছি প্রেস বেশ ভোগাবে। তবে honesty (সততা) আছে, কিন্তু efficiency (কর্মকুশলতা) নেই। Honesty and efficiency (সততা ও কর্মকুশলতা) একসঙ্গে থাকলে বেশ হয়। Honesty (সততা) আছে তাই বলছে, তিন মাসে শেষ হবে। অন্যরা কম দিনের কথা বলে বেশী দিন নেয়।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — Idealist-দের (আদর্শবাদীদের) দ্বারা কোন কাজ হয় না। করতে গেলেই গোলমাল হয়। অনেক waste (অপব্যয়) হয়। সিদ্ধপুরুষ না হলে বুঝবে না।

একজন ভক্ত — কেন, অমুকরা কত কাজ করছে।

শ্রীম — ওদের explanation (কৈফিয়ৎ) নেবার লোক আছে?

নিজেরা যা-ই করলো তা-ই হলো। তাদের ওপরটা সুন্দর হলেই হলো। কত নষ্ট হচ্ছে তার খোঁজ রাখে কে?

সিদ্ধপুরুষদের কথা আলাদা। দেখ না, শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় সুবিধা হলো না তো একেবারে দ্বারকায় পলায়ন। তাই বলতো দুর্যোধনের লোকেরা চক্রী। জরাসন্ধের লোকেরাও তাই বলতো। এমনি এক একটা বুদ্ধি বের করতেন কেউ বুঝতে পারতো না। তাই দুর্যোধনরা দুর্নাম রটিয়ে দিল। বলতো ভণ্ড। আবার বলতো straight forward (সরল) নয়। কাজ করতে গেলে sins of omission and commission (ত্রুটি-বিচ্যুতি) আছে।

কি করে হয় (সরল)? কতগুলি mentality-র (মানুষের মনোবৃত্তির) সঙ্গে deal (ব্যবহার) করতে হয়।

কাজে থাকলে ঐসব করতেই হবে। যাকে যে ভাবে হয় জব্দ করতে হবে। কতকগুলিকে হয়তো বিনাশই করে দিলেন। অনেক adverse force (বিরুদ্ধ শক্তি) কমে যায় এতে।

শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার aim and object (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) সাধুদের উদ্ধার। তা করতে গিয়ে কতগুলি adverse force-কে (প্রতিকূল শক্তিকে) বিনাশই করে দিলেন।

কিছুই বুঝবার যো নেই। কত রকম বুদ্ধি রয়েছে তাঁর। এমন একটা বুদ্ধি দেখালেন যে বিপক্ষ দল কিছুই বুঝতে পারলো না। কর্মে থাকলে এসব হয়। ভীষ্মদেব তাই বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে, চক্রী। বলতেন, এই চক্রীর চক্র, diplomacy বুঝবার যো নাই।

শরশয্যায় ভীষ্মদেব কেঁদেছিলেন, অর্জুন আর কৃষ্ণকে দেখে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে বললেন, মৃত্যুভয়ে পিতামহ কাঁদছেন, কি আশ্চর্য! অত বড় জ্ঞানী আর বীর! কৃষ্ণ পিতামহকে বললেন, অর্জুন বলছে আপনি মৃত্যুভয়ে কাঁদছেন। ভীষ্মদেব বললেন হেসে, যে ছ'মাস শরশয্যায় থাকে সে মৃত্যুভয়ে কাঁদে? না ভাই, তা নয়। এই জন্য কাঁদছি তোমার সঙ্গী ছোকরাটিকে বুঝতে পারলাম না। তাই কাঁদছি। যিনি সর্বমঙ্গলময়, যাঁর ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ হচ্ছে তিনি সঙ্গে থাকতেও তোমাদের দুঃখের অবধি নাই। এই জন্য কাঁদছি তাঁর লীলা বুঝতে

পারলাম না বলে।

এ কি আর বিষাদাশ্রুপাত, আনন্দাশ্রু!

তাই গীতায় তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেছেন, 'গহনা কর্মণো গতিঃ।' (গীতা ৪:১৭) তাই সর্বদা প্রার্থনা করতে ঠাকুর বলেছিলেন, মা সুমতি দাও। ভুলিও না মা — ভুলিও না।

শ্রীম-র শরীর খারাপ। বিছানায় সারাদিন আছেন। রাত্রিতে তাই ভক্তসভায় আসিতে পারেন নাই। ভক্তগণ তাঁহার ঘরে গিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

৩

সন্ধ্যা ছয়টা। শ্রীম এ্যালবার্ট হলে বসিয়া আছেন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বেঞ্চে। ডক্টর গিল্‌কীর আজ তৃতীয় বক্তৃতা। বিষয় — যীশু ও জন্মমৃত্যুর প্রহেলিকা (Jesus and mysteries of life and death)। রোজই এক ঘন্টা বলেন। শ্রীম আজ অনেকক্ষণ শুনিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজে কথকতা শুনিয়া মর্টন স্কুলে ফিরিয়া গেলেন।

ডক্টর গিল্‌কী বলিলেন — ক্রাইস্ট জন্মমৃত্যুর রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন। যে ঈশ্বরকে জানে তাহার কাছে জন্মও নাই মৃত্যুও নাই — এক শাশ্বত শান্তি ও আনন্দময় জীবন তাহার সর্বদা বিদ্যমান। ক্রাইস্ট দেখাইয়াছেন, ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকিলে আর 'দশ আদেশ' মানিয়া চলিলে ক্রমে জন্ম ও মৃত্যুর দুঃখ জয় করা যায়। ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াও তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহারা আমাকে বধ করিয়াছে তাহারা অজ্ঞান। তাহাদের ক্ষমা কর পিতঃ।

ক্রাইস্টকে হত্যা করিয়া রোমান গভর্ণমেন্টের চিরকাল পরাজয় স্বীকৃত হইল। ক্রাইস্টের বিজয় হইল। আজও সেই বিজয় জগতে সর্বত্র ঘোষিত হইতেছে। জগতের লোক যদি ক্রাইস্টকে আশ্রয় করে, আর তাঁহার কথামত চলে তবে তাহারা জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য ভেদ করিতে পারে। তাহার ফলে তাহারা জীবন-সংগ্রামে অভিভূত হইবে না এবং সকল দুঃখ জয় করিয়া চির সুখশান্তি লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীম প্রায় আটটায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার অপেক্ষায় ভক্তগণ বসিয়া আছেন। তিনি দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া আছেন, চেয়ারে পূর্বাস্য, সিঁড়ির কাছে। শ্রীম-র সম্মুখে ভক্তগণ বসা বেঞ্চে দক্ষিণাস্য — বড় জিতেন, ছোট জিতেন, ডাক্তার ও বিনয়, বিজয়, বলাই, বড় অমূল্য ও ছোট নলিনী, যতীন রমণী জগবন্ধু ও ছোট রমেশ প্রভৃতি। এ কথা সে-কথার পর আজকের ডক্টর গিল্‌কীর বক্তৃতার সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে।

বড় জিতেন (শ্রীম-র প্রতি) — এখানে শোনা গেছে, 'but the son of man hath not where to lay his head.' আবার আপনাদের মুখে শুনেছি — ঠাকুর বলছেন, আমি আর ক্রাইস্ট এক। তাই মনে হয় ক্রাইস্টকে বুঝতে হলে ঠাকুরকে বোঝা দরকার।

শ্রীম — তা আর বলতে। বাবুরা লেকচার দিতে যায়। কি বলতে কি বলে বসে। কে শুনবে তাদের কথা? কি নিয়ে নিজেরা সব রয়েছে?

অমুক বড় সাধু। একটু ক্রোধের কারণ হলো। অমনি কোথায় গেল তার সাধুগিরি, তার নাই ঠিক। এ অবস্থা নিয়ে আবার preach (প্রচার) করতে যাওয়া।

তাই consistent position (যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত) মনে হয়, সর্বদা learner (শিক্ষানবীশ) হয়ে থাকা। এইটে তো খুবই consistent (সঙ্গত) আর reasonable (যুক্তিযুক্ত) বলে মনে হয়।

Character (চরিত্র) না থাকলে কে শুনবে? Character (চরিত্র) মানে, ক্রাইস্ট যা বলেছেন তা নিজ জীবনে পালন করা। ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'go and sell that thou hast, and give to the poor... ...and come and follow me.' সর্বস্ব দিয়ে দাও দরিদ্রকে। তা হলে আমার সঙ্গে থাকতে পারবে।

বলেছিলেন, দু'খানা কাপড়ও রাখবে না। একেবারে সর্বত্যাগ। আর ভিতরে তাঁর সঙ্গে যোগ। আর সদা প্রার্থনা নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রার্থনা — pray incessantly.

নিজেরা — প্রচারকরা এটি পালন করলে অপরে মানবে। কিছু বলতে হবে না মুখে, দেখে শিখবে। বস্তুগুণ আপন প্রভাব আপনি বিস্তার করবে। এই ত্যাগ আপনি কাজ করবে শ্রোতার ভেতর।

কিন্তু নিজে পালন না করলে, সর্বত্যাগী না হলে, কেউ শুনবে না হাজার চীৎকার করলেও। শুনলেও এ-কান দিয়ে প্রবেশ করে ও-কান দিয়ে বের হয়ে যাবে। তাই প্রচারকের কাজ বড় কঠিন কাজ। নিজে আচরণ করলে ও তবে বললে অপরে শুনবে।

ব্রাহ্মসমাজের preacher-রা (প্রচারকরা) কোনও impression (মনে প্রভাব বিস্তার) করতে পারে না কেন? এই কারণে। খ্রীস্টানদেরও ঐ এক কারণ। লোক শোনে কি করে তাদের কথা? নিজেরা কি নিয়ে রয়েছে? টাকাকড়ি, বড় বড় বাড়ি, গাড়ী, দাসদাসী, এই সব নিয়ে রয়েছে। তা হলে কি করে লোক শোনে? কেনই বা শুনবে?

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শিবনাথ শাস্ত্রী এক দল করেছিলেন ব্রাহ্ম ছোকরাদের দিয়ে, বেলুড় মঠের অনুকরণে। কিন্তু টিকলো না! কি করে টিকবে বল? যাদের নিয়ে এ দল করেছে তারা কি নিয়ে আছে? ভিতরে টাকাকড়ি, মান সম্মান, বিয়ে করা — এসব ইচ্ছা গজগজ করছে। তাই ঐ দল টিকলো না। কোথায় গেল সেই দল তার নাই ঠিক।

শুধু বুদ্ধি দিয়ে মেরে দেব, বললে হয় না। বিদ্যায়ও হয় না। ত্যাগ চাই। ত্যাগের উল্টো পিঠই অনুরাগ — মানে, ঈশ্বরে ভালবাসা।

ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে যথার্থ চরিত্র গঠিত হয় না। চরিত্র না থাকলে প্রচার বা আচার্যের কাজ হয় না।

বড় জিতেন (অস্পষ্টভাবে) — গলিতে গলিতে কনসার্ট পার্টি ছিল তখন।

শ্রীম (বড় জিতেনের কথা শেষ করিতে না দিয়া উচ্চৈঃস্বরে) — সাধুগিরি imitate (অনুকরণ) করতে গিছলো। রইলো কই, কোথায় গেল?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সাধুদের অত মানে কেন লোক? তারা কত ত্যাগ করেছে বাপ-মা, ভাইবোন, সুখ, টাকাকড়ি সব! তাদের মানবে না তো কি? রাস্তা দিয়ে সাধু গেলে, লোক দেখে সরে সরে যায়। সাধুর সঙ্গে হেসে কথা কয়।

মানুষের ভিতর কেমন একটা instinct (সদ্যোজাত প্রবৃত্তি) আছে।

তারা কার কথা শুনবে, কার না, এ বুঝতে পারে। বিচার করে নয়, এমনি instinct (সহজাত জ্ঞান) দিয়ে বুঝতে পারে। লেকচার দিতে হয় না। লেকচার দিতে এলেও — যাকে লোক জানে না সে ভাল লোক হলেও — তাকে কাছা ধরে টেনে বসিয়ে দেয়। বলে, বস বস। হয় তো অন্যের চাইতে ভাল কথা বলছিলো। কিন্তু তাকে তো চিনে না। তাই তার কথা শুনতে রাজী নয়।

শ্রীম কিছুক্ষণ কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হাঁ, মনে পড়েছে, একজন লর্ড ছিলেন, তখনকার লর্ড চিফ্ জাস্টিস অব ইংলণ্ড। তাঁর কোর্টে একটা কেস হয়েছিল। একজন কৃষক তার একটি ভাইপো ও ভাইঝিকে পালন করেছিল। ভাইঝি বেশ বড় হয়েছে। ওর প্রতি কৃষকের ভালবাসা হলো। এখন মেয়ের ভালবাসা অন্যের উপর, মেয়ের Lover (প্রেমিক) রোজ বাড়িতে আসে। কথাবার্তা কয়, মেলামেশা করে। এটা কৃষকের সহ্য হচ্ছে না।

একদিন ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে কৃষক দেখছে, মেয়ে lover-এর (প্রেমিকের) গায়ে পড়ে ঢলাঢলি করছে। ওদের সমাজে কোর্টশিপ হলেই বিয়ে হয় কিনা। কৃষকের প্রতিহিংসা বিকট রূপ ধারণ করলো। উন্মাদ হয়ে হাতে একটি কুড়োল নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘরের পাশ দিয়ে একটা লোক আসছিল। তার পায়ের শব্দ শুনে কুড়োলের এক ঘায়ে তাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি করিয়ে দিলো। Wrong person-কে (ভুল লোককে) মারলো। তারপর বিচারে ওর ফাঁসি হলো। ও চললো, কিন্তু ওরা রইলো।

দেখুন না, এমন কাণ্ড! এ ছাড়তে পারলে তবে ঈশ্বর। এ চিজ না ছাড়লে কেউ শুনবে না তোমার কথা। এ না ছাড়লে সাধু হয় না। তাই সাধুদের অনুকরণ করে কাজ করতে গেলে, দল করলে তা' টেঁকে না। এই তেঁতুলের আচার খেয়ে আবার লেকচার। দেখলেই মুখে জল ওঠে। শুধু দেখা নয়, আবার মুখে দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করা।

৪

ছি ছি! লজ্জা নেই মানুষগুলোর। এতে থেকে আবার অন্যকে বলা, ঈশ্বরে মন দাও। ত্যাগ কর।

ক্রাইস্ট, চৈতন্য, ঠাকুর — এঁরা এসেছিলেন সব, ত্যাগের আদর্শ দেখাতে। রামচন্দ্র, কৃষ্ণ — এঁরা আবার কর্ম নিয়েছিলেন।

এই যে পাদ্রীরা অত চেঁচায়, কেন লোক শুনছে না এদের কথা? কি করে শুনবে লোক? অত টাকাকড়ি, গাড়ীঘোড়া, দাসদাসী নিয়ে থাকবে তো কেন শুনবে?

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সিসারো (Cicero) যখন কথা বলতেন তখন লোক বলতো, what a splendid orator (কি অদ্ভুত বক্তা)! কিন্তু ডিমস্থেনিসের (Demosthenes) কথা শোনামাত্র লোক দাঁড়িয়ে উঠতো। আর বলতো, let us march against Phillips (চল সব ফিলিপসের আক্রমণের প্রতিরোধ করি)। শুধু বলা নয়, একেবারে এগিয়ে পড়ে। কেন? না, উনি যে হৃদয় থেকে বলছেন! যা বলছেন সেই কথা তাঁর রক্তের সঙ্গে ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে। একেই বলে Character (চরিত্র)! Character (চরিত্র) না থাকলে কি করে শুনবে লোক?

শ্রীম (স্বগত) — আমরা কার কথা শুনেছি? অবতারের কথা। তা অন্যের কথা কি আর ভাল লাগে এর পর? পায়েস মুণ্ডির পর চাটনি ভাল লাগে না, ঠাকুর বলতেন।

শ্রীম নীরব। কি ভাবিতেছেন। তারপর তাঁহার আদেশে জগবন্ধু ডক্টর গিল্‌কীর আজকের বক্তৃতার নোট পড়িয়া ভক্তদের শুনাইতেছেন। পাঠ শেষ হইলে শ্রীম পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — উনি ক্রাইস্টকে ভালবাসেন, এটাই হল ঠিক। এটি ধরে থাকলে সরলভাবে, পরে ভেতর ফাঁক হতে পারে। তখন একটু glimpse (আভাস) পাওয়া যেতে পারে তাঁর কৃপায়।

(সহাস্যে) — ক্রাইস্টকে বুঝে ফেলা কি এমনি সহজ! তিনি বলেছিলেন, 'take up the cross'; ক্রুশ গলায় ঝোলাও অর্থাৎ মৃত্যুকে বরণ কর আগে। তারপর 'and follow me' — অর্থাৎ আমার

(ক্রাইস্টের) অনুসরণ কর। তবে অমৃতত্ব লাভ হতে পারে।

মোহন (শ্রীম-র প্রতি) — ডক্টর গিল্‌কী ব্যবস্থা দিয়েছেন ক্রাইস্টকে নিতে। আরও অনেকে একথা বলেছেন। তবে লোক নিচ্ছে না কেন ক্রাইস্টকে? সকলেই বলে শান্তি চাই। রোগও জানা আছে, নিদানও জানা আছে, তবে কেন শান্তিলাভ হচ্ছে না?

শ্রীম — হয় কি করে শান্তিলাভ? ওরা যে ভোগে ডুবে আছে। এসব ছাড়লে তো? ওয়েস্ট সারা জগৎটা জয় করে ঐশ্বর্যশালী হয়েছে। এই ঐশ্বর্য ছাড়তে পারলে তো হৃদয়ে ঈশ্বর বসবেন। ছাড়া সম্ভব নয়। ঈশ্বর যদি ছাড়িয়ে নেন তবে হয়। সখ করে কেউ ছাড়তে পারে না। ভিতর থেকে প্রবল ইচ্ছা এলে তবে মানুষ কাজে হাত দেয়। আর তাতেও সর্বদা কৃতকার্য হয় না।

তাঁর মহামায়ার খেলা। এসব ঈশ্বরের জগৎলীলার কাজ। তিনিই উঠান, আবার তিনিই ফেলেন। আবার তিনিই ঝগড়া করান। আবার শান্তিস্থাপনও করান।

এই যে মহাযুদ্ধটা হয়ে গেল, এটা কার ইচ্ছায় হয়েছে? লোক যখন বড় ফেঁপে যায় তখন তাঁরই বিধানে আবার নিচে পড়ে। ওয়েস্টের যে অবস্থা, আবার যুদ্ধ হবে। তখন ভারত উঠবে। তাইতো ঠাকুর এসেছেন! ভগবানই জগৎকে balanced (সুসমঞ্জস) করান আবার অশান্ত করেন। আবার অবতার হয়ে এসে শান্তি বিধান করেন।

ঠাকুরের আগমনই এই জন্য। তাঁর প্রধান কাজ ভক্তদের উদ্ধার। ভক্তদের ভিতর দিয়ে তিনি নিজে কাজ করেন। তাতে লোক ও সমাজের উন্নতি হয়।

অবতার-শক্তি ছাড়া শান্তিলাভ হয় না। ক্রাইস্ট এসে শান্তি দিয়েছিলেন। আবার অশান্ত হয়ে পড়েছে। এই অশান্তিসৃষ্টির কারণ তাঁরই নামে যারা নিজেদের পরিচয় দেয় তারা — ওয়েস্ট।

ঐ ক্রাইস্টই ঠাকুরের রূপ নিয়ে এসেছেন। ঠাকুরই স্বামীজীকে আমেরিকায় পাঠান। ঠাকুরই স্বামীজীর ভিতর বসে ঐ দেশের লোককে শান্তির বাণী শুনিয়েছেন। ডক্টার গিল্‌কী বললেন এই কথা। কি বলেছিলেন ঐ দিন?

একজন ভক্ত — The spiritual awakening in America has been inaugurated by the charming and impressive personality of Swami Vivekananda.

শ্রীম — সত্য কথা বলেছেন। মিলে যাচ্ছে। ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল ইস্ট-ওয়েস্টের মিলন হয়। ঐটির পূজারী স্বামীজী। বেশ ধরতে পেরেছেন বক্তা। স্বামীজীও আমাকে বলেছেন, ঠাকুর আমার নাকে দড়ি বেঁধে ওদেশে কাজ করিয়েছেন।

স্বামীজীকে ধরতে পেরেছে মানে, ঠাকুরকে ধরতে হবে। তাইতো আমেরিকায় ঠাকুরের কাজ অত বাড়ছে, দিন দিন আরও বাড়বে। ঠাকুর কি শুধু বাংলার জন্য, কি ভারতের জন্য এসেছেন? সারা জগতের জন্য এসেছেন। ক্রমে লোক এটা বুঝবে।

স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, আমেরিকায় ঠাকুর সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন।

ভারত ধর্মভূমি। ভারত উঠলে জগৎ উঠবে, এ কথার ইঙ্গিত ঠাকুর আমাদের দিয়েছিলেন। ভারত উঠলে এশিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি দেশও উঠবে। তখন শান্তি আসবে জগতে। ভারতের সত্যযুগের আদর্শটি হল শান্তির যুগ। ক্রমে কমে যায়। কলিতে অশান্তি বেশী, এই এখন। ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগের উদ্বোধন হয়েছে।

মানুষ মনে করে আমরা সব করছি। তা নয়, তিনিই সব করাচ্ছেন। ঈশ্বর কর্তা, মানুষ অকর্তা — যে ব্যক্তি, যে দেশ এটা যত বুঝবে সে-ই তত উপরে উঠবে।

ঠাকুর আবার বলেছিলেন, মহামায়াকে বুঝতে যেও না। তাঁর সব এলোমেলো। তুমি তো তাঁর শরণ নাও, শান্ত হও। তখন তোমায় দেখে অপরে শিখবে। ঢেলা দিয়ে ঢেলা ভাঙ্গেন ঈশ্বর।

মটর্ন স্কুল, কলিকাতা।
২১শে জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীঃ। ৮ই মাঘ, ১৩৩১ সাল।
বুধবার, কৃষ্ণা দ্বাদশী ৫৩ দণ্ড, ৩৬ পল।

পঞ্চদশ অধ্যায়
সন্ন্যাসী নিতাই গৃহী দেবকার্যে

১

মর্টন স্কুল। শীতকাল। রাত্রি সাড়ে সাতটা। শ্রীম চারিতলার ঘরে বিছানায় বসিয়া আছেন, খুব ক্লান্ত। গৃহ অর্গলবদ্ধ। ভক্তগণ ধীরে ধীরে আসিয়া পাশের পার্টিশানের ঘরে একত্রিত হইয়াছেন — বড় জিতেন, ছোট জিতেন শুকলাল ও যতীন, রমণী, বলাই, বিনয় ও ডাক্তার, জগবন্ধু বিবেকানন্দ সোসাইটির ব্রহ্মচারী তারক ও একজন নূতন ভক্ত প্রভৃতি। জগবন্ধু এইমাত্র ডক্টর গিল্‌কীর বক্তৃতা শুনিয়া ফিরিয়াছেন।

শ্রীম বলিলেন — ডাক্তারবাবু, আপনি 'অমিয়-নিমাইচরিত' পড়ে শোনান সকলকে — 'গৃহস্থ নিত্যানন্দ'। ডাক্তার চতুর্থ ভাগ পড়িতেছেন। ভক্তগণকে পাঠনিরত রাখিয়া শ্রীম নিচে গেলেন নৈশ ভোজনের জন্য। পাঠ শেষ হইলে ছোট জিতেন ও ডাক্তার বিচার করিতে লাগিলেন, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসজীবন সম্বন্ধে। ইতিমধ্যে শ্রীম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রি নয়টা। কথোপকথন চলিতেছে।

ডাক্তার — বিশ বছর সন্ন্যাসজীবন যাপন করে গৃহস্থ হলেন নিত্যানন্দ। বড়ই রহস্যকর বলে মনে হয়। যা কারণ বলে এর, মন সেটা নিতে চায় না।

ছোট জিতেন — কেউ কেউ বলেন নিত্যানন্দের মনে ভোগবাসনা প্রচ্ছন্ন ছিল। তাই চৈতন্যদেব তাঁকে বিয়ে করতে বললেন।

বড় জিতেন — বড়ই বিচিত্র ঘটনা। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের দুই বিয়ে। এর পর সংসার ছাড়লেন চব্বিশ বছর বয়সে। আর নিত্যানন্দ বার বছর বয়সে সংসার ছেড়ে বত্রিশ বছর পর্যন্ত প্রব্রজ্যায় থেকে ফিরে এসে দু'টি বিয়ে করলেন।

শ্রীম (স্মিত হাস্যে) — মানুষ কর্তা, মানুষের ইচ্ছায় জগৎ চলছে

— যদি এটাকে axiom (স্বতঃসিদ্ধ) ধরে নেওয়া হয় তবে বাবুদের বিচার ঠিক। আর যদি ঈশ্বর কর্তা হন, তাঁর ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ হচ্ছে এটা হয় চরম সত্য, তবে বাবুদের কথার মূল্য কি? পাগলের প্রলাপ বলতে হয়। (ভক্তগণ লজ্জায় নীরব)।

চৈতন্যদেব যে নিজে বলেছেন, ঈশ্বর এই শরীর নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তার কি করলে? ঠাকুরও এই কথার সমর্থন করেছেন। তার উপরও বললেন, আমিও অবতার। বললেন, ক্রাইস্ট চৈতন্য আর আমি, এক।

এখন যদি তাই হয়, তাহলে বলতে হয়, নিত্যানন্দের ওপর যে আদেশ হল বিয়ে করতে, তার গূঢ় রহস্য আছে — অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছা।

অবতার আসেন সাধু, ভক্তের পরিত্রাণের জন্য আর ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। যা করলে তাঁর এই সব কার্য হয় সেই কার্যে নিজের পার্ষদদের লাগান।

গৃহস্থ আশ্রম এত নেমে গিছলো। তাকে ওঠাতে হবে আদর্শ গৃহী তৈরী করে। আবার এই গৃহস্থ আশ্রমের উপর নির্ভর করে বাকী তিন আশ্রম — ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। তাই অতি শক্ত লোককে ওখানে পাঠাতে হবে। হৃদয়ে অযুত হস্তীর বল থাকলে এই কার্যটি হয়। তাইতো ঠাকুর বলতেন, আদর্শ গৃহীর দু'খানা তরোয়াল ঘুরাতে হয় — কর্মের ও জ্ঞানের। সন্ন্যাসীদের একখানা।

আর এক কথা। চৈতন্যদেব গৃহে থেকে ভক্তদের পাঠালেন প্রচার করতে। বললেন, বলে এসো সকলকে সকাল সন্ধ্যায় ভগবানের নাম কর, আর তাঁর হয়ে সংসার কর। বড় বেশী লোক এতে কান দিলে না। তারা বলতে লাগলো, হাঁ নিমাই পণ্ডিত ঘরে বেশ মজায় আছে, আর আমাদের বলছে ভোগ ত্যাগ কর। এই কথা শুনে তিনি স্থির করলেন লোক-কল্যাণার্থ তাঁকে সন্ন্যাস নিতে হবে।

ভগবান মানুষ-শরীর নিয়ে অবতার হয়ে গৃহেই থাকুন আর সন্ন্যাসী হোন তাঁর দিক দিয়ে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু লোকদের মনোভাব দেখে প্রয়োজন মত কখনও গৃহস্থাশ্রমে থাকেন, যেমন রাম, যেমন কৃষ্ণ। কখনও সন্ন্যাসী হন — যেমন বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, চৈতন্য, ঠাকুর।

তাই এ বিষয়ে বৃথা আলোচনা বাবুদের। আমাদের superior-রা (গুরুজনগণ) যা বলে গেছেন তাতে বিশ্বাস করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। দৈবকার্য সাধনের জন্য নিত্যানন্দ গৃহী হলেন।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর যেমন বলেছেন, কাজলের ঘরে বাস করলে, তুমি হাজার সেয়ানা হও, একটু কালির দাগ গায়ে লাগবেই। যদিও এতে কিছু ক্ষতি হয় না। তাই হলো। নিত্যানন্দ প্রতি বৎসর চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে পুরীতে যেতেন যেমন অন্য ভক্তরা নবদ্বীপ থেকে যেতেন। তাঁরা ছয় মাস ঘরে থাকতেন আর ছয় মাস বাইরে থাকতেন। এর মধ্যে দুই মাস যেতো যাওয়া আসায়। আর চার মাস থাকতেন পুরীতে চৈতন্যদেবের কাছে। শিবানন্দ সেন এই যাত্রীদলের লীডার ছিলেন।

একবার নিত্যানন্দ গেলেন বটে পুরীতে। কিন্তু চৈতন্যদেবের কাছে না গিয়ে নরেন্দ্র সরোবরের তীরে বসে কাঁদতে লাগলেন। অন্য ভক্তরা গিয়ে একথা বললে, চৈতন্যদেব তক্ষুনি দৌড়ে এসে নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করে বলতে লাগলেন, যে আমার নিতাই-র পূজা করবে না কৃষ্ণদর্শন তার কোন কালেও হবে না। এই কথা বলে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ উভয়েই গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কেন এই কথা বললেন ইনি, আর কেন কাঁদলেন উনি? আবার কেন উভয়েই কাঁদলেন? চৈতন্যদেব কাঁদলেন তাঁর জন্য কত বড় ত্যাগ নিত্যানন্দের! তাই প্রেমাশ্রু বিসর্জন করলেন। আর নিতাই কাঁদলেন, ইনি বুঝতে পেরেছেন, প্রথমকার উন্মুক্ত সন্ন্যাসজীবন আর এই ভারাক্রান্ত গৃহস্থজীবনে কত তফাৎ। যদিও জীবন্মুক্তির আনন্দ উপভোগ উভয় অবস্থায় সমান।

গৃহস্থজীবনে নানা ঝঞ্ঝাটে সর্বদা অনাবিল মেঘমুক্ত আকাশের মত আনন্দোপভোগে একটু ব্যাঘাত ঘটে। এতে অন্তরের জ্ঞানের কিছু কমতি হয় না। এটা কেমন? না, এই যেমন কাঁধে একটা গামছা রাখা। একটা additional (অতিরিক্ত) চিন্তা করতে হচ্ছে। যার কাঁধ খালি তার সে চিন্তা নাই।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাই কেন নিত্যানন্দ গৃহস্থ হলেন এতে আমাদের explanation (ব্যাখ্যা) চলবে না। চৈতন্যদেব যা বলেছেন, নিত্যানন্দ যা নিজে বলেছিলেন, ঠাকুর যা বলেন এই বিষয়ে, এঁদের মহাবাক্যই একমাত্র explanation (ব্যাখ্যা)! অর্থাৎ দৈবকার্য সাধনের জন্য কুমার বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ গৃহী হলেন। আর চৈতন্যদেব গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী হলেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — ডক্টর গিল্‌কীর আজ বক্তৃতার বিষয় কি ছিল বলুন।

জগবন্ধু — আজকের বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'ক্রাইস্ট ও বর্তমান জগতের শান্তি।' প্রথমেই ভারতের খুব প্রশংসা করে বললেন, ধর্মে ভারত বড়। বললেন —

India has a great past, a long past and a mighty past. Personalities are requried to raise the spiritual standard of a country. In India mighty personalities arose in the hoary past.

ভারতের অতীত অতি মহান, অতি সুদীর্ঘ ও অদ্বিতীয় শক্তিশালী। একটা দেশের আধ্যাত্মিক সম্পদ বৃদ্ধি করতে হলে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছিল ভারতে অতি সুদূর অতীতেও।

শ্রীম — বাঃ, এ বেশ কথা। আরও কিছু বললেন?

জগবন্ধু — আজ্ঞে হাঁ। বললেন — সক্রেটিস্, প্লেটো, এরিস্টটল, আলেকজাণ্ডার, বুদ্ধ, নেপোলিয়ান, শেক্সপীয়র, মহম্মদ — এঁরা সব নবীন ব্যক্তিত্ব (They are all new personalities).

শ্রীম — আলেকজাণ্ডার কে?

জগবন্ধু — আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট (দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার)

শ্রীম— ওমা, ইনিও young (নবীন) (হাস্য)?

জগবন্ধু — কিন্তু যীশু চিরনবীন, বললেন উনি। (Jesus is ever young).

শ্রীম — তা' বেশ — ঈশ্বরভাবে।

জগবন্ধু — বললেন — অশোক, নানক ও চৈতন্যকে আমার বড় ভাল লাগে।

শ্রীম — এ তো বেশ! তবে নানক ও চৈতন্য ঈশ্বরকে নিয়ে সদা পাগল। অশোক তা নন। তিনি একজন mighty administrator (অসামান্য শাসক)। রাজর্ষি বলা যেতে পারে। ওঁরা দু'জন ভগবানের অবতার।

জগবন্ধু — বললেন, মানুষ যত জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জন করুক না কেন ক্রাইস্টের অতি সরল উপদেশের কাছে উহা অকিঞ্চিৎকর।

শ্রীম — বাঃ এটিও বেশ। অবতারের বাণী, মানে ঈশ্বরের বাণী — অতুলনীয়।

জগবন্ধু — বললেন, আমার শক্তির পরাজয় হল, নেপোলিয়ান বলেছিলেন। কিন্তু যীশু বিজয়ী হলেন — যীশুর প্রেম। (My power failed. But Jesus is victorious — Jesus's love).

শ্রীম — এটিও বেশ। যারা কেবল ঐশ্বর্যের উপাসক তাদের চৈতন্য হবে এতে।

জগবন্ধু — আরও বললেন, যীশুর বাণী, শুধু ব্যক্তি বা জাতির জন্য নয়। পরন্তু সমগ্র জগতের জন্য। তাই বর্তমান অশান্ত জগৎ যীশুকে শান্তির অবতার বলে গ্রহণ করতে পারে।

আমি যীশুকে মান্য করি, এ বললে তাঁকে গ্রহণ করা হলো না। যদি সত্যই যীশুর ভক্ত হতে চাও, তা হলে তাঁর বাণী গ্রহণ করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে, আর নিজ জীবনে পালন করতে হবে। আমেরিকার বাণিজ্যে লিংকন, যীশুর অর্থনৈতিক মহাবাক্য প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন — 'যার যা প্রাপ্য তাকে তা দাও। সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও।'

শ্রীম — কি আশ্চর্য! যীশু খ্রীস্টের সম্বন্ধে অত কথা বললেন, কিন্তু যেটা তাঁর প্রধান ভাব ছিল, যে শক্তির অফুরন্ত প্রভাব আজও জগতে বিদ্যমান দু'হাজার বছরের ভিতর দিয়ে — সেই মস্ত বড় কথাটার নামগন্ধও করলেন না উনি এই কয়দিনের বক্তৃতায় — যীশুর সংসার ত্যাগের কথা (Jesus' renunciation of the World)!

এই মহা ত্যাগশক্তির ওপরই আজও চলছে তাঁর কাজ জগতে, এবং

সর্বদা চলবে। যীশু বলেছিলেন নিজের সম্বন্ধে — পশুপক্ষীরও থাকবার স্থান আছে কিন্তু আমার মাথা গুঁজবার স্থান নাই। ('Foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the son of man hath not where to lay his head)'.

একেবারে নিষ্কিঞ্চন। ওটা একেবারেই বলতে চায় না। নিজেরা অন্যরূপ কিনা!

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — আপনি বরং suggest (অনুরোধ) করবেন ডক্টর গিল্‌কীকে, একদিন 'Renunciation of Christ' (যীশুর আত্মত্যাগ) সম্বন্ধে বলতে। আর, যান না সকলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে আসুন general (সাধারণ) ভাবে ত্যাগের সম্বন্ধে। আর বলবেন বেলুড়মঠে যেতে। যদি যেতে চান তবে নিয়ে যাবেন মঠে। বলবেন, সেখানে সব সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দদ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই মঠ। উনি তো রয়েছেন স্কটিস চার্চ কলেজে। এইতো দূর।

ডক্টর গিল্‌কীর সহিত দেখা করবার পর কথোপকথন হইতেছে।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — কি সব কথা হল?

জগবন্ধু — আমি বললাম, মঠে চলুন। স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মঠ। আপনিই তো বক্তৃতায় বলেছেন, আমেরিকাবাসীদের অধ্যাত্মজীবনের উদ্বোধন করেছেন স্বামীজী। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামীজীকে ভারতের লোক অতো ভালবাসে কেন? আমি বললাম, তাঁর উদার হৃদয়ের জন্য। দুঃখী দরিদ্রের জন্য তিনি মায়ের মত কেঁদেছিলেন। তাদের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি আমেরিকায় গিছলেন অর্থ সংগ্রহের জন্য। ভারতে বহু বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা-প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের বলেছিলেন, দরিদ্রের ভিতর যে নারায়ণ আছেন এখন তাঁর পূজা কর। এতে তোমাদের আত্মজ্ঞান ফিরে পাবে আর অপরের আত্মজ্ঞানলাভে সহায় হবে। দরিদ্র পরাধীন নির্যাতিত ভারতের ইহকাল ও পরকালের মুক্তির অগ্রদূত স্বামীজী।

শুনলেন আরও অনেক কথা, কিন্তু মঠে যেতে নারাজ। বলেন সময় নেই।

শ্রীম — ক্রাইস্টের ত্যাগের বিষয় কি আলোচনা হল?

জগবন্ধু — আমি বললাম, পশুপক্ষীরও মাথা গুঁজবার স্থান আছে; কিন্তু যীশুর তাও নাই — এইটে অবলম্বন করে 'Renunciation of Christ' (সর্বত্যাগী যীশু) সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিলে আমাদের উপকার হয়। এই দেশের যুবকদের খুব ভাল লাগবে। দেখলাম ত্যাগের কথায় কান দেন নাই। অথচ বলেন, ক্রাইস্টকে ধরলে জগতের শান্তি আসবে। বললাম, একটা না ছাড়লে আর একটা কি করে ধরা যায়? ঈশ্বরীয় শান্তি সুখ ভোগ করতে চাইলে সংসারের দ্রব্যজাত ভোগ ছাড়তে হবে, এ তো যীশুরই কথা! আবার অনুরোধ করলাম সর্বত্যাগী যীশু সম্বন্ধে বক্তৃতার কথা ভেবে দেখতে। বললেন ঐ এক কথা, সময় নাই দার্জিলিং যাচ্ছি।

শ্রীম — দেখলে, Renunciation of Christ (সর্বত্যাগী যীশু) সম্বন্ধে বললেন না। ধরা পড়ে যাবেন যে নিজে। আর সর্বত্যাগীদের স্থান বেলুড় মঠেও যাবেন না। এই তো সংকীর্ণ ভাব। তা হলে কে শুনবে তাঁর কথা?

মর্টন স্কুল কলিকাতা।
২২শে জানুয়ারী ১৯২৫ খ্রীঃ। ৯ই মাঘ, ১৩৩১ সাল।
বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ৪৭।৫৪ পল।

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

(দ্বাদশ ভাগ)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রী ম ট্রাস্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চন্ডীগড় - ১৬০০১৮

প্রকাশক ঃ
প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রী ম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চন্ডীগড় - ১৬০০১৮
ফোন ঃ ০১৭২-২৭২৪৪৬০
Website : http://www.kathamritra.org

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

চতুর্থ সংস্করণ
শ্রীশ্রী শ্যামাপূজা, ৩০শে আশ্বিন, ১৪১৬
(১৭ই অক্টোবর, ২০০৯)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি - ১১০০১৯
ফোন ঃ ০১১-৪১৬০৩৯৯৬/৯২১৩১৩৪৪৮৭

মুদ্রক ঃ
শ্রী অরবিন্দ গুপ্ত
প্রিন্ট ল্যান্ড, কাশ্মীরি গেট, দিল্লী
ফোন ঃ ০৯৯১১৩৮৬৭১৬/০৯৮১০০৮৬৭১৬

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা (Subsidised)

শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' মাস্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্ত্বা যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহুরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে — লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীম-র অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রী মা বলেন, — একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন — কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।.... এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন — শ্রীম-র লেখা যেন শর্টহ্যান্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন — কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবনচরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী — কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর —'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূল স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন

(দ্বাদশ ভাগ)

গ্রন্থকার

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীম-র সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ও সাধু ভক্তদের সঙ্গে শ্রীম-র যেসব ঈশ্বরীয় কথা হইত তাহা তিনি নিত্য ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। শ্রীম এই ডায়েরীর পাঠ শুনিয়াছেন, আর স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কিভাবে উত্তমরূপে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-দর্শন এই ডায়েরীর সংকলন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ষোল ভাগে লিখিত।

ইহাতে আছে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কিছু কিছু নূতন কথা। আর কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য। অধিকন্তু উপনিষদ, গীতা পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা।

।। কয়েকটি অভিমত ।।

স্বামী বিরজানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট) বলেন, শ্রীম-দর্শন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইহার লিখনভঙ্গী যেমনি নাটকীয়, বিষয় - বস্তুও তেমনি সুগম ও সুগভীর।

প্রবুদ্ধ ভারত — শ্রীম দর্শন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক রত্ন।

বিশ্ববাণী — রচনানৈপুণ্যে ও বর্ণনামাধুর্য্যে শ্রীম-দর্শন পাঠকালে কথামৃতের কোনও নবতর সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন।

ভবন জারনেল (বম্বে) — প্রতি মানবই শ্রীম-দর্শন থেকে কিছু না কিছু লাভ করবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা — শ্রীম-দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের...জীবনভাষ্য। গ্রন্থকার গভীর একটি তত্ত্ববোধিনী দৃষ্টি নিয়ে সেই মহাশ্চর্য জীবনকথা আলোচনা করেছেন। ভক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন পাঠকের কাছেই এর আবেদন অমোঘ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজ্যপাদ্য স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ যখন শ্রীম-দর্শন রচনায় হিমালয়ের কোলে হৃষিকেশের 'তুলসী মঠ' আশ্রমে সাধনারত ছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলীন পরমারাধ্য স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজও ঐ মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সৌভাগ্যবান তাপস স্বামী সারদেশানন্দজী তাঁকে এই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন। স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজের এই অকৃপণ স্নেহপরায়ণ সহায়তায় শ্রীম-দর্শন রচনা সম্ভবপর হয়। শ্রী ম ট্রাস্ট এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজের সেবকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই অপরিশোধ্য ঋণ স্মরণ করেন।

ঃ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ

(১) শ্রীম-দর্শন (বাংলা) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(২) শ্রীম-দর্শন (হিন্দী) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(৩) শ্রীম-দর্শন (ইংরাজী) - "M. the Apostle and the Evangelist", ১ম হইতে ১১শ ভাগ
(১৬ ভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে)
(৪) Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Centenary Memorial
(৫) A Short Life of Sri "M"
(৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (হিন্দী), ভাগ ১ম হইতে ৫ম (মূলগ্রন্থের যথাযথ হিন্দী অনুবাদ)
(৭) The Life of M. and Sri Sri Ramakrishna Kathamrita

এই সকল গ্রন্থে আছে —

ভারতীয় সংস্কৃতি - আধ্যাত্মিকতা — আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন আর যোগসাধনার বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে — বর্তমান কালোপযোগীভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশ — যাহা পড়িয়া দেশবিদেশের বহু নরনারী চির শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন ও হইতেছেন।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

1. Sri Ma Trust Office
   579, Sector 18-B, Chandigarh 160018

2. Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Peeth
   Sri Ma Trust
   Sector 19-B, Chandigarh - 160019

3. Smt. Padma Gadi
   R-899, New Rajendra Nagar
   New Delhi -110060

নিবেদন

শ্রীম-দর্শন ষোলটি খন্ডে সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি ভক্তগণের চাহিদাতেই একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে।

শ্রীম-দর্শনের মূল আবেদন ঃ গৃহে বাস করিয়া কি প্রকারে দেবভাবে জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে বেদবর্ণিত উপায়ে সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয়।

এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের কিছু নূতন কথা, আর স্বামীজীপ্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা। আর আছে 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃত'-র ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল-আদি শাস্ত্রের আলোচনা।

শ্রীমতি ঈশ্বরদেবী গুপ্তা শ্রীম-দর্শনের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ শ্রীম-র কথামৃত হইতে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন যাহাতে হিন্দী ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই মহাগ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে পারেন। পরে এই গ্রন্থ 'M - the Apostle and the Evangelist' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত ধরমপাল গুপ্ত মহাশয়।

পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিবার দায়িত্বভার 'শ্রী ম ট্রাস্ট'-এর উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি ট্রাস্ট এই গ্রন্থরাজি বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

শ্রীম-দর্শন মুদ্রণে এবং প্রকাশনে যে সকল সহকর্মী, অনুরাগীবৃন্দ ও ভক্ত সমাজ অক্লান্ত সহায়তা দান করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত
প্রকাশক

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়

আমায় ধর— রামকৃষ্ণ ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্রাইস্টের জন্ম আস্তাবলে — শ্রীরামকৃষ্ণের ঢেঁকিশালে ২১

তৃতীয় অধ্যায়

কালীমূর্তি - সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের প্রতীক ৩১

চতুর্থ অধ্যায়

মানুষ যেন একটি বাঁশি ৪৬

পঞ্চম অধ্যায়

গঙ্গাসাগর-যাত্রী সাধু ৫৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

লোক পাগল সংসারে, অবতার পাগল ঈশ্বরে ৬৮

সপ্তম অধ্যায়

অবতারের শাস্ত্রব্যাখ্যা ঠিক ৭৬

অষ্টম অধ্যায়

প্রেমানন্দ সারদানন্দের দৃষ্টিতে ৮৮

নবম অধ্যায়

মানুষ তো ষোল আনা মানুষ ১০২

দশম অধ্যায়

অভিনব শিক্ষক শ্রীম ১১৭

একাদশ অধ্যায়

বিপ্লবী বিপিন পাল — নববিধানে ১৩০

দ্বাদশ অধ্যায়

শান্ত হও আগে, শান্তি দাও পরে ১৪৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পার্ষদ সন্ধানে — এজেন্ট শ্রীম ১৫০

চতুর্দশ অধ্যায়

আমেরিকার ধর্ম জাগরণের অগ্রদূত বিবেকানন্দ — গিল্‌কী ১৬৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

সন্ন্যাসী নিতাই গৃহী দেবকার্যে ১৮০

* * *

২৫

শ্রীম - দর্শন ❁ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি) — যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, — সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্ ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে — সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি — যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[দক্ষিণেশ্বর, ২৪শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ]

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ - ২য় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)